নজরুল-রচনাবলী



নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

পঞ্চম খণ্ড

কাজী নজরুল ইসলাম



বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৪৯২১

প্রথম প্রকাশ : কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড (আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় তিন খণ্ডে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭০ সালে)। বাংলা একাডেমী-সংস্করণ (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড যথাক্রমে ১৯৭৭ এবং [illegible] ১৯৮৪ সালে)। পুনর্মুদ্রণ : ১৯৭৫, ১৯৭৬ ও ১৯৮৪ সালে। নতুন সম্পাদক মণ্ডলীর সম্পাদনায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ (চার খণ্ডে) : ১৯৯৩ সালে। নতুন সম্পাদনা-পরিষদ সম্পাদিত নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ (পঞ্চম খণ্ড) : ১২ই ভাদ্র ১৪১৪/২৭শে আগস্ট ২০০৭। প্রথম পুনর্মুদ্রণ (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ) : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮/মে ২০১১। প্রকাশক : শাহিদা খাতুন, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ [পুনর্মুদ্রণ সেল], বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : সমীর কুমার সরকার, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমী প্রেস। প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

Abdul Quadir (ed.), NAZRUL RACHANABALI, Central Board for the development of Bengali edition (Three Volumes in 1966, 1967 & 1970 respectively). Bangla Academy edition (Fourth & Fifth Volumes) in 1977 & 1984. New edition (Four Volumes in 1993. Nazrul Birth Centenary edition [Vol. V] : August 27, 2007. First Reprint (Birth Centenary edition) : May 2011. Published by Shahida Khatun, Director, Establishment, Planning & Training Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh.. Price : Taka 200.00 only.

ISBN 984-07-4929-3

নজরুল-রচনাবলী

জন্মশতবর্ষ সংস্করণ

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদনা-পরিষদ

রফিকুল ইসলাম
সভাপতি

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌
সদস্য

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক
সদস্য

নজরুল-রচনাবলী

প্রথম সংস্করণের সম্পাদক

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের (১৯৯৩) সম্পাদনা-পরিষদ

আনিসুজ্জামান
সভাপতি

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম
সদস্য

রফিকুল ইসলাম
সদস্য

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্
সদস্য

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
সদস্য

মনিরুজ্জামান
সদস্য

আবদুল মান্নান সৈয়দ
সদস্য

করুণাময় গোস্বামী
সদস্য

সেলিনা হোসেন
সদস্য-সচিব

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

অতুলনীয় জীবনবৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টিসম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা কবিতার ধারায় একটি নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কৈশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা না হারানো পর্যন্ত (১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকাররূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব গুছালো মানুষ ছিলেন না। ফলে জীবিতকালে তাঁর রচনা গ্রন্থাকারে যতটা প্রকাশিত হয়েছিল ; তার তুলনায় অপ্রকাশিত ও অগ্রন্থিত ছিল অনেক বেশি। গত অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে সেসব রচনা নানারূপে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মুদ্রিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের মত একজন কবির রচনাবলীর প্রকাশ আমাদের সকলের জাতীয় কর্তব্য। বাংলাদেশের জাতীয় কবি হওয়ার কারণে সে-দায়িত্ব আমাদের আরও বেশি। বস্তুত বাঙালির জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এ-দায়িত্ব পালনেরও সূচনা।

এরই ফল নজরুল-বিশেষজ্ঞ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রকাশ (১৯৬৬, ৬৭, ৭০)। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একীভূত হলে (১৯৭২) একাডেমী থেকে অবশিষ্ট চতুর্থ খণ্ড (১৯৭৭) এবং পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধ ও দ্বিতীয়ার্ধ (১৯৮৪) প্রকাশিত হয়। কবি আবদুল কাদিরের মৃত্যুর পর ১৯৯৩ সালে নতুন সম্পাদকমণ্ডলীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী' সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় চার খণ্ডে।

বাংলা একাডেমী ২০০৫ সালের অক্টোবরে 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে গঠিত সম্পাদনা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে চার খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলীর প্রথম সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত কাজী নজরুল ইসলামের রচনাসমগ্র, নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ও কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ পর্যালোচনার পরই সম্পাদকমণ্ডলী বর্তমান পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ নির্ঝর, মরু-ভাস্কর ; অনুবাদকাব্য কাব্য আমপারা এবং গীতিকাব্য বন-গীতি, গুল্-বাগিচা,, গীতি-শতদল ; কিশোরনাট্য পুতুলের বিয়ে এবং দুটি অগ্রন্থিত গল্প। নজরুলের ইসলামি গান এবং

চিন্তার পরিচয় যেমন এতে বিধৃত, তেমনি বাংলা গানের একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকার হিসেবেও নজরুলের পরিচয় এ-খণ্ডে পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যবৃন্দ, নজরুল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কবি ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্, ভাষাবিদ অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, কবি ও প্রাবন্ধিক আবদুল মান্নান সৈয়দ এবং প্রাবন্ধিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক নিষ্ঠা ও ধৈর্যসহকারে যেভাবে 'নজরুল-রচনাবলী'র পঞ্চম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন সেজন্যে তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও প্রকাশনার কাজে সম্পাদকমণ্ডলীকে সার্বক্ষণিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সংকলন উপবিভাগের ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ, জনাব ফারহানা খানম, জনাব সুলতানা মাহমুদা বেগম, জনাব আবু মোঃ ইমদাদুল হক, জনাব শুভ্রা বড়ুয়া, জনাব মোঃ মোবারক হোসেন এবং প্রেস ব্যবস্থাপক মোবারক হোসেন। দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ
মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১২ই ভাদ্র ১৪১৪॥ ২৭শে আগস্ট ২০০৭

নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রসঙ্গে

'নজরুল-রচনাবলী'র তিনটি খণ্ড প্রখ্যাত কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭০ সালে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭২ সালে 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' একীভূত হয় 'বাংলা একাডেমী'র সঙ্গে। সরকার কর্তৃক এই পরিবর্তন ও ব্যবস্থা গ্রহণের পর বাংলা একাডেমী থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায়ই প্রকাশিত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে এবং তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৩ সালে। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৬ এবং ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৪ সালেই প্রকাশিত হয় তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ। আগেই বলেছি, চতুর্থ খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড ১৯৮৪ সালে দুই ভাগে। চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কবি আবদুল কাদিরের জীবদ্দশায়, তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সব খণ্ডেরই নতুন সংস্করণ এবং পুনর্মুদ্রণ হয়েছে সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর লেখা 'সম্পাদকের নিবেদন'সহ।

'নজরুল-রচনাবলী'র ব্যাপক চাহিদা থাকায় অল্পকালের মধ্যেই রচনাবলী-র সব খণ্ড বিক্রি ও নিঃশেষ হয়ে যায়। এই পটভূমিতেই 'নজরুল-রচনাবলী' পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ উদ্দেশ্যে এবং মরহুম কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য ১৯৯২ সালে 'বাংলা একাডেমী' নয় সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদের সম্পাদনায় ১৯৯৩ সালে চার খণ্ডে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপক চাহিদার ফলে 'নজরুল-রচনাবলী'র এই নতুন সংস্করণও যথারীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এই নতুন সংস্করণের প্রতিটি খণ্ড একাধিক-বার পুনর্মুদ্রণের পরও 'নজরুল-রচনাবলী'র চাহিদা শেষ হয়নি। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'-র নতুন সংস্করণ (১৯৯৩) একাধিকবার পুনর্মুদ্রিত হওয়া সত্ত্বেও, নজরুল-জন্মশতবার্ষিকীর সময় থেকে 'নজরুল-রচনাবলী'র অধিকতর সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী'র জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং একটি

নতুন সম্পাদনা পরিষদের ওপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে। এই নতুন সম্পাদনা পরিষদ অদ্যাবধি ঢাকা ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত নজরুল-রচনাবলী-র বিভিন্ন সংস্করণ এবং নজরুলের বিভিন্ন গ্রন্থের আদি বা পরবর্তী সংস্করণসমূহে সন্নিবেশিত প্রতিটি রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিয়ে বর্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

'নজরুল-রচনাবলী': নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ পঞ্চম খণ্ডে নির্ঝর, মরু-ভাস্কর, কাব্য আমপারা, বন-গীতি, গুল-বাগিচা, গীতি-শতদল, পুতুলের বিয়ে, হারা ছেলের চিঠি, বনের প্যাপিয়া সংকলিত হলো। 'নজরুল-রচনাবলী'র নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণের প্রতিটি খণ্ডের শেষে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি এবং তাঁর গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক সূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে নজরুলের গানের বই এবং আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে বিধৃত গানের বাণীর পাঠান্তর যথাসম্ভব নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'নজরুল-রচনাবলী'র বিভিন্ন সংস্করণে মুদ্রণজনিত ত্রুটির দরুন এবং অন্যান্য কারণে যেসব বিচ্যুতি ঘটেছে, বর্তমান সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা সম্পাদনা পরিষদ করেছেন।

'নজরুল-রচনাবলী'র এই সংস্করণে নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের কালানুক্রম বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, তবে কবির অসুস্থতার পর সংকলিত এবং প্রকাশিত রচনাবলী তথ্যসূত্রের অভাবে কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতায় 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণকে যথাসম্ভব প্রামাণিক করার চেষ্টা ও শ্রম সম্পাদনা-পরিষদ আন্তরিকভাবেই করেছেন। এতদসত্ত্বেও নজরুলের সমস্ত রচনা এ-সংস্করণে সংকলিত—এমন দাবি করা যাবে না। কারণ, আমাদের বিশ্বাস, এই রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্গত রচনাসমূহের বাইরেও নজরুলের কিছু রচনা থাকা সম্ভব—যা এখনও জানা বা সংগ্রহ করা যায়নি। বস্তুত, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনা ও প্রকাশনা একটি চলমান প্রক্রিয়া ; ভবিষ্যতে নজরুলের দুষ্প্রাপ্য কোনো রচনা সংগৃহীত হলে সেগুলোকে 'নজরুল-রচনাবলী'র পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আমরা এ-পর্যন্ত সংগৃহীত নজরুলের রচনাসমূহ সংকলন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তবু হয়তো কিছু রচনা বাদ পড়ে যেতে পারে। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটে থাকতে পারে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

উল্লেখযোগ্য যে, 'নজরুল-রচনাবলী' সম্পাদনার পথিকৃৎ কবি আবদুল কাদির। 'নজরুল-রচনাবলী'র শুধু প্রথম সংস্করণই নয়, পরে প্রকাশিত সব সংস্করণ আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল-রচনাবলী'র ভিত্তিতেই করা হয়েছে। সব সংস্করণেই সম্পাদক হিসাবে মুদ্রিত রয়েছে তাঁর নাম, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর লেখা প্রতিটি সংস্করণের 'সম্পাদকের নিবেদন' এবং গ্রন্থ পরিচয়। সুতরাং, কবি আবদুল কাদিরের প্রয়াণের পর প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণ নতুন সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা হলেও 'নজরুল-রচনাবলী'র আদি ও মূল সম্পাদক আবদুল

কাদির। বাংলা একাডেমী 'নজরুল-রচনাবলী' : নজরুল-জন্মশতবর্ষ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করলেন। এই সংস্করণের 'সম্পাদনা পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে আমরা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ঢাকা
১২ই ভাদ্র ১৪১৪ ॥ ২৭শে আগস্ট ২০০৭

রফিকুল ইসলাম
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রথমার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

সাবেক কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড নজরুল-রচনাবলী কয়েক খণ্ডে প্রকাশের যে বিস্তারিত পরিকল্প গ্রহণ করেন, তদনুসারে ১৩৭৯ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডের প্রকাশ আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতিতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের দরুন তা পাঁচ বৎসর বিলম্বিত হয়ে ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে ১১ই জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে প্রকাশিত হয়। তার কয়েক মাস আগে, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন উপদেষ্টা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মরহুম আবুল ফজল সাহেবের সমীপে পঞ্চম খণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্প উপস্থাপন করেছিলাম এবং তিনি তা তখনই অনুমোদন করেন। তার প্রায় দু'বছর পরে ১২-২-১৯৭৯ তারিখে আমি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালকের কাছে উক্ত পরিকল্পের প্রতিলিপি-সহ একখানি পত্র প্রেরণ করি। সেই পত্রের উত্তরে একাডেমীর 'মহাপরিচালক সাহেবের আদেশ-ক্রমে' ৬-৩-১৯৭৯ তারিখে আমাকে জানানো হয় যে, ১৫-২-১৯৭৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৪৭-তম সংখ্যক মূলতবি অধিবেশনে' নজরুল-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-৫-১৯৭৯ ইং তারিখের ৭৭১৪-সংখ্যক পত্রে আমাকে পঞ্চম খণ্ডের 'সমগ্র পাণ্ডুলিপি' ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের 'জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে' দাখিল করতে বলা হয়। তদনুসারে ১১ই জুন তারিখে আমি 'পঞ্চম খণ্ডের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি' একাডেমীর মহাপরিচালক সাহেবের হাতে অর্পণ করি।

এরূপ স্বল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ও সম্পাদনা করতে হয়েছিল বলে আমাকে নজরুলের কিছু সংখ্যক রচনা সংকলন করার ব্যাপারে স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ সাহেবের সহায়তা চাইতে হয়। তিনি সে-সময়ে আমার সহায়তা করতে সম্মত না হলে আমার ক্লেশ খুবই বৃদ্ধি পেতো। বলা বাহুল্য যে, তাঁকে তাঁর সেই অতি দ্রুততা-সহকারে সম্পন্ন কাজের জন্যে যথোপযুক্ত 'সম্মানী', পাণ্ডুলিপি একাডেমীতে দাখিল করার পূর্বেই, পরিশোধ করা হয়েছিল।

কিন্তু এই প্রায় পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে পঞ্চম খণ্ডের মাত্র পাঁচ শত পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণ সম্ভবপর হয়েছে। পুস্তক প্রকাশের ব্যয় বর্তমানে যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তদনুপাতে পুস্তকের দাম বাড়াতে হয়েছে, তা বিবেচনা করে গ্রন্থমূল্য সহৃদয় পাঠকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে রাখবার উদ্দেশ্যে উক্ত পাঁচ শত পৃষ্ঠার মূল পাঠ দিয়েই পঞ্চম খণ্ডের 'প্রথমার্ধ' প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয়ার্ধে থাকবে : (ক) হাসির গান,

(খ) নাট্যগীতি, (গ) নাটিকা ও প্রহসন, যথা—'ঈদ', 'গুল–বাগিচা', 'অতনুর দেশ', 'বিদ্যাপতি', 'বিষ্ণুপ্রিয়া', 'বিজয়া', 'পণ্ডিত মশায়ের ব্যাঘ্র শিকার' প্রভৃতি, (ঘ) প্রবন্ধ ও রস–রচনা, (ঙ) অভিভাষণ, (চ) চিঠিপত্র ও (ছ) গ্রন্থ–পরিচয়।

নজরুলের শিশুপাঠ্য গ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে এবং 'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। এই দু'টি গ্রন্থ ছাড়া নজরুল–রচনাবলী পঞ্চম খণ্ডের প্রথমার্ধে অন্তর্ভুক্ত আর কোনো গ্রন্থই কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি।

এই খণ্ডে কবির জাগরণধর্মী কবিতা ও কাব্যগীতিগুলি 'অগ্রনায়ক' অভিধায় পরিবেশিত হলো। এই জাগরণ হচ্ছে আত্মার জাগরণ, জনগণের, রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক ন্যায়সঙ্গত অধিকারসমূহ আদায়ের জন্যে চিত্তের জাগরণ। কবিতাগুলিতে পরমাত্মার সহিত কবি–প্রাণের সাযুজ্য, কবির উদার মানবিকতার আদর্শ ও গভীর স্বদেশপ্রীতি পরম হৃদয়স্পর্শী রসমূর্তি লাভ করেছে।

'মৃত্যু তারা' বিভাগের কবিতা ও কাব্যগীতিগুলোতে কবির ব্যক্তি–স্বরূপের পরিচয় দেদীপ্যমান। কবির উপচেতন মনের নিগূঢ় স্বাক্ষর, মানুষের প্রতি অপরিমেয় প্রেম ও কল্যাণ–কামনা, এর রচনাগুলোকে করেছে তাৎপর্যপূর্ণ।

'ঝিঙে ফুল' ও 'পুতুলের বিয়ে' গ্রন্থদ্বয়ে অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলো ছাড়া, কবি যে–সকল কিশোর–পাঠ্য কবিতা, ব্যঙ্গকবিতা ও নাটিকা লিখেছেন, সেগুলো এই খণ্ডে 'কিশোর' নামে সন্নিবেশিত হলো।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে 'হারামণি', 'গীতি–বিচিত্রা' ও 'নবরাগ–মালিকা' নামে তিনটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের মারফতে ক্লাসিক্যাল রাগ ও নবতর রাগের বহু সঙ্গীত প্রচার করে তাঁর আলোকসামান্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে কবি বিভিন্ন রাগ–রাগিণীর অনুমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং নানা নতুন সুরের সৃষ্টি করে বহুসংখ্যক সঙ্গীত প্রচার করেন। তাদের কোন বিভাগে তিনি কোন কোন সঙ্গীত ও কতগুলি সঙ্গীত প্রচার করেছিলেন, তা বাংলা সঙ্গীত–সাহিত্যের গবেষকদের এক বড় গবেষণার বিষয়। আমি কবির দেওয়া উক্ত নামগুলির অনুসরণে এই খণ্ডের গানগুলিকে 'সন্ধ্যামণি', 'গীতি–বিচিত্রা' ও 'নবরাগমালিকা', এই তিন নামের অধীনে বিন্যস্ত করেছি। 'সন্ধ্যামণি' আখ্যায় কবির প্রেমমূলক গানগুলি সংকলিত হয়েছে। 'গীতি বিচিত্রা' আখ্যায় ভক্তিমূলক ও ধর্মতত্ত্বাশ্রয়ী সঙ্গীতগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'নবরাগ–মালিকা' শ্রেণীতে স্থান পেয়েছে প্রধানত কবির উদ্ভাবিত নবরাগের গানগুলি। সেগুলিতে আছে রাগ–রাগিণীর সূক্ষ্মতম কারুকার্য ও বিস্ময়প্রদ সুরবৈচিত্র্য।

নজরুল ইসলাম কলিকাতা বেতারে প্রতি মাসে একবার 'হারামণি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ–রাগিণীর পুনঃ প্রচলনের জন্যে নূতন গান প্রচার করতেন। সে–সকল গানের অধিকাংশই আজ পাওয়া যায় না। একবার খবর বেরিয়েছিল যে, 'হারামণি' অনুষ্ঠানের জন্যে লেখা নজরুলের উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের একটি খাতা কবির অন্যমনস্কতাবশতঃ হারিয়ে গেছে। কিন্তু সেই হারানো সম্পদ উদ্ধারের কোনো চেষ্টা কি আজ অবধি কোথাও হয়েছে?

প্রতি মাসে দুইবার 'গীতি–বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটি হতো। সেই পৌণে এক ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত হতো গীতি–আলেখ্য। কলিকাতা বেতারে নজরুলের রচিত প্রায় আশিটি গীতি–আলেখ্য প্রচারিত হয়েছে। প্রতিটি গীতি–আলেখ্যে একটি মূল বিষয়কে

আশ্রয় করে ছয়টি করে গান পরিবেশিত হতো। নজরুলের 'শেষ সওগাত' কাব্যের 'কাবেরী-তীরে' সেই অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু 'কাফেলা', 'ছন্দসী' প্রভৃতি নামে যে-সকল গীতি-আলেখ্য প্রচারিত হয়েছিল, তাদের কোনও পাঠ অদ্যাবধি সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। নজরুলের 'ছন্দিতা' নামক গীতিগুচ্ছের 'স্বাগতা', 'প্রিয়া', 'মধুমতী', 'রুচিরা', 'দীপক-মালা', 'মন্দাকিনী' ও 'মণিমালা' নামক গানগুলি সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে সংরচিত। বাঙলা ভাষায় প্রাকৃত মাত্রাচ্ছন্দে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান লিখেছেন ; কিন্তু নজরুল ইসলাম ছাড়া আর কেউই সংস্কৃত বৃত্তচ্ছন্দে বাংলা গানের বাণী বিরচন করতে সক্ষম হননি ; এই রীতিতে বাঙলা সঙ্গীতে নজরুলের অচিন্তিতপূর্ব অবদান তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার বিস্ময়প্রদ পরিচয় বহন করে। তাঁর 'ছন্দসী' নামক সঙ্গীত-আলেখ্যের দুটি অনুষ্ঠানে সংস্কৃত 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা', 'ইন্দ্রবজ্রা', 'মন্দাক্রান্তা', 'শার্দূলবিক্রীড়িত' প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দে বিরচিত তাঁর ১২টি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু সে-সকল মহামূল্যবান গানের বাণী কে সংগ্রহ করবেন? নজরুল ইসলামের এ-সকল অবলুপ্তিমুখীন বিচিত্র গীতাবলী ও কীর্তন-গান সংগৃহীত হলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতিপন্ন হবে যে, নজরুল ইসলাম বাঙলা ভাষার সঙ্গীত-সম্রাট।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' ও 'অন্নপূর্ণা', শ্রীমন্মথ রায়ের 'মহুয়া' ও 'লায়লী-মজনু' প্রভৃতি নাটকের জন্যে নজরুল ইসলাম অনেক গান লিখে দিয়েছিলেন। 'চৌরঙ্গী', 'দিকশূল', 'নন্দিনী', 'পাতালপুরী', 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন' প্রভৃতি বাণীচিত্রের জন্যেও নজরুল বহু গান প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের সকল গান নজরুলের গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধেয়।

নজরুল ইসলাম ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির কাহিনী এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সাপুড়ে' ছায়াছবির কাহিনী রচনা করেন। এ দুটি ছায়াচিত্রের রেকর্ডবদ্ধ বাণী লিপিবদ্ধ করবার কোনো উদ্যোগ অদ্যাবধি কেউ নিয়েছেন বলে শুনিনি। এ দুটি ছায়ানাট্যের সমগ্র পাঠ পাওয়া গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, সন্দেহ নেই।

১৩৯১ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ আমার বয়স ৭৮-বৎসর পূর্ণ হয়ে ৭৯-বৎসর শুরু হবে। বর্তমানে আমি বহুব্যাধিগ্রস্ত জরাজীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধ। প্রায় সতেরো বছর আগে আমার ডান চোখের ছানি কাটা হয়েছিল ; কিন্তু সেই চোখ এখনও কাজে লাগছে না। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমার বাম চোখের ছানি কাটা হয়েছে। এই অবস্থায় আমার পক্ষে নজরুল ইসলামের অবলুপ্তিমুখীন রচনাবলী সংগ্রহের চেষ্টা করা আর সম্ভবপর নয়। আমি আশা করব যে, নজরুল-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং তা সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের নবীন নজরুল-গবেষক ও নজরুল-অনুরাগীরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১

—আবদুল কাদির

পঞ্চম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয়ার্ধের সম্পাদকের নিবেদন

যে-কোনো সমাজ-সচেতন সৃষ্টিশীল সাহিত্য-প্রতিভার মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শে মোড় পরিবর্তন দেখা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম বাঙলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সচেতন কবি ; সুতরাং তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিচারে তাঁর চিন্তা-চেতনার ধারা-বদলের নিদর্শন পাওয়া যাবে এ খুবই স্বাভাবিক। নজরুল-রচনাবলীর পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত তাঁর মনন-ধারার অনুসরণ করে আমার মনে এই ধারণা হয়েছে যে, কবি শেষ পর্যন্ত যে-সামাজিক ভাবনার স্তরে পৌঁছেছেন তাকে বলা চলে Spiritual Communism—আধ্যাত্মিক ধন-সাম্যবাদ। নজরুলের অবশিষ্ট রচনাবলী সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থবদ্ধ হলে তাঁর ভাবাদর্শের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে হয়ত পাঠকদের মনে নূতনতর উপলব্ধি হতে পারে। অতএব তাঁর অবশিষ্ট রচনাসমূহ সংগ্রহ করে নজরুল-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই-ই আমি আশা করছি।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

আবদুল কাদির

নতুন সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকীর প্রাক্কালে তাঁর রচনাবলী একসঙ্গে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ইতঃপূর্বে বাংলা একাডেমী থেকে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় *নজরুল-রচনাবলী* পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। জনাব আবদুল কাদির যখন কবির রচনাবলী সংকলন ও সম্পাদনার কাজ শুরু করেন তখন নজরুলের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ও ধারাবাহিকভাবে নজরুলের সমস্ত রচনা পাওয়া ছিল বেশ দুরূহ ব্যাপার। ফলে তাঁর সম্পাদিত রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কিন্তু *নজরুল-রচনাবলী* সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও অগ্রযাত্রীর ভূমিকা আমরা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব।

বর্তমান রচনাবলী বাংলা একাডেমী প্রকাশিত কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত উক্ত *নজরুল-রচনাবলীরই* আরো সংহত, পূর্ণাঙ্গ, কালানুক্রমিক ও পরিমার্জিত রূপ। এই সংস্করণটির সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বাংলা একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদ-মনোনীত দেশের বরেণ্য নজরুল-বিশেষজ্ঞগণ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য এদেশের মানুষকে তাঁদের আন্দোলনে ও সংগ্রামে, কার্য ও ভাবনায় উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করে আসছে, ভবিষ্যতেও করবে। নজরুল-সাহিত্য সুলভে এদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা আমাদের মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্য ব্যতীত এই প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব ছিল না। এ-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের—বিশেষভাবে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের ব্যক্তিগত উৎসাহ এবং আগ্রহের কথা আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই রচনাবলীর সংকলন, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের এই প্রয়াস যদি নজরুল-অনুরাগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় এবং রচনাবলীর এই নতুন সংস্করণ আদৃত হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা
১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০॥ ২৫ মে ১৯৯৩

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

নতুন সংস্করণের মুখবন্ধ

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাঁচ খণ্ডে নজরুল-রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুদীর্ঘ আঠারো বছর ধরে। কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড থেকে এর প্রথম তিনটি খণ্ড প্রকাশ লাভ করে যথাক্রমে ১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭০ সালে। ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড একীভূত হয় বাংলা একাডেমীর সঙ্গে। তারপর বাংলা একাডেমী থেকে নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৭ সালে এবং পঞ্চম খণ্ড দুই ভাগে ১৯৮৪ সালে (প্রথমার্ধ জুনে ও দ্বিতীয়ার্ধ ডিসেম্বরে) প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৭৫ সালে, তৃতীয় খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৭৬ সালে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ খণ্ড পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮৪ সালে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই মুদ্রিত গ্রন্থের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যায়।

নজরুল-রচনাবলী পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এজন্যে বিশেষ অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করেন। অন্যদিকে একথাও উপলব্ধ হয় যে, আবদুল কাদিরের গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল শ্রমের স্বাক্ষরবহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্পাদিত *নজরুল-রচনাবলীর* বিন্যাসে কিছু যৌক্তিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন এবং এর পাঁচ খণ্ডে যেসব রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এখন তার সন্ধান পাওয়া যাওয়ায়, সেসবও এতে সন্নিবেশিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী নয় সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদনা-পরিষদ গঠন করে *নজরুল-রচনাবলীর* সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পণ করেন।

এই নতুন সংস্করণে যে-সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তা এই :

১. কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলি যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যেমন আগে *অগ্নি-বীণার* পরে *বিষের বাঁশী* এবং তারপরে *দোলন-চাঁপা* বিন্যস্ত হয়েছিল। নতুন সংস্করণে ক্রম হয়েছে *অগ্নি-বীণা, দোলন-চাঁপা, বিষের বাঁশী*। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণের পাঠ তাঁর অভিপ্রেত পাঠ বলে গণ্য করে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

২. কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বইগুলিও কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। এসব বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণের পাঠ যথাসম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা কোনো কোনো খণ্ডে 'সংযোজন' শিরোনামে *রচনাবলীতে* মুদ্রিত হয়। আবার পঞ্চম খণ্ডে এ ধরনের কিছু কিছু রচনা একেক নামের গ্রন্থরূপে সন্নিবেশিত হয়। যেমন, *সঙ্গীতাঞ্জলি, সন্ধ্যামণি, নবরাগমালিকা*। কিন্তু ওসব নামে কোনো গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত না হওয়ায় অনুরূপ বিন্যাস আমরা সংগত বিবেচনা করিনি। ওসব শিরোনামের অন্তর্গত রচনা এবং সংযোজন পর্যায়ের রচনা 'গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা'র পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নজরুল ইসলামের বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থের গান বর্তমান সংস্করণে গৃহীত হয়েছে, তবে স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। আমরা মুদ্রিত গানের পাঠ অনুসরণ করেছি, রেকর্ডে ধারণকৃত বা স্বরলিপিতে বিধৃত গানের পাঠে ভেদ থাকলে তা নির্দেশ করা হয়নি।

৫. নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত যে-সব গ্রন্থের সন্ধান আগে পাওয়া যায়নি কিংবা যেসব গ্রন্থ *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশের পর বেরিয়েছে, সেগুলো বর্তমান সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-ধরনের অনেক গ্রন্থে নজরুলের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে আমরা একই রচনা দুবার মুদ্রণ না করে গ্রন্থপরিচয়ে তার উল্লেখ করেছি।

৬. আবদুল কাদির-প্রদত্ত গ্রন্থপরিচয় অক্ষুণ্ন রেখে 'পুনশ্চ' শিরোনামে গ্রন্থ-সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

৭. নজরুল ইসলামের প্রকাশিত গ্রন্থে বানানের সমতা নেই। সেজন্যে আমরা আধুনিক বানানপদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য বইয়ের নামের বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে, যেমন *বিষের বাঁশী* কিংবা *পূবের হাওয়া*। তবে দ্বিত্ব বর্জিত হয়েছে, যেমন *সর্বহারা*। যে-সব ক্ষেত্রে বানানের কোনো বিশেষত্ব অক্ষুণ্ন রাখা সংগত মনে হয়েছে, সেখানে আমরা কবির সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত সংস্করণের বানান বজায় রেখেছি।

৮. পাঁচ খণ্ডের জায়গায় চার খণ্ডে এবারে *নজরুল-রচনাবলী* প্রকাশিত হলো বলে বিভিন্ন খণ্ডের বিন্যাসের বড় রকম পরিবর্তন ঘটেছে। আবদুল কাদির প্রত্যেক খণ্ডের একটা ভাবগত সামঞ্জস্যের কথা ভেবেছিলেন। তা যে সর্বত্র রক্ষা করা যায়নি, সেকথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন। নতুন সংস্করণে প্রথম খণ্ডে ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নজরুল ইসলামের সকল গ্রন্থ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বাকি সব বই সন্নিবেশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কাব্য ও গীতি-গ্রন্থ এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা ও গান। চতুর্থ খণ্ডে আছে কবির অসুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গদ্য ও নাট্যগ্রন্থ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত গদ্য ও নাট্যরচনা এবং চিঠিপত্র। এই দুই খণ্ডের রচনাবিন্যাসে কালক্রম রক্ষা করা সম্ভবপর হয়নি।

৯. কবির নির্বাচিত কবিতার সংগ্রহ *সঞ্চিতা* এই রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তবে *সঞ্চিতার* প্রকাশ সম্পর্কিত তথ্য ও সূচি প্রথম খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেওয়া হয়েছে।

১০. *মক্তব-সাহিত্য* বইটির একটি কীটদষ্ট কপি নজরুল ইন্সটিটিউটে রক্ষিত আছে। কীটদষ্ট অংশের পাঠ উদ্ধার করা সম্ভবপর না হওয়ায় *রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে *মক্তব-সাহিত্যের* উদ্ধারযোগ্য অংশ সন্নিবিষ্ট হল্যো।

নজরুল-রচনাবলীর সুলভ ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ-নির্ধারণের বিষয়ে সম্পাদনা-পরিষদের সদস্যেরা যে শ্রম ও সময় ব্যয় করেছেন, তার জন্যে আমি তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কাজে কবির রচনার বিভিন্ন সংস্করণ দিয়ে সাহায্য করেছেন নজরুল ইন্সটিটিউট-কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ দেখার সুযোগ পেয়েছি। অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সংগ্রহও আমরা ব্যবহার করেছি। সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য-সচিব সেলিনা হোসেনের উদ্যম ও মোবারক হোসেনের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সকল পর্যায়ে আমাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। আমি এঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

নজরুল-রচনাবলীর সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা একটি দুরূহ কর্ম। বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও নজরুল-বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির এই কাজে অগ্রসর হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। নতুন সংস্করণে আমরা কিছু উৎকর্ষবিধানের চেষ্টা করেছি। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। আমরা আশা করব, ভবিষ্যতে গবেষকেরা *নজরুল-রচনাবলীর* আরো শুদ্ধ ও আরো সম্পূর্ণ সংস্করণ-প্রকাশে উদ্যোগী হবেন।

ঢাকা
১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ॥ ২৫শে মে ১৯৯৩

আনিসুজ্জামান
সম্পাদনা-পরিষদের সভাপতি

সূচিপত্র

কবিতা

গান

ইসলামী গান



যৌবনে কাজী নজরুল ইসলাম





'বন-গীতি'র রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম (১৯৩২)



'ধ্রুব' চলচ্চিত্রে নারদের ভূমিকায় নজরুল



সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর তোলা আলোকচিত্রে নজরুল ইসলাম



কাজী নজরুল ইসলাম



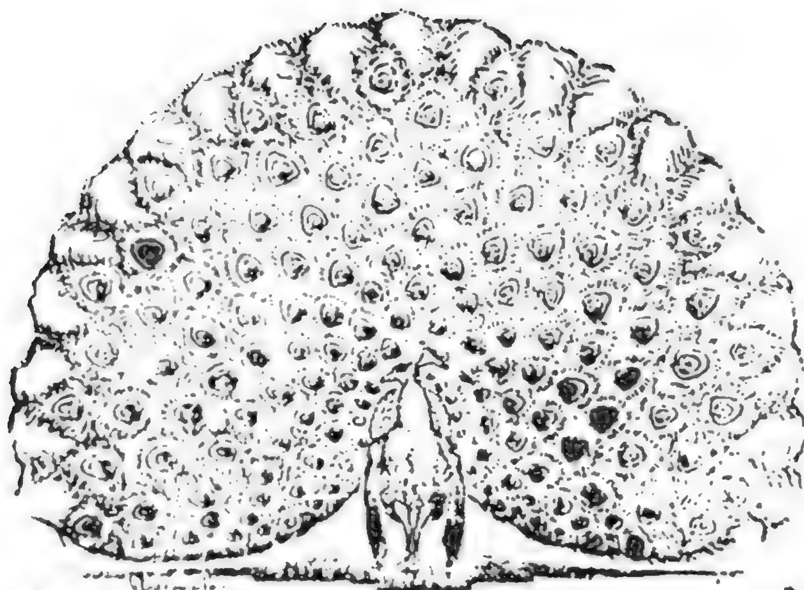
১৯৪০ সালে কাঁচরাপাড়া হাইন্ডমার্শ ইন্সটিটিউট পুরস্কার প্রদানের পর প্রতিযোগীদের সঙ্গে
কাজী নজরুল ইসলাম



কাজী নজরুল ইসলাম, কবি–জায়া প্রমীলা নজরুল, পুত্র সব্যসাচী ইসলাম ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

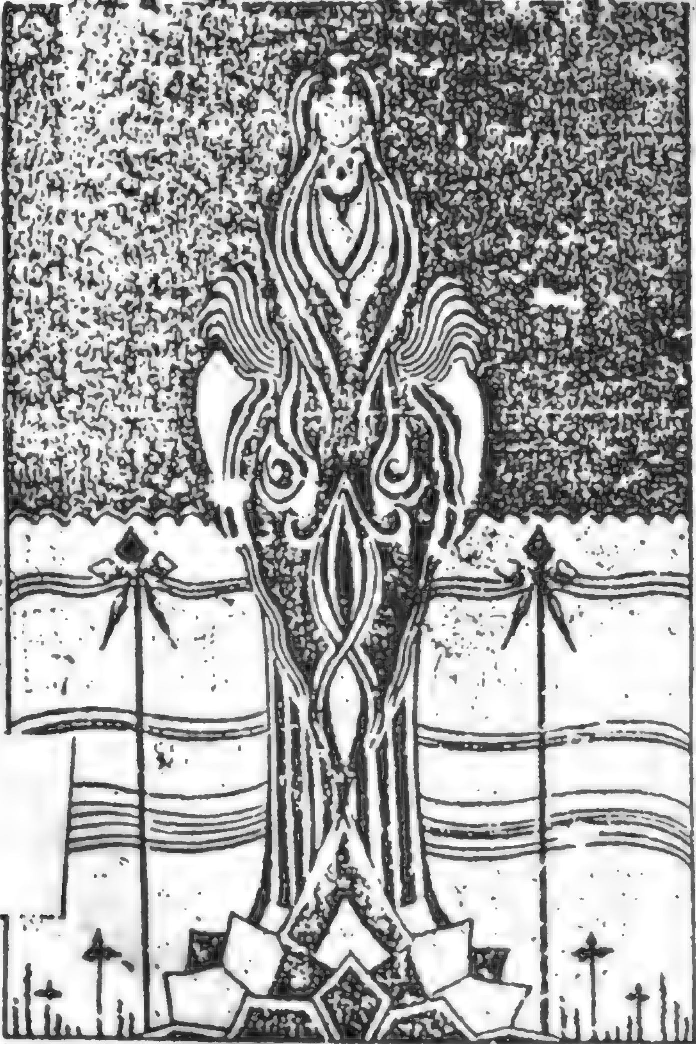


'লাঙল' পত্রিকার প্রচ্ছদ





'সুর-সাকী' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট (১৯৩২)



‘গীতি-শতদল’ গ্রন্থের প্রচ্ছদপট (১৯৩৪)

বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি

বিদায়, হে মোর বাতায়ন-পাশে নিশীথ-জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা, পাণ্ডুর হয়ে এল বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হল বন্ধ আমার জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হল বন্ধ মোদের আলাপন নিরিবিলি।—

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি'
কাঁদিতেছে চাঁদ, "মুসাফির জাগো, নিশি আর নাই বাকি!"
নিশীথিনী যায় দূর বন-ছায় তন্দ্রায়-ঢুলুঢুল,
ফিরে ফিরে চায়, দু'হাতে জড়ায় আঁধারের এলোচুল।
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

চমকিয়া জাগি, ললাটে আমার কাহার নিশ্বাস লাগে?
কে করে বীজন তপ্ত ললাটে, কে মোর শিয়রে জাগে?
জেগে দেখি, মোর বাতায়ন-পাশে জাগিছে স্বপন-চারী,
নিশীথ-রাতের বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সারি!

সারারাত মোরা কয়েছি যে কথা, বন্ধু, পড়িছে মনে,
তোমাদের আর আমার আঁখির পল্লব-কম্পনে।

‘বাতায়ন–পাশে গুবাক তরুর সারি’ কবিতায় কবির হস্তাক্ষর

জাগো ওঠ্ বুই রে ভোরের পাখী
নিশি প্রভাতের কবি।
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া
উদিল আরব-রবি;
ওরে ওঠ্ বুই, নূতন করিয়া
~~তোর বাঁধিন তোর বীণে~~
বেঁধে তোল্ তোর বীণ্!
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে
"আজান" "মুয়াজ্জিন্"।
কাঁদিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে
গ্রহ রবি শশী ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ "সালাতের" ধ্বনি
"খায়রুম্ মিনান্নোম্।"

নজরুল-হস্তলিপি : মরু-ভাস্করের একটি পৃষ্ঠা

সূরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকল বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের প্রভু। কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত যারা পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু।

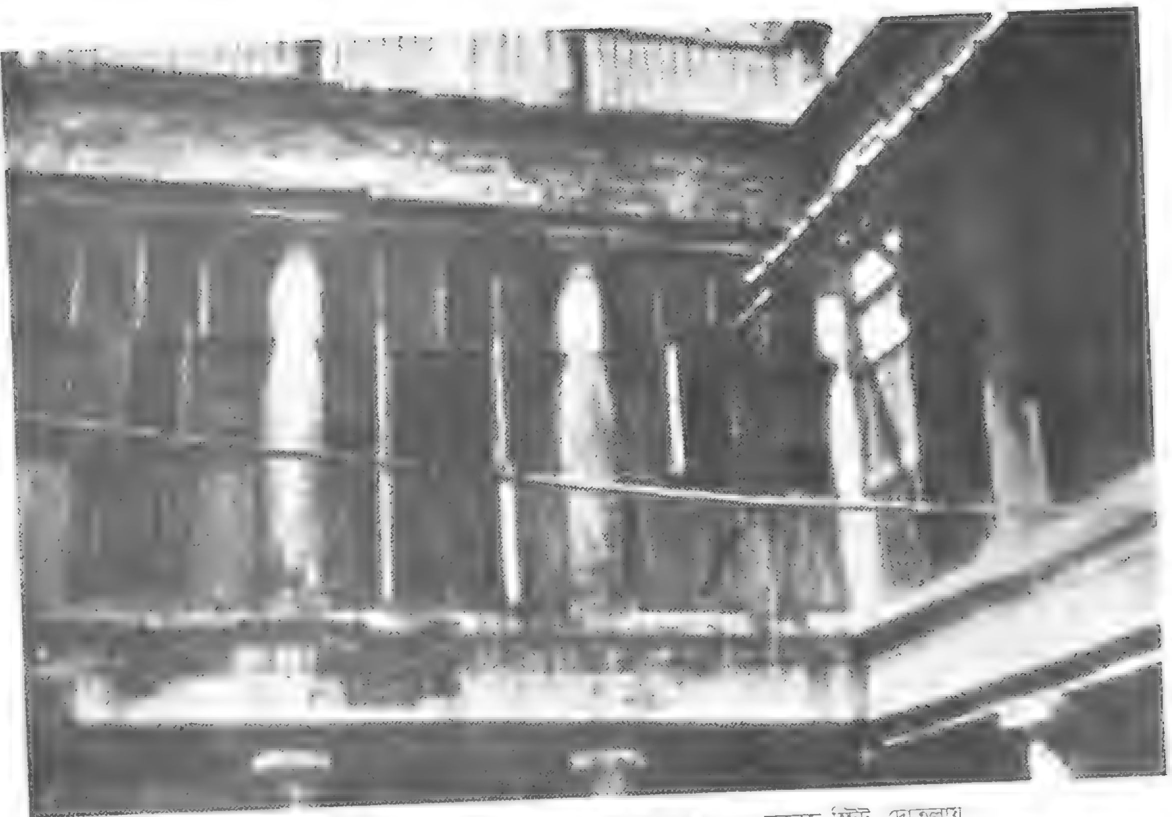
অনুবাদক
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলামের হস্তলিপি : 'কাব্য আমপারা'র একটি পৃষ্ঠা

লেখার রেখার পিঞ্জর খুলে সে কোন উড়িয়া যায় —
শিল্পীর তুলি, সেই লেখাগুলি ধরিয়া রাখিতে চায়।
তুলির লিখন কালে মুছে যায়, লেখা হয়ে যায় বাসি
কালের জোয়ারে দোল খেয়ে ওঠে তাহাদেরই হাসিরাশি।

কাজী নজরুল
১৯৩৪

হাসিরাশি দেবীকে লেখা



'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিস : কলকাতার ৩২/এ কলেজ স্ট্রিট, দোতলায়

নির্ঝর

অভিমানী

টুকরো মেঘে ঢাকা সে
ছোট্ট নেহাৎ তারার মতন সাঁঝবেলাকার আকাশে
সে ছিল ভাই ইরান-দেশের পার্বতী এক মেয়ে।
রেখেছিল পাহাড়-তলির কুটিরখানি ছেয়ে
ফুল-মুলুকের ফুল-রানি তার এক ফোঁটা ঐ রূপে ;
সুদূর হাওয়া পথিক হাওয়া ঐ সে পথে যেতে চুপে-চুপে
চমকে কেন থমকে যেত, শ্বাস ফেলত, তাকে দেখে দেখে
যাবার বেলায় বনের বুকে তার কামনার কাঁপন যেত রেখে।

দুলে দুলে ডাকতো তারে বনের লতা-পাতা,
'তোর তরে ভাই এই আমাদের সারাটি বুক পাতা,
আয় সজনী আয় !'
কইত সে, 'সই' ! এমনি তো বেশ দিন-রজনী যায়,
তোদের বুক যে বড্ডো কোমল, তোরা এখন কচি,
কাজ কি ভাই, এ কঠিন আমার সেথায় শয়ন রচি ?
বলেই চোখের জল-কণাটির লাজে
মানিনী সে বন-বিহগী পালিয়ে যেত গহন বনের মাঝে।
কাঁদন -ভরা বিদ্রোহী সে মেয়ের চপল চলায়
শুকনো পাতা মরমরিয়ে কাঁদত পায়ের তলায়।
দোল্-ঢিলা তার সোহাগ-বেণীর জরিন ফিতার লোভে
হরিণগুলি ছুটত পাছে কে আগে তায় ছোঁবে।
আচমকা তার নয়ন পানে চেয়ে সুদূর হতে
ভির্মি খেত হরিণ-বালা মূর্ছা যেত পথে।

বনের মেয়ে বনের সনে এমনি করে থাকে
একলাটি হায়, জানত না কেউ তাকে।
দিন-দুনিয়ায় সে ছাড়া আর কেউ ছিল না তার,
তবু কিন্তু ভাবতো সে, 'ভাই,
আর কি আমার চাই ?

বনের হরিণ, তরুলতা এই তো সব আমার,
আকাশ, আলো, নির্ঝর, নদী, পাহাড়-তলির বন
এই তো আমার সবই ভালো সবাই আপন জন।
নাই বা দিল কেউ এসে গো একাকিনী আমার ব্যথায় সান্ত্বনা !'
বলেই কেন ঠোঁট ফুলাত; হায় অভাগী জানত না
পলে পলে আপনাকে সে দিচ্ছে ফাঁকি কতই—
অথই মনের থই মেলে না বুঝতে সে চায় যতই।
(দুষ্টু) একটি দেব্‌তা তখন ফুল-ধনুটি হাতে
বধূর বুকে পড়ত লুটি হেসে হেসে ফুল-কুঁড়িদের ছাতে।
বুঝত না তার কি ছিল না, পিষছে বুকের তলা,
ভাবত আমার কাকে যেন অনেক কিছু বলার আছে
এখনো তার হয়নি কিছুই বলা।
এমনি করে ভার হলো গো ক্রমেই বালার একাকিনী জীবন-পথে চলা।

কুঁড়ির বুকে প্রথম এবার কাঁদল সুরভি,
জাগল ব্যথা-অরুণ, যেন বেলা-শেষের করুণ পূরবী।
একটুখানি বুকটি তাহার অনেকখানি ভালোবাসার গন্ধ-বেদনাতে
টনটনিয়ে উঠল, ওগো, স্বস্তি নাই আর কোথাও দিনে রাতে।
কস্তূরী সে হরিণ-বালা উন্মনা আজ উদাস হয়ে ফিরে
নাম-হারা ক্ষীণ নির্ঝর-তীরে-তীরে।
বুঝল না হায়, কি তার ক্ষুধা, বুক যেন চায় কি,
সে বুঝি বা অনেক দূরের সুদূর পারের বাঁশির সুরের ঝি।

এমনি করে কাটে বেলা—
শুধু কেন হঠাৎ কখন যায় ভুলে সে খেলা,
চেয়ে থাকে অনেক দূরে, চোখ ভরে যায় জলে,
কে যেন তার দূরের পথিক বিদায়-বেলায় 'আসি তবে' বলে
গেছে চলে ঐ অজানা অনেক দূরের পথে
আকাশ-পারে চড়ে কুসুম-রথে।
ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমিও পথ জানে না তার,
কতই সে পথ সুদূর ওগো কতই সে যে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার।
আজ সে ভাবে মনে,
(ভাবতে ভাবতে চমকে কেন ওঠে ক্ষণে ক্ষণে)—
পারিনিকো বাসতে অনেক ভালো সে-বার তারে,
অভিমানে তাই সে চলে গেছে সুদূর পারে।

এবার এলে ছায়ার মতন ফিরব সাথে সাথে,
খুবই ভালো বড্ডো ভালোবাসব তারে—
ভাবতে সে আর পারে না কো
চমকে দেখে ছুটছে নিযুত পাগল-ঝোরা যুগল নয়ন-পাতে।

দিনের পরে দিন চলে যায়
এমনি করেই সুখে-দুঃখে, হায় !
একদিন না সাঁঝ-বেলাতে ঝর্না-ধারে ঘর না গিয়ে সে—
কিসমিস আর আঙুর খেতে ধন্না দিয়েছে।
গাচ্ছিল গান ঘুরিয়ে নয়ান সুর্মা-টানা ডাগর-পানা,
শুনছিল গান ঘাসের বুকে এলিয়ে পড়ে বনের যত হরিণ-ছানা।
বাঁশ ছাপিয়ে উঠছিল মীড় নিবিড় গমকে—
আজ যেন সে আনবে ডেকে গানের সুরে সুদূরতমকে।

সুর-উদাসী ঘূর্ণি বায়ু নাচছিল তায় ঘিরে ঘিরে,
বুলবুলি সব ঘায়েল হয়েছিল সুরের তীরে।
সেদিন পথিক দেখলে তারে হঠাৎ সেই সে সাঁঝে,
বললে, আমার চেনা কুসুম কেমন করে ফুটল ওগো
নামহারা এই সুদূর বনের মাঝে ?'

অভিমানে অশ্রু এসে কণ্ঠ গেল চেপে,
রুধতে গিয়ে সে জল আরো নয়ন-জলে উঠল দুচোখ ছেপে।
আজকে আবার পড়লো তাহার মনে
সে-বার অকারণে
কেন দিয়েছিল আমায় অনাদরের বেদন
এই সে মেয়ে, সবার চেয়ে আপন আমার যে-জন।

সইতে সে গো পারেনিকো আমার ভালোবাসা,
তাই সে-বারে মধ্যদিনেই শুকিয়েছিল আমার সকল আশা।
আজো কি হায় তবে
ভালবেসে অবহেলা অনাদরই সইতে শুধু হবে ?
জাঁতা দিয়ে কে যেন তায় বিপুলভাবে পিষলে কলজে-তল,
দারুণ অভিমানে সে তাই বললে 'ও মন, আবার দূরে আরো দূরে চল।'

আরেকটি দিন উষায়
বনের মেয়ে বাহির হলো সেজে সবুজ ভূষায়।

আঙুর পাকার লাবণ্য আর ডালিম ফুলের লাল
রাঙিয়ে দিলে মৌনা মেয়ের দুইটি ঠোঁট আর গাল।
মউল ফুলের মন-মাতানো বাসে
শিশির-ভেজা খস্‌খস্‌ আর ঘাসে
যৌবনে তার ঘনিয়ে দিল কেমন বেদনা সে।
সেদিন নিশি-ভোর
পথহারা সেই পথিক বেশে এল মনোচোর।
চোখভরা তার অভিমানের ঘোর।
অনেক দিনের অনেক কথাই উতল বাতাস লেগে।
হৃদ্‌-পদ্মায় চড়ার মতন উঠল জেগে জেগে।
অই সে আবার উঠল গেয়ে দূরে যাবার গান,
গভীর ব্যথায় বনের মেয়ের উঠল কেঁদে প্রাণ।
বললে, 'প্রিয়তম,
ক্ষম আমায় ক্ষম।'
'তোমায় আমি ভালবাসি'—এই কথাটি তবু
কোনোমতেই কভু
বলতে নারে হতভাগী, বুক ফেটে যায় দুখে!
কইতে-নারার প্রাণ-পোড়ানি কণ্ঠ শুধু রুখে!
মূক হল গো মৌন ব্যথায় মুখর বনের বালা,
কাজের জ্বালা জ্বালিয়ে দিল অনেক আশার গাঁথা কুসুম-মালা।

আজ সকালে ফুল দেখে তার কেন
বুকের তলা মোচড়ে ওঠে যেন।
এক নিমিষের ভুলের তলে ফুলমালা আজ শূলের মতো বাজে।
মনে পড়ে, কখন সে এক ভুলে-যাওয়া সাঁঝে
পথিক-প্রিয় চেয়েছিল তাহার হাতের মালা;
এতই কি রে পোড়া লাজের জ্বালা?
অভাগিনী পারেনিকো রাখতে সেদিন প্রিয়ের চাওয়ার মান!
অমনি তাহার দয়িত্‌-হিয়ায় জাগল অভিমান—
হঠাৎ হলো ছাড়াছাড়ি—
ভালোবাসা রইল চাপা বুকের তলায়, অভিমানটি নিয়ে শুধু হলো
জীবন-ভরে চলল আড়াআড়ি।
আগুন-পাথার পেরিয়ে পথিক যখন অনেক দূরে
কাঁদল ব্যথার সুরে
বনের মেয়ের ভালোবাসা নামলো তখন বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারার মতো,
অ-বেলা হায় সময় তখন গত!

সকাল–সাঁঝে নিতুই এমনি করে
ভাবতে এবার পথিক–বঁধু আসবে বুঝি ঘরে।
পথ–চাওয়া তার শেষ হলো না, পথের হলো শেষ,
হঠাৎ সেদিন লাগল বুকে যমের ছোঁয়ার রেশ।
সব হারিয়ে হতভাগী পাড়ি দিল 'সব–পেয়েছি'র দেশে
তৃপ্তি–হারা তৃষ্ণা–আতুর মলিন হাসি হেসে।

হায় রে ভালোবাসা !
এমনি সর্বনাশা
ভালোবাসার চেয়ে শেষে অভিমানই হয়ে ওঠে বড়ো,
ছাড়াছাড়ির বেলা দোঁহে দুইজনারই আঘাতগুলোই বুকে করে জড়ো !
এমনি তারা বোকা,
ভাবে নাকো এই বেদনাই সুখ হয়ে তার মনের খাতায় রইবে লেখা–জোকা।
জীবন–পথে ক্লান্ত পথিক ঘরের পানে চেয়ে
অনেক দিনের পরে এল বনের পানে ধেয়ে।
পড়ল সেদিন অভিমানের মস্ত দেওয়াল ভেঙে,
দেখল আহা, উঠেছে কি লাল লালে লাল ব্যথায় হিয়া রেঙে !
নিজের উপর নিজের নিদয় নির্মমতার শাপে
কলজেতে সব ছিন্ন শিরা,
মর্ম–জোড়া ঘা শুধু আর বাঁধন–ছেঁড়ার গিরা,
আজ নিরাশায় মুহুর্মুহু বক্ষ শুধু কাঁপে !
ছুটে এল হা হা করে তাই,
আজ যে গো তার অ–পাওয়াকে বুকে পাওয়াই চাই।

ছুটে এল মানিনী সেই চপল বালার আঁধার কুটির–কোণে—
হায়, অভাগী গিয়েছিল চলে তখন যমের নিমন্ত্রণে !
ইরান দেশের ওপারে সে কোকাফ্ মুল্লুকে
নাশপাতি আর খোর্মা খেজুর কুঞ্জে ঘুরল সে।
হায়, সে কোথাও নাই,
ঝর্নাধারের কুটিরে তার ফিরে এল তাই।

আলবোরজের নিচে
বাঁধ–দেওয়া সে ক্ষীণ ঝর্নার নীল শেওলা ছিঁচে।
বাঁধ মানে না, চোখ ছেপে জল ঝরে,
অভাগী আজ ফুটে আছে গোলাপ হয়ে ঘরে।

বনের মেয়ে কইতে নারে বুকের চাপা ব্যথা,
রক্ত-রঙিন গোলাপ হয়ে ফুটে আছে সেথা।
আর ঐ পাতা সবুজ—
ও বুঝি তার নতুন-পাওয়া মুক্তি-পুলক অবুঝ!
ভাগ্যহত পথিক-যুবার শেষের নিশাস উঠল বাতাস ছিঁড়ে,
সে সুর আজো বাজে যেন সাঁঝের উদাস পূরবীটির মীড়ে।
নেইকো কোনো ইতিহাসে লেখা,
এই যে দুটি চির-অভিমানী
ওগো কোথায় আবার হবে এদের দেখা!

বাঁশির ব্যথা

[রুমি]

শোন দেখি মন বাঁশের বাঁশির বুক ব্যেপে কি উঠছে সুর,
সুর তো নয় ও, কাঁদচে যে রে বাঁশরি বিচ্ছেদ-বিধুর
কোন অসীমের মায়াতে
সসীম তার এই কায়াতে।
এই যে আমার দেহ-বাঁশি, কান্না সুরের গুমরে তায়,
হায়রে, সে যে সুদূর আমার অচিন-প্রিয়ায় চুমতে চায়।
প্রিয়ায় পাবার ইচ্ছে যে,
উড়ছে সুরের বিচ্ছেদে।

আশায়

[হাফেজ]

নাই বা পেল নাগাল, শুধু সৌরভেরই আশে
অবুঝ সবুজ দূর্বা যেমন জুঁই-কুঁড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেমনি বিভোর থাক রে প্রিয়ার আশায়
তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোর এ নাসায়।
বরষ-শেষে একটিবারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবে রে তোরও প্রাণে অমনি অবুঝ হরষ।

সুন্দরী

সুন্দরী গো সুন্দরী !
ঘরটি তোমার কোন দোরী ?
সুন্দরী গো সুন্দরী !

কোন সে পথের বাঁকটিতে
কলসি নিয়ে কাঁখটিতে,
থমকে যাও আর চমকে চাও
দুলিয়ে বাহু কুন্দরি ?
সুন্দরী গো সুন্দরী !

কুঞ্জি কই সে কুঞ্জরী—
যার হিয়াটি চঞ্চলে
আকুল তোমার অঞ্চলে ?
সাতনরী আর পাঁচনোরি হার
কোন পথে যায় গুঞ্জরি ?
সুন্দরী গো সুন্দরী !

কোন মন ওঠে মুঞ্জরি—
কেশের তোমার সৌরভে,
পরশ পাওয়ার গৌরবে ?
তূণ ভরি ভ্রূর গুণ ধরি
করছ শিকার কোন পরি ?
সুন্দরী গো সুন্দরী !

কোথায় সে বাও কোন তরী ?
উত্তরীয় সঞ্চরি
করছে হাওয়ার মন চুরি,
অপ্সরী আর হুর-পরী
চলছে তরীর গুণ ধরি,
সুন্দরী গো সুন্দরী !

শাড়ির পাড়ে কোন জরি ?
কর্ণে দোদুল দুল দুলে,

গাল দেখে পারুল ভুলে,
চুমচে ছলে বুলবুলে গো
মুখ ভুলে ফুল-পুঞ্জরি।
সুন্দরী গো সুন্দরী!

ভার কেন আজ মন তোরি?
কিন্নরী ও হুর-পরি
তুল্য তোমার কোন গোরী?
কোন জনে দেয় মন-বেদন এ—
খায় কাঁচা খুন ঘুণ ধরি?
সুন্দরী গো সুন্দরী!

করল সে কে মন চুরি?
মনটি তোমার উন্মনা,
মন-চোরা সে কোন জনা?
আফসোস উহুঁ! আর নেই আঁসু!
উঠছে আঁখে খুন ভরি।
আর কেঁদো না সুন্দরী!
সুন্দরী গো সুন্দরী
ঘর তোমার ভাই কোন দোরী?

মুক্তি*

রানিগঞ্জের অর্জুনপটির বাঁকে
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে—
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে
ত্রিবেণীর ত্রিধারার মতো গেছে একেই মিশে।

---

* ইহা সত্য ঘটনা। ১৯১৬ সালে এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিত-রূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত-বাঁধা ফকিরের মাজার শরিফ' বলিয়া কথিত হয়। —লেখক

তেমাথার সেই 'দেখাশুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা,
গাঁজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হতো ব্যথা।
বাবাজিদের 'ধুনি' দেওয়ার তাপে—
না সে তপের প্রতাপে—
গাছে মোটেই ছিল নাকো পাতা,
উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা।
ভুলে যাওয়ার সে কোন নিশিভোর,
'আজান' যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,
অবাক হয়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
শুকনো নিমের গাছটা গেছে ফলে-ফুলে ছেয়ে!
বাবাজিরাও তল্পি বেঁধে রাতেই
সটকেছেন সব; বোধ হয় পড়েছিলেন বেজায় কাতেই।

অত ভোরেও হেথা
হট্টগোলের লাগল একটা বিষম জনতা।
কিন্তু দেখে লাগল সবার তাক,
এ কোন মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্বাক?
সে কি ভীষণ মূর্তি!
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল
গোলমাল সব স্ফূর্তি।

জট-পাকানো বিপুল জটা,
মেদিনী-চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে এক যেন জটিলতার সৃষ্টি—
অনায়াসে সইতে পারে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি।
পা দুটো তার বেজায় খাটো—বিঘৎ খানিক মোটে,
দন্ত-প্রাচীর লঙ্ঘি অধর ছুঁতেই পায় না ঠোঁটে,
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় খাঁদা,
মস্ত দুটো লোহার শিকল দিয়ে হাত দুটো তার
সব সময়ই বাঁধা,
ভাষাটা তার এতই বাধো বাধো,
কইলে কথা বোঝাই যায় না আদৌ।

ও-পথ বেয়ে যেতে
দুষ্টু ছেলে যা তা দেয় খেতে,
ফকিরও সে এমনি সোজা নেবেই তা মুখ পেতে
বিষ হোক চাই অমৃত হোক।
দেখে অবাক লোক।
শহরে সে কতই কানাঘুষি,—
কেউ বলে, 'চাঁদ তল্পি বাঁধ, তুমি শুধুই ভুসি।'
কেউ বলে, 'ভাই, কাজ কি বকাবকির?
হতেও পারে জবরদস্ত ফকির।'
এই রকম নানান কথা বলে যার যা খুশি।
মৌন ফকির হাসে মুচকি হাসি!

*

দেখতে দেখতে এমনি করে
নিম গাছটার দুবার পাতা গেল ঝরে।
ফকির তেমনি থাকে,—
হঠাৎ সেদিন সেই পথেরি বাঁকে
নিশি-ভোরেই
বোঝাই গরুর গাড়ি হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই
খোট্টা গাড়োয়ান
ভৈরবীতে গেয়ে গজল-গান।
'হো হো' করে হঠাৎ ফকির উঠল বিষম হেসে।
গাড়ি-শুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে এসে
পড়ল হঠাৎ ফকিরেরই ঘাড়ে,
চাকা দুটো চলে গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড়মড়িয়ে উঠল পাঁজর যত!—
গাড়োয়ান তো বুদ্ধিহত
ক্ষ্যাপার মতো ছুটোছুটি করছে থতমত!
পুলিশ ছিল কাছেই
গাড়োয়ানেরে ধরে বাঁধলে ঐ নিম্ব গাছেই।
লাগল হুড়োহুড়ি—
তেমন ভোরেও লোক জমল সারাটা পথ জুড়ি।

রক্তাক্ত সে চূর্ণ বক্ষে বদ্ধ দুটি হাত
থুয়ে ফকির পড়ছে শুধু কোরানের আয়াত,
হয়নি মুখে আদৌ ব্যথার কোমল কিরণ-পাত;

স্নিগ্ধ দীপ্তি সে কোন জ্যোতির আলোয়
ফেললে ছেয়ে বাইরের সব কুৎসিত আর কালোয়,
সে কোন দেশের আনন্দ-গীত বাজল তারি কানে,
সেই-ই জানে,—
শিশুর মতো উঠল হেসে চেয়ে শূন্য পানে।
ধ্যানমগ্ন ফকির হঠাৎ চমকে উঠে চায়,
কুণ্ঠিত সে গাড়িওয়ালা গাছে বাঁধা, হায় !
প্রহার-ক্ষতে রক্ত বয়ে যায় !
আকুল কণ্ঠে উঠল ফকির কেঁদে,—
'ওগো, আমার মুক্তিদাতায় কে রেখেছে বেঁধে ?
এ কোন জনার ফন্দি,—
বাঁধন যে মোর খুলে দিলে তায় করেছে বন্দি ?'

ভোরের সারা আকাশ-আলো ব্যেপে
উঠল কেঁপে কেঁপে
দরবেশের সে ব্যাকুল বাণী অমৃত-নিষ্যন্দী !
চিরবদ্ধ হাতের শিকল অমনি গেল খুলে,
ঝুলি হতে দশটি টাকা তুলে
লাল-পাগড়ির হাতে গুঁজে বললে, 'শুন ভাই,
কোনো দোষ এর নাই,
নির্দোষ এ অবোধ গাড়োয়ান,
এ মলে যে মরবে সাথে তিনটি ছোট্ট জান !'
নিমের ডালে হাজার পাখি উঠল গেয়ে গান !
পায়ে ধরে কেঁদে পুলিশ কয়,
'এও কখনো হয় ?
ওগো সাধু, অর্থ-লালসায়
আমি শুধু হবো কি আজ বঞ্চিত দয়ায় ?
তা হবে না কভু,
পরশমণির বিনিময়ে পাথর নেবো প্রভু ?'
বুক বেয়ে তার ঝরে অশ্রুনীর—
দুহাত ধরে তুলে তায় ফকির
বলে, 'বাবা, মোছ, এ অশ্রুলোর,
মুক্তি হবে তোর।
ঐ যে মুদ্রাগুলি
গাড়োয়ানে দে তুলি' !—

নিম্ব গাছের সকল পাতা
ঝরঝরিয়ে পড়ল ঝরে—আর হলো না কথা।

চিঠি

বিনু!
তোমায় আমায় ফুল পাতিয়েছিনু,
মনে কি তা পড়ে?—
যেদিন সাঁঝে নতুন দেখা বোশেখ মাসের ঝড়ে
আমবাগানের একটি গাছের তলায়
দুইটি প্রাণই দুলেছিল হিন্দোলেরই দোলায়?
তুমি তখন পা দিয়েছ তরুণ কৈশোরে
দোয়েল-কোয়েল-ঘায়েল-করা করুণ ঐ স্বরে
জিজ্ঞাসিলে আবছায়াতে আমায় দেখে—'কে?'
সে স্বরে মোর অশ্রুজল চক্ষু ছেপে যে!
বলতে গিয়ে কাঁপল আমার আওয়াজ,—'বিনু, আমি!'
চমকে তুমি লাল করে গাল পথেই গেলে থামি।
আঁখির ঘন কালো পল্লবে
চটুল তোমায় চাউনি চোখের হঠাৎ নিবল যে!
পানের পিকে-রাঙা হিঙুল বরণ
আকুল অধর আলতা-রাঙা চরণ,
শিউরে শিউরে উঠল কেঁপে অভিমানের ব্যথায়,
বরষ পরে এমন করে আজ যে দেখা হেথায়!
নলিন-নয়ান হয়ে মলিন সজল
মুছলে তোমার চোখের কালো কাজল!

*

তারপর ঘেরে ঝড় ঝঞ্ঝা বৃষ্টি করকায়
অভিমান আর সঙ্কোচেরই নিদয় 'বোরখা'য়
উঠিয়ে দিল; কেউ জানিনি কখন দুজনে
অনেক আগের মতোই আবার আকুল কূজনে
উঠেছিনু মেতে!
তারপর হায়, ফিরে এনু আবার ঘরে রেতে
আমবাগানের পাশের খেতে বদল করে মালা,—
ফের বিদায়ের পালা!

দুজনারই শুধু ফুলের মালার চুম্বনে
ছাড়াছাড়ি হলো কেয়ার সেই নিঝুম বনে।

হয়নি তো আর দেখা,
আজো আশায় বসেই আছি একা
সেই মালাটির শুকনো ফুলের বুকনোগুলি ধরে
আমার বুকের 'পরে।
এ তিন বরষ বিনা কাজের সেবায় খেটে যে
কেউ জানে না, বিনু, আমার কেমন কেটেছে!
আজো তেমনি কান্না-ধোওয়া সজল যে জ্যোৎস্না,
তেমনি ফুটছে হেনা-হাস্না,—
তুমিই শুধু নাই!
সিন্ধুপারের মৌন-সজল ইন্দুকিরণ তাই
তোমার চলে যাওয়ার দেশে যেতে
অভিসারের গোপন কথা এনেছে এ রেতে!
সেবার এবার শেষ হয়েছে, আজ যে কাজের ছুটি,
তাইতে, বিনু, হেসে কেঁদে খাচ্ছি লুটোপুটি!
অচিন দেশে আগের স্মৃতি নাই বা যদি জাগে,
তাইতো বিনু চিঠি দিনু আগে।
এখন শুধু একটি কথা প্রিয়,
বিচ্ছেদেরও বেদন দিয়ো—বুকেও তুলে নিয়ো।
ব্যথায়-ভরা ছাড়াছাড়ি মিলন হবে নিতি,
সেথাও মোদের এমনি করে, প্রিয়তম!—ইতি।

আরবি ছন্দের কবিতা

[আরবি ছন্দ যেমন দুরূহ, তেমনি তড়িৎ-চঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে-ওঠা ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি এক রকম শুনালেও সত্যি সত্যিই এক রকমের নয়,—তা একটু বেশি মন দিয়ে দেখলে বা পড়লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কি মাত্রা আর অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি-চপলতা ফুটে উঠেছে।

আরবি ছন্দ-সূত্রের যেখানে যেখানে × চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।]

(১) হজয্।

× ×
'মফা আয়্লুন্ মফা আয়্লুন্
সূত্র : × ×
মফা আয়লুন্ মফা আয়লুন্।'

কটির কিঙ্কিণ
চুড়ির শিঞ্জিন
বাজায় রিন ঝিন
ঝিনিক রিন রিন।
কাঁকন-কম্পন
আকুল কনকন
নাচায় মোর মন,
অধীর দিন দিন।

(২) রবজ্।

'মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্
সূত্র :
মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্।'

বিল্‌কুল নদীর
মন আজ অধীর,
ছলছল দু তীর
চঞ্চল অথির।

বর্ষার মাতন
প্রাণ উনমাদন,
ঝঞ্ঝার কাঁদন
শনশন গতির।

(৩) রমল্।

×× ××
'ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্
সূত্র : ×× ××
ফা এলাতুন্ ফা এলাতুন্।'

খামখা হাঁসফাঁস
দীর্ঘ নিশ্বাস,
নাই রে নাই আশ
মিথ্যা আশ্বাস।

হাসতে প্রাণ চায়,
অমনি হায় হায়
বাজল বেদনায়
ক্রন্দন উচ্ছ্বাস।

×
(৪) মোত্রা কারেব।

× ×
ফাউলুন ফাউলুন
সূত্র : × ×
ফাউলুন ফাউলুন
কলস-জল।
আবার বল—
ছলাৎ ছল
ছলাৎ ছল।

ঝিনিক ঝিন
ঝিনিক ঝিন
বলুক ফিন
কাঁকন মল।

×
(৫) সরীএ।
'মস্‌তফ্‌ আলুন্‌ মস্‌তফ্‌ আলুন্‌
সূত্র : ×
মফ্‌ উলাতুন।'
লোকজন বেবাক
একদম অবাক
এমনি গান গায়!

কণ্ঠের গমক
চমকায় চমক
বিজলি ঝঞ্ঝায়।

×
(৬) খফীফ।
× ×
'ফাএলাতুন্ মোস্তাফ্ আলুন্
সূত্র : × ×
ফাএলাতুন্।'
আস্‌ল ফাল্গুন আসমান জমিন
হাসল বিলকুল।
গাইল বুলবুল শোনি ওই অলস
ওঠ রে খিল খুল।

(৭) মষ্‌তস।
× ×
'মস্‌তফ্ আলুন্ ফাএলাতুন্।
সূত্র : × ×
মস্‌তফ্ আলুন্ ফাএলাতুন্।'

সই তুই শুধাস—কেমন কই হায়,
প্রাণ মন উদাস কোন সে বেদনায়।
উন্মন হিয়ার ক্লান্ত ক্রন্দন
কোন মোর পিয়ার বক্ষ-পুট চায়।

(৮) মোজারা।
× × ×
মফাআয়লুন্——ফাএলাতুন্
সূত্র : × × ×
মফাআয়লুন্——ফাএলাতুন্।

ডাগর চোখ তোর বিজলি চঞ্চল,
কাহার চিন্তায় কান্না ছলছল?
হিঙুল লাল গাল পাংশু পাণ্ডুর,
অধর নীল রঙ, সিক্ত অঞ্চল।

×
(৯) কামেল্।

× ×
মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্
সূত্র : × ×
মোতাফাআলুন্ মোতাফাআলুন্

কুহু-তান মদির
করে প্রাণ অধীর,
জেগে ওঠ অলস
চেয়ে দ্যাখ বধির !

মন-আগুন দ্বিগুণ
এ যে সেই ফাগুন
এ যে সেই বাসর
মদন আর রতির !

(১০) ওয়াফের।

× ×
মোফাআলতুন্ মোফাআলতুন্
সূত্র : × ×
মোফাআলতুন্ মোফাআলতুন্।'

কানের আর দুল দোদুল দুল দুল
কোথায় তার তুল কোথায় তার তুল ?
দুলের লালচায় গালের লাল ছায়
শরম পায় গাল নধর তুলতুল।

×
(১১) মোতদারিক।

× ×
ফাএলুন্ ফাএলুন্
সূত্র : × ×
ফাএলুন্ ফাএলুন্

তোর অর্থই
মন যতই
জিনতে চাই
সই ততই

পাইনে থই,
পাইনে থই।
মন শুধায়
কই সে কই?

×
(১২) তবীল।

× ×
'ফউলুন্ মোফাআয়লুন্
সূত্র : × ×
'ফউলুন্ মোফাআয়লুন্।'

চোখের জল !
আবার আয় ভাই,
হিয়ায় মোর
সোহাগ তোর চাই।
তুহার তুল
দরদ বুঝবার
আপন জন
এমন কেউ নাই॥

×
(১৩) মদীদ।

× × ×
'ফাএলাতুন্ ফাএলুন্
সূত্র : × × ×
'ফাএলাতুন্ ফাএলুন্।'

হায়, এ কান্নার
নাইকো শেষ,

কই মা শান্তির
　　　　কোন সে দেশ?
কোন সে দূর পথ
　　　　অন্তে হায়
পান্থ–বাস যায়
　　　　নাই মা ক্লেশ।

×
(১৪) বসীত্।

　　　　　　×
'মোস্ত্আফআলুন্ ফাএলুন্
সূত্র :
　　　　　　×
'মোস্তাফআলুন্ ফাএলুন্।'

কোন বন এমন
　　　　শ্যাম শোভায়
প্রাণ–মন জুড়ায়
　　　　চোখ ডুবায়?
বুলবুল ভোমর
　　　　বন–বিহগ
চঞ্চল এমন
　　　　আর কোথায়?

(১৫) মন্সরহ্।

× ×
'মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন্
সূত্র :
× ×
মফ্উলাতুন্ মস্তফ্আলুন্।'

বাদলা–থমথম
　　　　তায় ঘোর নিশীথ,
মেঘলা মাঘ মাস
　　　　হায় হায়, কি শীত!
শূন্য ঘর মোর
　　　　নাই কেউ দোসর—
ঝুরছে বায় হায়—
　　　　অন্তর তৃষিত!

×
(১৬) করীব।

× × ×
সূত্র : ‘মফাআলুন্ মফাআলুন্ ফাএলাতুন্।’

জীবন-সাধন
প্রাণের বাঁধন—
হায় সে কান্নাই।
পেলেম আদর
পেলেম সোহাগ,
মনটি পাই নাই।

×
(১৭) যদীদ।

× × × × × ×
সূত্র : ‘ফাএলাতুন্ ফাএলাতুন্ মফাআয়্‌লুন্।’

রক্ত-লাল বুক
সিক্ত চোখ মুখ
হাসায় লোক ভাই।

ছিন্ন-কণ্ঠের
কান্না শুনবার
ধরায় কেউ নাই।

(১৮) মশাকেল্।

সূত্র : ‘ফাএলাতুন্ মফাআয়্‌লুন্ মফাআয়্‌লুন্।’

আজকে শেষ গান
বিদায় তারপর
বিদায় চাই ভাই !
বেদনা সইতেই
জনম যার, নাই
শান্তি তার নাই !

প্রিয়ার দেওয়া শরাব

কোঁকড়া অলক মুছেছিল ঘাম-ভেজা লাল গাল ছুঁয়ে,
কাঁপছিল, সে যাচ্ছে যেন বায়ু ঝাউ-এর কচি ডাল নুয়ে।
কম্পিত তার আকুল অধর-পিষ্ট ক্লেশে সামলে নে
শরাব-ভরা সোরাই হাতে গভীর রাতে নামলে সে।
দরদ-ভিজা মিহিন সুরে গাইল গজল আফসোসের,
চোখ দু'টি নীর-সিক্ত যেন ফাগুন-বুকে ছাপ পোষের।
কোন বেদনার কন্টকে গো বুকের বসন দীর্ণ তার,
ছিন্ন-তারের সেতার-সম কণ্ঠে বাণী ক্ষিপ্ত তার।
এলিয়ে দিয়ে আমার পাশে ব্যথায় বিবশ ম্লান তনু
কইল ক্লেশে, 'অস্ত আমার আমার চেয়েও ক্লান্ত, উঁহু।'
শঙ্কা-আকুল মুখটি শেষে কানের কাছে চুমিয়ে সে
জিজ্ঞাসিল, 'আজ কি তবে শ্রান্ত আশেক ঘুমিয়েছে?'
ঘুমিয়ে সে কে রইতে পারে কান্তা এসে ডাক দিলে,
নিঝুম ঘুমে ঘুমন্তেরও মুখ ফোটে যে—বাক মিলে!...
কম্পিত বাম হাতটি থুয়ে স্পন্দিত মোর বুকটিতে
শরাব নিয়ে আরেক হাতে কইল চুমুক এক দিতে।
বেহেশতি সে শরাব, না তা আঙুর-গলা রস ছিল,
জিজ্ঞাসি নাই,—কানে শুধু মিনতি তার পশছিল।
এমনি বেশে মুক্ত কেশে এমনি নিশুত রাত্তিরে
শরাব নিয়ে এসে প্রিয়া রাখলে বুকে হাত ধীরে,
প্রেমের এমন বেদ্দিল কাফের কে আছে গো বিশ্বে সে
শরাব সোরাই এক নিশেষে পান করে না নিঃশেষে?
ওগো কাজী, খামখা নীরস শাস্ত্রবাণী কও কাকে?
ভাঙতে পারে পিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো তৌবাকে!

মানিনী বধূর প্রতি

মূক করে ঐ মুখর মুখে লুকিয়ে রেখো না,
ওগো কুঁড়ি, ফোটার আগেই শুকিয়ে থেকো না!

• হাফিজের 'জল্‌কে আ-শফ্‌তা ও খুয়ে কর্দা ও খন্দানে লবেমস্ত্' শীর্ষক গজলের ভাবাবলম্বনে।

মলিন নয়ান ফুলের বয়ান মলিন এ-দিনে!
রাখতে পারে কোন সে কাফের আশেক বেদীনে?
রুচির-চারু পারুল বনে কাঁদছ একা জুঁই,
বনের মনের এ বেদনা কোথায় বল থুই?
হাসির-রাশির একটি ফোঁটা অশ্রু অকরুণ,
হাজার তারার মাঝে যেন একটি কেঁদে খুন!
বেহেশ্‌তে কে আনলে এমন 'আবছা বেথার রেশ!'
হিমের শিশির ছুঁয়ে গেছে হুর পরিদের দেশ!
বরষ পরের দরশনের কই সে হরষণ,
মিলবে না কি শিথিল তোমার বাহুর পরশন?
শরম টুটে ফুটুক কলি শিশির-পরশে
ঘোমটা ঠেলে কুণ্ঠা ফেলে সলাজ হরষে!

গান

সুর—হিন্দুস্থানি কাজরি

আজ নতুন করে পড়ল মনে
মনের মতনে,
এই শাওন-সাঁঝের ভেজা-হাওয়ায়
বারির পতনে।
কার কথা আজ তড়িৎ লিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন শিখায়?
ভোলা যে মোর দায় হল হায়
বুকের রতনে।
আজ উতল ঝড়ের কাতরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মৌন হলো মুখর আমার মুখ!
জোলো হাওয়ার ঝাপটা লেগে,
অনেক কথা উঠল জেগে
তাই পরান আমার বেড়ায় মেগে
সে কার যতনে!
এই শাওন-সাঁজের ভেজা হাওয়ায়
বারির পতনে।

গরিবের ব্যথা

এই যে মায়ের অনাদরে ক্লিষ্ট শিশুগুলি,
পরনে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধূলি,—
সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি,
খিদের জ্বালায় ক্ষুণ্ণ, তাতে জ্বরের ধুকধুকানি,
অযতনে বাছাদের হায়, গা গিয়েছে ফেটে,
খুদ্-ঘাঁটা তাও জোটে না কো সারাটি দিন খেটে,—
এদের ফেলে ওগো ধনী, ওগো দেশের রাজা,
কেমন করে রোচে মুখে মণ্ডা-মিঠাই-খাজা?
ক্ষুধায় কাতর যখন এরা দেখে তোমায় খেতে,
সে কি নীরব যাচ্ঞা করুণ ফোটে নয়নেতে!
তা দেখে ছি অকাতরে কেমনে গেল অন্ন?
দাঁড়িয়ে পাশে ভুখা শিশু ধূলি-ধূসর বর্ণ।
রাখছ যে চাল মরাই বেঁধে, চারটি তারই পেলে,
আ-লোনা মাড়-ভাত খেয়ে যে বাঁচে এসব ছেলে।
পোশাক তোমার তর-বেতরের, নেইকো এদের তেনা,
যে-কাপড়ে মোছো জুতো, এদের তাও মেলে না।
প্যাটরা-ভরা কাপড় তোমার, এরা মরে শীতে,
সারাটি রাত মায়ে-পোয়ে শুয়ে চাঁচ-গলিতে।
তোমরা ছেলের চুমো খেয়ে হাসো কতই সুখে,
এদের মারা কাঁদেই শুধু ধরে এদের বুকে।
ছেলের শখের কাকাতুয়া তারও সোনার দাঁড়
এরা যে মা পায় না গো হায় একটি চুমুক মাড়।
তোমাদের সব খোকাখুকির খেলনার অন্ত নাই,
খেলনা তো মা ফেলনা—এদের মায়ের মুখে ছাই—
তেলও দেয়নি একটু মাথায়, চুল হলো তাই কটা,
এই বয়সে কচি শিশুর বাঁধল মাথায় জটা!
টো-টো করে রোদে ঘুরে বর্ণ হলো কালি,
অকারণে মারে ধরে লোকে দেয় আর গালি।
একটুকুতেই তোমাদের সব ছেলে কেঁদে খুন
বুক ফাটলেও কষ্টে তারা মুখটি করে চুন,
এই অভাগা ছেলেরা মা দাঁড়িয়ে রয় একটেরে,
কে বোঝে ঐ চাউনি সজল কী ব্যথা চাপছে রে।

তোমাদের মা খোকার একটু গা-টি গরম হলে,
দশ ডাক্তার দেখে এসে ; এরা জ্বরে মলে—
দেয় না মা কেউ একটি চুমুক জলও এদের মুখে,
হাড়-চামড়া হয়ে মরে মায়ের বুকে ধুঁকে।
আনার আঙুর খায় না গো মা রুগণ তোমার ছেলে,
এরা ভাবে, রাজ্যি পেলুম মিছরি একটু পেলে।
তোমাদের মা খোকাখুকি ঘুমায় দোলায় দুলে,
এদের ছেলের ঘুম পেলে মা ঘুমায় তেঁতুল-তলে
একলাটি গো মাটির বুকে মাচ্ছয় থুয়ে মাথা ;
পাষাণ-বুকও ফাটবে তোমার দেখো যদি মা তা।
দুঃখ এদের কেউ বোঝে না, ঘেন্না সবাই করে,
ভাবে, এসব বালাই কেন পথেই ঘুরে মরে?
ওগো, বড় মুস্কিই যে পোড়া পেটের দায় ;
দুশমনেরও শাস্তি যেন হয় না হেন, হায়!
এত দুখেও খোদার নাকি মঙ্গলেচ্ছা আছে,
এইটুকু যা সান্ত্বনা মা, এ-গরিবদের কাছে।

তুমি কি গিয়াছ ভুলে

তুমি কি গিয়াছ ভুলে?—
তোমার চরণ-স্মরণ-চিহ্ন আজো মোর নদীকূলে
মুছিল না প্রিয়, মুছিল না তার বুকে যে লিখিলে লেখা।
মাঝে বহে স্রোত, দু'কূল জুড়িয়া চরণ-স্মরণ রেখা।
বন্যার ঢল, জোয়ার, উজান আসে যায় ফিরে ফিরে,
ও চরণ-লেখা মুছিল না মোর বালুচরে নদীতীরে।
উর্ধ্বে ধূসর সান্ধ্য আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রের লেখা।
নিম্নে আমার শূন্য বালুচরে তোমার চরণ-রেখা!

কূলে আসি একা বসি,
তব মুখ-মদ-গন্ধের ফুলবন ওঠে নিশ্বসি।
কূলে একা বসি ঢেউ গণি আর চাহি ওপারের তীরে,
প্রভাতে যে পাখি উড়িল সে সাঁঝে ফিরিল না আর নীড়ে।

এই বালুচর শূন্য ধূসর আমার এ মরুভূমি,
কেন এ শূন্যে চরণ-চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেলে তুমি?
হেরিনু, আকাশে ওঠেনিকো চাঁদ—শূন্য আকাশ কাঁদে,
ও বিরাট বুক ভরিয়া তোলে কি এটুকু ক্ষীণ চাঁদে?

চলে যাওয়া দিনগুলি
মনের মানিক-মঞ্জুষা হতে খুলে দেখি, রাখি তুলি।
কতবার আসি ফিরে যাই বেয়ে তোমার দেশের নদী,
কত বধূ আসে জল নিতে সেথা তুমি সেথা আসো যদি।
তোমার কলসি-হিল্লোল যদি মোর নায়ে এসে লাগে,
দুটি চেনা চোখ সন্ধ্যা-দীপের মতো যদি সেথা জাগে!...
কতদিন সাঁঝে হইয়াছে মনে, তোমারে বা দেখিয়াছি,
তরণীতে কার চেনা বাঁশি শুনে আসিয়াছ কাছাকাছি।
আঁচল ভরিয়া জলে-ভেজা রাঙা হিজলের ফুলগুলি
কুড়াতে তোমার ঘোমটা খসেছে, এলোখোঁপা গেছে খুলি।

সর্পিল বাঁকা বেণী,
ওর সাথে ছিল মোর আঙুলের কতই না চেনাচেনি!
ঐ সে বেণীর বিনুনিতে মোর বাঁধা পড়েছিল হিয়া,
কতদিন তারে ছাড়াতে চেয়েছে আমার আঙুল দিয়া!—
দাঁড়ায়েছ আসি, সোনাগোধূলিতে আকাশ গিয়াছে ভরে,
পিছনের কালো বেণীতে সন্ধ্যা বাঁধা পড়ে কেঁদে মরে!
বাঁশিতে কাঁদিয়া ফিরিয়া এসেছি তরণী বাহিয়া দূরে,
আমার নিশাসে নাহি নেভে যেন প্রদীপ তোমার পুরে।...
ছল করে যবে জল নিতে যাও—নদী তরঙ্গে হায়
তরঙ্গ কি গো দুলে ওঠে মনে, কলসি ভাসিয়া যায়?
নয়নের নীরে তুমি ডোবো, ডোবে কলসি নদীর জলে?
অথবা কাঁখের কলসিই শুধু ডুবাতে শিখেছ ছলে?

যত চাই সব ভুলি,
আঁধার ভরিয়া ডাকে আঙনের তব ঝাউগাছগুলি।
তব অঙ্গুলি-ইঙ্গিত যেন ওদের শীর্ণ শাখা,
হাহাকার করে আকাশে চাহিয়া, বাতাসে ঝাপটে পাখা!
ভুলিবার কথা ভুলে যাই, হায় বন্দিনী মোর পাখি,
পিঞ্জর-পাশে আসি যাই ফিরে, আকাশে থাকিয়া ডাকি!

ফিরে আসি একা নীড়ে,
ক্লান্ত পক্ষ বসে বসে ভাবি ভাঙা মোর তরু-শিরে।
দশ দিক ভরে কলরব করে অচেনারা ছুটে আসে,
তুমি নাই অই ঘিরিয়া সবাই বসে মোর আশেপাশে।
না চাহিতে কেহ পাখায় আমার বাঁধে অসহায় পাখা,
তৃষিত অধরে নিয়ে যায় ভরে বেদনার বিষ মাখা।

আজ আমি অপরাধী,
অভিমান-জ্বালা নিবারিতে নিতি অপরাধ করি—কাঁদি!
যে আসে এ বুকে তাহারি হৃদয়ে তোমার হৃদয় খুঁজি,
খুঁজিতে খুঁজিতে হারায়ে ফেলেছি মোর হৃদয়ের পুঁজি।
শূন্য আকাশে ওঠেনাকো চাঁদ, উল্কারা আসে ছুটে,
আগুনের তৃষা মিটাই তাদের অগ্নি-অধর-পুটে!

তুমি যাও নাই ভুলে?
মম পথ পানে চাহ কি আজিও সন্ধ্যা-প্রদীপ তুলে?
নিবাও নিবাও ও সন্ধ্যা-দীপ, চাহিও না মোর পথে,
মরণের রথে উঠেছে—উঠিত যে তব সোনার রথে।
কুসুমের মালা দুদিনে শুকায়, থাক অতীতের স্মৃতি—
শুকাবে না যাহা—আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি!

হবে জয়

আবার কি আঁধি এসেছে, হানিতে
ফুলবনে লাঞ্ছনা?
দুহাত ভরিয়া ছিটাইছে পথে
মলিন আবর্জনা!
করিয়ো না ভয়, হবে হবে লয়,
আপনি এ উৎপাত;
আগুনের দুটো খড়কুটো লয়ে,
লুকোবে অকস্মাৎ!
উৎপাতে তার যদি সখা তব
ফুলবনে ফুল ঝরে,

নব বসন্তে নব ফুলদল
আসিবে কানন ভরে।
অসুন্দরের প্রতীক উহারা
ফুল ছেঁড়া শুধু জানে,
আগে যে চলিবে উহারা টানিবে
কেবলি পিছন পানে।
বন্ধু, ওদের উহাই ধর্ম,
তাই বলে তুমি আগে
চলিবে না ভয়ে? ফুটাবে না ফুল
তোমার কুসুম-বাগে?
অভিশাপ-শ্বাস দমকা বাতাস
প্রদীপ নিবায় বলে
আলো না জ্বালায়ে রহিবে বসিয়া
আঁধার আঙিনা-তলে?
সূর্যে ঢাকিতে ছুটে যায় নভে
পায়ের তলার ধূলি,
সূর্য কি তাই লুকাবে আকাশে
আপনার পথ ভুলি?
তড়িত-প্রদীপ জ্বালাইয়া আসো
তোমরা বরষা-ধারা,
তোমাদের জলে সব ধুলো মাটি
নিমিষে হইবে হারা।
যে অন্তরের দীপ্তিতে তব
হাতের মশাল জ্বলে,
ফুৎকারে তাহা নিভিবে না,
চল আগে চল নব বলে!
পথ ভুলাইতে আসিয়াছে যারা
চাহিবে ভুলাতে পথ,
লঙ্ঘিতে হবে উহাদের রচা
মরু, নদী, পর্বত।
পিছনের যারা রহিবে পিছনে,
উহাদের চিৎকারে
তুমি কি বন্দি হইয়া রহিবে
আঁধারের কারাগারে?

মাথার ওপরে শত বাজপাখি,
তবু পারাবত দল
আলোক-পিয়াসী চঞ্চল-পাখা
লুণ্ঠিছে নভতল।

বন্ধু গো, তোলো শির!
তোমারে দিয়াছি বৈজয়ন্তী
বিংশ শতাব্দীর।
মোরা যুবাদল, সকল আগল
ভাঙিতে চলেছি ছুটি,
তোমারে দিয়াছি মোদের পতাকা,
তুমি পড়িও না লুটি।
চাহি না জানিতে—বাঁচিবে অথবা
মরিবে তুমি এ পথে,
এ পতাকা বয়ে চলিতে হইবে
বিপুল ভবিষ্যতে।
তাজা জীবন্ত যৌবন-অভিযান—
সেনা মোরা আছি,
ভূমিকম্পের সাগরের মতো
সুখে প্রাণ ওঠে নাচি;
চাহ বা না চাহ, মোরা যুবাদল
তোমারে চালাব আগে,
ব্যগ্র-চরণ চলিবে অগ্রে
আমাদের অনুরাগে!
মৃত্যুর হাতে মরে তো সবাই
সে-ই শুধু বেঁচে থাকে—
মানুষের লাগি যে চির বিরাগী,
মানুষ মেরেছে যাকে!

বিধাতার পরিহাস—
রচেছে মানুষ যুগে যুগে তার
অমানুষী ইতিহাস!
সবচেয়ে বড় কল্যাণ তার
করিয়াছে যে মানুষ,
তারেই পাথরে পিষিয়া মেরেছে
মেরেছে বিঁধিয়া ক্রুশ!

যে-হাতে করিয়া এনেছে মানুষ
স্বর্গ-অমৃত-বারি,
সে হাত কাটিয়া ধরার মানুষ
প্রতিদান দিল তারি!
দেয় ফুল ফল ছায়া সুশীতল—
তরুরে আমরা তাই
ঢিল ছুঁড়ে মারি, ফুল ছিঁড়ি তার
শেষে শাখা ভেঙে যাই!
সেই অভিমানে ফুটিবে না ফুল?
ফলিবে না তরুশাখে
সু-রসাল ফল? দিবে না সে ছায়া
যে আঘাত করে—তাকে?
চন্দ্রে যাহারা বলে কলঙ্কী
চন্দ্রালোকেই বসি,
করুণায় হাসি দেখে তাহাদের
দিই না গলায় রশি!
অসহ সাহসে আমরা অসীম
সম্ভাবনার পথে
ছুটিয়া চলেছি, সময় কোথায়
পিছে চাবো কোনো মতে।
নিচের যাহারা—রহিবে নিচেই
ঊর্ধ্বে ছিটাবে কালি,
আপনার অনুরাগে চলে যাব
আমরা মশাল জ্বালি।
যৌবন-সেনাদল তব সখা,
বন্ধু গো নাহি ভয়,
পোহাবে রাত্রি, গাহিবে যাত্রী
নব আলোকের জয়!

পূজা-অভিনয়

মানুষের পদ-পূত মাটি দিয়া দেবতা রচিছে পূজারী দল।
সে দেবতা গেল স্বর্গে, মানুষ রহিল আঁকড়ি মর্ত্তল।

দেবতারে যারা করিছে সৃজন, সৃজিতে পারে না আপনারে,
আসে না শক্তি, পায় না আশিস, ব্যর্থ সে পূজা বারেবারে।
মাটির প্রতিমা মাটিই রহিল, হায় কারে দিবে শক্তি বর,
দেবতার বর নিতে পারে হাতে, হেথা কোথা সেই শক্তিধর।

বিগ্রহ-চালে হাসে বুড়োশিব, বলে, 'দেখো দেখো দশভুজা,
নেংটি পরিয়া নেংটে ইঁদুর ভক্তরা এল দিতে পূজা!
গণেশ-ভক্ত ইঁদুরে বুদ্ধি হস্তীকর্ণ লম্বোদর,
কার্তিকে মোর সাজায়েছে দেখ, যেন উহাদের মেয়ের বর!
উহাদের দেব-সেনাপতি পরে ছেঁড়া কটি-বাস আধহাতি,
সেনাদল হলো চরকা বুড়ি গো, তরুণেরা হলো জোলা তাঁতি!
মাথা কেটে আর অস্ত্র হেনেও হয় না স্বাধীন আর সকল,
সুতা কেটে আর বস্ত্র বুনিয়া কেল্লা করিবে ওরা দখল!

বলি দেয় ওরা কুমড়ো ছাগল, বড় জোর দুটো পোষা মহিষ,
মহিষাসুরেরে বলি দিতে নারে, বলে, 'মাটো ওটা তুই বধিস!'
লক্ষ্মীর হাতে অমৃত-ভাণ্ড, লক্ষ্মী ছেলেরা তাহাই চায়,
তাই পূজা করে ওরা ধনিকেরে—লক্ষ্মীবাহন কালপ্যাঁচায়!
অমৃত চাহিছে, ওরা তো চাহে না মোর কণ্ঠের বিষের ভাগ,
ওদেরি মরুতে জঙ্গলে চরে তোমার বাহন সিংহ বাঘ।
দেখিয়া তরাসে পলায় উহারা বাহন দেখিয়া যাদের ভয়,
সিংহ-বাহিনী! পূজিয়া তোমায় তারাই করিবে অসুর জয়?
সেথা তব হাতে টিনের খড়্গ, সারা গায়ে মোড়া ঝালতা রাং,
দেখে হাসি আর ঘুমাই শ্মশানে, ভক্তের দল জোগায় ভাং।
কোন রূপ তব ধ্যান করে ওরা, শুনিবে? শুনিয়া যাও ঘুমোও,
শ্বশুরবাড়ির ফেরত যেন গো, অসুর-বাড়ির ফেরত নও!

বাণী মেয়ে মোর বোবা হয়ে বসে ভাঙা বীণা কোলে বসিয়ে রয়
কথায় কথায় সেথা সিডিশন, কি জানি কখন জেলের ভয়।
নিজেরা বন্দি, তাই দেখো, ওরা ধরিয়া ও কোন কন্যারে
কলা-বউ করে রেখেছে আদের হীন কামনার কারাগারে!
ভূতো ছেলেগুলো কলেজেতে পড়ে, কে জানে ক' ল্যাজ পায় হোথায়,
কেহ শাখা-মৃগ হইয়াছে উঠি আধ্যাত্মিক উঁচু শাখায়!'
এমনি শরৎ সৌরাশ্বিনে অকাল বোধনে মহামায়ার
যে পূজা করিল বধিতে রাবণে ত্রেতায় স্বয়ং রামাবতার,
আজিও আমরা সে দেবী পূজার অভিনয় করে চলিয়াছি।

লঙ্কা–সায়রী রাবণ ধরিয়া ছুটিতে ফাঁসায়ে দেয় কাছি!
দুঃসাহসীরা দুর্গা বলিয়া হয়তো কাছিতে পড়ে ঝুলে,
দেবীর আসন তেমনি অটল, হয়তো ঈষৎ ওঠে দুলে।
কে ঘুচাবে এই পূজা–অভিনয়, কোথায় দুর্বাদলশ্যাম
ধরণী–কন্যা শস্য–সীতারে উদ্ধারিবে যে নবীন রাম।
দশমুখো ঐ ধনিক রাবণ দশদিকে আছে মেলিয়া মুখ,
বিশ হাতে করে লুণ্ঠন তবু ভয়ানক ওর ক্ষুধিত বুক।
হয়তো গোকূলে বাড়িছে সে আজ উহারে কল্য বধিবে যে,
গোয়ালার ঘরে খেঁটে–লাঠি–করে হলধর–রূপী রাম সেঝে।

চাষার গান

আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি
সমান রে ভাই।
কে রাবণ করে হরণ
দেখব রে তাই॥

আমাদের ঘরের বেটির কেশের মুঠি
ধরে নে যায় সাগর–পারে।
দিয়ে হাত মাথায় শুধু
ঘরে বসে রইব না রে।
যে লাঙল–ফলা দিয়ে
শস্য ফলাই মরুর বুকে।
আছে সে লাঙল আজও
রুখব তাতেই রাজার সিপাই॥

পাঁচনির আশীর্বাদে
মানুষ করি ঠেঙিয়ে বলদ,
সে পাঁচন আছে আজও
ভাঙব তাতেই ওদের গলদ।
যে–জলে ভাসছি মোরা
চল সে জলে ওদের ভাসাই॥

পাথুরে পাহাড় কেটে
নিঙাড়ি নীরস ধরা
আনি রে ঝর্ণাধারা
এ নিখিল শীতল-করা।
আজো সে গাঁইতি শাবল
আমাদের হাতে কি নাই।।

খেতেছে ফসল যারা
ভাঙিয়া বেড়ার কাঁটা
এবারে পূজোয় নতুন
বলি দে সে সব পাঁঠা।
দেখিবি আসবে ফিরে
শক্তিময়ী আবার হেথাই।।

জীবনে যাহারা বাঁচিল না

জীবন থাকিতে বাঁচিলি না তোরা
মৃত্যুর পরে রবি বেঁচে
বেহেশতে গিয়ে বাদশার হালে,
আছিস দিব্যি মনে এঁচে !
হাসি আর শুনি !—ওরে দুর্বল,
পৃথিবীতে যারা বাঁচিল না,
এই দুনিয়ার নিয়ামত হতে—
নিজেরে করিল বঞ্চনা,
কিয়ামতে তারা ফল পাবে গিয়ে?
ঝুড়ি ঝুড়ি পাবে হুর পরি?
পরির ভোগের শরীরই ওদের
দেখি শুনি আর হেসে মরি !
জুতো গুঁতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে খেয়ে
আরামসে যার কাটিল দিন,
পৃষ্ঠ যাদের বারোয়ারি ঢাক
যে চাহে বাজায় তা ধিন ধিন,

আপনারা সয়ে অপমান, যারা
করে অপমান মানবতার,
অমূল্য প্রাণ বহিয়াই মলো,
মণি মাণিক্য পিঠে গাধার
তারা যদি মরে বেহেশতে যায়,
সে বেহেশত তবে মজার ঠাই,
এইসব পশু রহিবে যথা, সে
চিড়িয়াখানার তুলনা নাই!
খোদারে নিত্য অপমান করে
করিছে খোদার অসম্মান,
আমি বলি—ঐ গোরের টিবির
ঊর্ধ্বে তাদের নাহি স্থান!
বেহেশতে কেহ যায় না এদের,
এরা মরে হয় মামদো ভূত!
এইসব গরু ছাগলে সেবিবে
হুরি পরি আর স্বর্গদূত?
এই পৃথিবীর মানুষের মুখে
উঠিল না যার জীবনে জয়,
ফেরেশতা তার দামামো বাজাবে,
ভাবিতেও ছি ছি লজ্জা হয়!
মেড়াতেও যারা চড়িতে ডরায়,
দেখিল কেবল ঘোড়ার ডিম,
বোররাকে তারা হইবে সওয়ার,—
ছুটাইবে ঘোড়া! ততঃকিম!

সকলের নিচে পিছে থেকে, মুখে
পড়িল যাদের চুন কালি,
তাদেররি তরে কি করে প্রতীক্ষা
বেহেশত শত দীপ জ্বালি?
জীবনে যাহারা চির-উপবাসী,—
চুপসিয়া গেল না খেয়ে পেট,
উহাদের গ্রাস কেড়ে খায় সবে,
ওরা সয় মাথা করিয়া হেঁট,
বেহেশতে যাবে মাদল বাজায়ে
কুঁড়ের বাদশা এরাই সব?

খাইবে পোলাও কোর্মা কাবাব !
আয় কে শুনিবি কথা আজব !
পৃথিবীতে পিঠে সয়ে গেল সব
বেহেশ্‌তে পেটে সহিলে হয় !
অত খেয়ে শেষে বাঁচিবে তো ওরা ?
ফেঁসে যাবে পেট সুনিশ্চয় !

হাসিছ বন্ধু ? হাসো হাসো আরো
এর চেয়ে বেশি হাসি আছে,
যখন দেখিবে 'বেহেশ্‌ত' বলে
ওদেরে কোথায় আনিয়াছে !
শহরের বাসি আবর্জ্জনা ও
ময়লা, চড়িয়া 'ধাপামেলে'
ভাবে, চলিয়াছে দার্জ্জিলিঙ্গে—
হাওয়া বদলাতে চড়ে রেলে !
বদলায় হাওয়া রেলেও তা চড়ে,
তার পরে দেখে চোখ খুলে
স্তূপ করে সব ধাপার মাঠেতে
আগুন দিয়াছে মুখে তুলে !

ডুবুরি নামায়ে পেটেতে যাদের
খুঁজিয়া মেলে না 'ক' অক্ষর,
তারাই কি পাবে খোদার দিদার,
পুছিবে 'মাআরফতি' খবর !
পশু জগতেরে সভ্য করিয়া
নিজেরা আজিকে বুনো মহিষ,
বুকেতে নাহিক জোশ তেজ রিশ,
মুখেতে কেবল বুলন্দ রীশ,
তারাই করিবে বেহেশ্‌তে গিয়ে
হুরি পরিদের সাথে প্রণয় !
হুরি ভুলাবার মতোই চেহারা,
গাছে গাছে ভূত আঁতকে রয় !
দেহে মনে নাই যৌবন তেজ
ঘুণ-ধরা বাঁশ হাড্ডিসার,
এইসব জরা জীর্ণেরা হবে
বেহেশ্‌ত–হুরির দখলিকার !

নেংটি পরিয়া পরম আরামে
যাহারা দিব্য দিন কাটায়,
জিজ্ঞাসে যারা পায়জামা দেখে—
'কি করিয়া বাবা পরো ইহায়?
পরিয়া ইহারে করেছ সেলাই
অথবা সেলাই করে পরো?'
এরাই পরিবে বাদশাহি সাজ
বেহেশতে গিয়ে নবতর?

বন্ধু, একটা মজার গল্প
শুনিবে? এক যে ছিল বুনো,
পুণ্য করিতে করিতে একদা
তুলিল পটল হয়ে ঝুনো!

জগতের কোনো মানুষের কোনো
মঙ্গল কভু করেনি সে,
কেবলি খোদায় ডাকিত সে বনে
বুনো পশুদের দলে মিশে।
শিখেনিকো কভু সভ্যতা কোনো,
আদব কায়দা কোনো দেশের,
বেহেশতে যাবে ভরসায় শুধু
ভুলিয়া পুণ্য করিল ঢের!
মরিল যখন, গেল বেহেশতে;
দলে দলে এল হুর পরি,
এল ফেরেশতা, বস্তা বস্তা
এল ডাঁশা ডাঁশা অপ্সরী।
রংবেরঙের সাজ পরা সব,—
বুকে বুকে রাঙা রামধনু;
চলিতে লচকি পড়িছে কাঁকাল
যৌবন থরথর তনু।
সারা গায়ে যেন ফুটিয়া রয়েছে
চম্পা-চামেলি-জুঁই বাগান,
নয়নে সুর্মা, ঠোঁটে তাম্বুল,
মুখ নয় যেন আতর-দান!
যেন আধ-পাকা আঙ্গুর, করে
টলমল মরি রূপ সবার,

পান খেলে—দেখা যায়, গলা দিয়ে
গলে গো যখন পিচ্ তাহার।
দলে দলে আসে দল্‌মল্ করে
তরুণী হরিণী করিণী দল,
পান সাজে, খায়, ফাঁকে ফাঁকে মারে
চোখা চোখা তীর চোখে কেবল !
বুনো বেচারার ঝুনো মনও যেন
ডাঁশায়ে উঠিল এক ঠেলায়,
হ্যাঁকচ্ প্যাঁকচ্ করে মন তার
চায় আর শুধু শ্বাস ফেলায় !
পড়িল ফাঁপরে, কেমন করিয়া
করিবে আলাপ সাথে এদের !
চাহিতেই ওরা হাসিয়া লুটায়,
হাসিলে কি জানি করিবে ফের !
উসখুস করে, চুলকায় দেহ,
তাই তো, কি বলে কয় কথা,
ক্রমেই অতিয়া উঠিতেছে মন
আর কত সয় নীরবতা !
ফস করে বুনো আগাইয়া গিয়া
বসিল যেখানে পরিরা সব
হাসে আর শুধু চোখ মারে, সাজে
পান, আর করে গল্পগুজব।
পানের বাটাতে হঠাৎ হেঁচ্‌কা
টান মেরে বলে, 'বোনরে বোন
আমারে দিস তো পানের বাটাটা,
মইও দুটো পান খাই এখন !'
যত হুরি পরি অপ্সরীদল—
বেয়াদবি দেখে চটিয়া লাল।
বলে, 'বেতমিজ ! কে পাঠাল তোরে,
জুতো মেরে তোর তুলিব খাল !
না শিখে আদব এলি বেহেশতে
কোন বন হতে রে মনহুশ ?
এই কি প্রণয় নিবেদন রীতি
জংলি বাঁদর অলম্বুশ !'

বলেই চালাল চটাপট জুরি ;
বুনো কেঁদে কয়, 'মাওইমাও
আর বেহেশতে আসিব না আমি
চাহিব-না পান ছাড়িয়া দাও !'
আসিল বেহেশত ইনচার্জ ছুটে
বলে পরিদের, 'করিলে কি ?
ওযে বেহেশতি !' পরিদল বলে,
'ঐ জংলিটা ? ছিছি ছিছি !
এখনি উহারে পাঠাও আবার
পৃথিবীতে, সেথা সভ্য হোক,
তারপর যেন ফিরে আসে এই
হুরি পরিদের স্বর্গলোক !'
সকল পুণ্য তপস্যা তার
হইল বিফল, আসিল ফের
নামিয়া ধুলার পৃথিবীতে—হায়,
দেখিয়া দোজখে হাসে কাফের !
বন্ধু, তেমনি স্বর্গ ফেরতা
ভারতীয় মোরা জংলি ছাগ,
পৃথিবীরই নহি যোগ্য, কেমনে
চাহিতেই যাই ও বেহেশত বাগ !
পিষিয়া যাদেরে চরণের তলে
'দেউ' 'জিন' করে মাতামাতি,
দৈত্য পায়ের পুণ্যে তারাই
স্বর্গে যাবে কি রাতারাতি ?
চার হাত মাটি খুঁড়িয়া কবরে
পুঁতিলে হবে না শাস্তি এর,
পৃথিবী হইতে রসাতল পানে
ধরে দিক ছুঁড়ে কেউ এদের।

আগাইয়া চলে নিত্য নূতন
সম্ভাবনার পথে জগৎ
ধুঁকে ধুঁকে চলে এরা ধরে সেই
বাবা আদমের আদিম পথ !
প্রাসাদের শিরে শূল চড়াইয়া
প্রতীচী বজ্রে দেখায় ভয়,

বিদ্যুৎ ওদের গৃহ-কিঙ্করী
নখ-দর্পণে বিশ্ব বয়।
তাদের জ্ঞানের আর্শিতে দেখে
গ্রহ শশী তারা—বিশ্বরূপ,
মণ্ডুক মোরা চিনিয়াছি শুধু
গণ্ডুষ-জল-বদ্ধ কূপ!
গ্রহে গ্রহান্তে উড়িবার ওরা
রচিতেছে পাখা, হেরে স্বপন,
গরুর গাড়িতে চড়িয়া আমরা
চলেছি পিছনে কোটি যোজন।
পৃথিবী ফাড়িয়া সাগর সেঁচিয়া
আহরে মুক্ত-মণি ওরা
উর্ধ্বে চাহিয়া আছি হাত তুলে
বলহীন মাজা-ভাঙা মোরা।
মোরা মুসলিম, ভারতীয় মোরা
এই সান্ত্বনা নিয়ে আছি
মরে বেহেশতে যাইব বেশক,
জুতো খেয়ে হেথা থাকি বাঁচি!
অতীতের কোন বাপ-দাদা কবে
করেছিল কোন যুদ্ধ জয়,
মার খাই আর তাহারি ফখর
করি হর্দম জগৎময়।
তাকাইয়া আছি মূঢ় ক্লীবদল
মেহেদি আসিবে কবে কখন,
মোদের বদলে লড়িবে সেই যে,
আমরা ঘুমায়ে দেখি স্বপন!
যত গুঁতো খাই, বলি, 'আরো আরো
দাদারে আমার বড়ই সুখ!
মেরে নাও দাদা দুটো দিন আরো
আসিছে মেহেদি আগন্তুক!'
মেহেদি আসুক না আসুক, তবে
আমরা হয়েছি মেহেদি-লাল
মার খেয়ে খেয়ে খুন ঝরে ঝরে—
করেছে শত্রু হাড়ির হাল!

বিংশ শতাব্দীতে আছি বেঁচে
আমরা আদিম বন-মানুষ,
ঘরের বৌ ঝি সম ভয়ে মরি
দেখি পরদেশি পর-পুরুষ!

ওরে যৌবন-রাজার সেনানী
নয়া জমানার নও জোয়ান,
বনমানুষের গুহা হতে তোরা
নতুন প্রাণের বন্যা আন্!
যত পুরাতন সনাতন জরা
জীর্ণেরে ভাঙ, ভাঙরে আজ!
আমরা সৃজিব আমাদের মতো
করে আমাদের নব-সমাজ।
বুড়োদের মতো করে তো বুড়োরা
বাঁচিয়াছে, মোরা সাধিনি বাদ,
খাইয়াদাইয়া খোদার খাসিরা
এনেছে মুক্তি ষাঁড়ের নাদ্।
আমাদের পথে আজ যদি ঐ
পুরানো পাথর-নুড়িরা সব
দাঁড়ায় আসিয়া, তবু কি দু'হাত
জুড়িয়া করিব তাদের স্তব?
ভাঙ ভাঙ কারা রে বন্ধহারা
নব জীবনের বন্যা-ঢল!
ওদেরে স্বর্গে পাঠায়ে, বাজারে
মর্তে মোদের জয় মাদল!
চিরযৌবনা এই ধরণীর
গন্ধ বর্ণ রূপ ও রস
আছে যতদিন চাহি না স্বর্গ!
চাই ধন, মান, ভাগ্য, যশ!
জগতের খাস দরবারে চাই—
হাতের কাছে যে রয়েছে অমৃত
তাই প্রাণ ভরে করিব পান।

দীওয়ান-ই-হাফিজ

গজল–১

জাগো সাকি হামদরদি, জাম–বাটিতে দাও শরাব,
চুলোয় যাক এই দুঃখ–ব্যথা, ধুলোয় ঢাকুক সব অভাব !—১

ভর-পিয়ালা দস্তে দে দোস্ত, মস্ত হয়ে বুঁদ সেই নেশায়,
দিই ফেলে এই শির হতে ঐ সুনীল আকাশ–গাঁঠরিটায় !—২

ভয় কি সখি? করবে নিন্দা শাস্ত্র–শকুন বন্ধুরা?
বদনামে মোর পরোয়া থোড়াই ! চালাও পান্সি, দাও সুরা !—৩

নেশার দারু জরুরি ভাই, খোদ–দেমাকির নাশতে জাত,
ঢালো শরাব, আত্ম ভোলাও, চেতন আমার হোক নিপাত !—৪

দহন–দারুণ দিল্ ছেপে মোর উঠছে যে শ্বাস বহ্নি–শিখ,
কতই কাঁচা শুষ্ক হৃদয় পুড়ছে তাতে অহর্নিশ !—৫

সব অজানা জানার মাঝে প্রেম–দেওয়ানা ফিরনু ভাই,
দুনিয়া জুড়ে দেখনু ঢুঁড়ে দিল্–দরদি বন্ধু নাই !—৬

তারি তরে জান কাঁদে মোর, সেই জান–ই মোর দিল–আরাম,
করল যে মোর এই জীবনের সকল সোয়াদ–সুখ হারাম !—৭

গুলবাগে আর দেবদারুকে দেখতে কারুর রয় না সাধ,
দেখলে প্রিয়ার সরল ছাঁদ আর চাঁদনি–সফেদ বদন–চাঁদ !—৮

মাটির ভাঁটির রস ছিল যা, সব পিয়েছিস, কিসের দুখ?
যাও পিও আর স্ফূর্তি চালাও, চালাও—মৌজে দিন কাটুক।—৯

দিবানিশি পাস যে ব্যথা, ওরে হাফিজ, দু'দিন থাম !
আসবে প্রিয়া দিল–জানিয়া, পূর্ণ হবে মনস্কাম !—১০

গজল—২

বুক-ব্যথানো বেণুর বেদন বাজিয়েছিল কাল রাতে
বনশিওয়ালা—আল্লাতালা রাখুন তারে আহ্লাদে !

করলে আমায় ক্লান্ত এতই তার সে মুরজ মুরঝা সুর—
বোধ হলো মোর বিশ্ব-নিখিল কেবল কান্না-বেদনাতুর !

পার্শ্বে ছিল ছুকরি সাকি ঠোঁট-কূপে যার 'আব-হায়াত',
মুখ আলো আর কেশ কালো যার খেলায় সদাই দিন ও রাত।

বিহ্বল আমার তৃষ্ণা দেখে পাত্রে আরো ঢালল মদ,
মদ-মদালস কইনু আমি চুম্বি সাকির পুণ্য পদ—

'মুক্তি' দিলে আমার 'অহম'—দুঃখ থেকে আজ তুমি,
মদ ঢেলে যেই করলে অধর নাচ-পেয়ালার নাচ-ভূমি।

আল্লা তোমায় আগলে রাখুন আলাই-বালাই আপনি নে,
সাকি ! তোমার সর্বলোকে কল্যাণ হোক সব দিনে।'

হাফিজ যখন আপন-হারা কোথায় বা তোর 'কায়কাউস',
কায়কোবাদের কুলমুলুক ?—এক তিল বরাবর তখতাউস।

গজল—৩

হাঁ, এয় সাকিই, শরাব ভর লাও
বোলাও পেয়ালি চালাও হরদম্ !
প্রথম প্রেম-পথ সহজ-সুন্দর
শেষের দিক তার ঢালাও-কর্দম !

আব-হায়াত—মৃতসঞ্জীবনী-সুধা ! কায়কাউস ও কায়কোবাদ—এঁরা প্রাচীন পারস্যের প্রবল পরাক্রান্ত বাদশা ছিলেন। তখততাউস—ময়ূর-সিংহাসন।

কস্‌ম তার ভাই　　ভোরের ব্যয় ভায়
অলকগুচ্ছের　　যে-বাস্‌ কান্তার,
বহুৎ দিল খুন　　করলে কুন্তল
কপোল-চুম্বী　　চপল ফাঁদদার।
যদিই কন তোর　　সাগ্নিক ঐ পীর
মুসল্লায় কর　　শরাব-রঙ্গিন,
পথেই রথ যার　　অচিন নয় তার
কোথায় পথ-ঘাট　　খারাব সঙ্গিন্‌।
আরাম সুখ মোর　　হারাম বিলকুল
পথের মঞ্জিল　　পিয়ার মুলকের,
নকিব হরদম　　হাঁকায় হামদম—
পথিক ! দূরপথ　　গাঁঠরি তুল ফের !
অন্ধকার রাত,　　ঊর্মি-সংঘাত,
ঘূর্ণাবর্তও　　তুমিল গর্জে,
বেলায় বাস যার　　বুঝবে ছাই তার
পথের ক্লেশ মোর　　সমুন্দর যে !

তামাম মোর কাম　　শুধুই বদনাম,
নিজের দোষ ভাই　　নিজের দোষ সে,
গোপন দূর ছাই　　রয় কি নাম তার
রাজ-সভায় যার　　চর্চা জোর-সে।
প্রসাদ চাস ? বাস্‌,　　গাফিল হোস্‌নে
হাফিজ হরদম　　হাজির-মজলিস !
এ-সব তঞ্চট্‌　　ঝক্কি-ঝঞ্ঝট্‌
ছোড় দে, তারপর　　পিয়ার খোঁজ নিস।

গজলটির ধরতা এই :

'আলাইয়্যা আইয়োহাস্‌ সা'কি আদ্দির্‌ কা-সা ওয়্যানা বিল্‌হা !'

হাঁ, এয়্‌ সা'কি শরাব্‌ ভর্‌ লাও বোলাও পেয়ালি চালাও হর্‌দম্‌ !

কুঞ্চিকা : সা'কি—যে শরাবের পেয়ালা হাতে দেয়। শরাব—মদ্য (দ্রাক্ষারস)। হরদম—সর্বদা। কসম—দিব্য, শপথ। দিল্‌—হৃদয়। ফাঁদদার—ফাঁদযুক্ত, অর্থাৎ কোঁকড়া। পীর—গুরু। মুসল্লা—যে মাদুর বা কাপড়ের উপর দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া হয়। সঙ্গিন—দুস্তর। হারাম—নিষিদ্ধ। বিল্‌কুল—সমস্ত। মঞ্জিল—পান্থনিবাস। পিয়ার—প্রিয়ার। মুল্‌কের—মুলুকের, দেশের। নকিব—তূর্যবাদক। হাম্‌দম্‌—বন্ধু, সখা। সমুন্দর—সমুদ্র। তামাম—সমস্ত। কাম-কাজ। জোর-সে—খুব জোরে। গাফিল—অলস, যে হেলায় কাজ নষ্ট করে। হাফিজ—কবির নাম। মজলিস—সভা। তঞ্চট—গোলমাল। ছোড় দে—ছেড়ে দাও।

গজল—৪

হে মোর সুন্দর ! চাঁদের চাঁদমুখ
তোমার রৌশন রূপ দেখেই,
রূপের জৌলুস্ তোমার টোল্‌দার
চিবুক–গণ্ডের কূপ থেকেই।
ওষ্ঠে প্রাণ ! হায় দেখতে চাও তায়
গোল্–বদন ঐ ঘোমটা–হীন,
জানাও ফরমান জ্বলবে আর না
নিববে জান্‌টার মোমটা ক্ষীণ।
তোমার কেশপাশ্, আমার দিল্, বাস,—
জমবে জোট সেই এক জাগায়,—
আরজ এই ক্ষীণ মিটবে কোন দিন?
আর না বিচ্ছেদ,— দেক লাগায় !
নার্গিস–অক্ষি ! হরলে সব সুখ
তোমার নয়নার অত্যাচার,
মস্ত চাউনির হস্তে তাই কই
যাক সতীত্বও হত্যা ছার !
খুলবে এইবার নয়ন–পাত তার
বদ–নসিব মোর নিঁদ–আতুর,
আজ যে প্যারির উজলি স্মিরতি'য়
আনলে নির্ঝর ক্ষীণ আঁসুর !
পাঠিয়ো ভোর ব্যয় ফুল্ল ফুল তুল
তোমার গণ্ডের ফুল তোড়া !
যদিই পাই তায় তোমার বোস্তার
খোশ্বুদার খাক ধূল থোড়া !
দে খবর দিল– দার পিয়ায় সই
বক্ষে আজ মোর জোর ব্যথা,
মাথার দিব্যি রইলো সই লো,
জরুর ক'স তায় মোর কথা !
জামশেদের দর— বারের সাকি !
বাড়ুক পরমাই মদ্যপিও !
তোমার হস্তে এ মদের ভাঁড় মোর
পুরল নাই ভাই যদ্যপিও !
'য়্যাজদ' মুল্‌কের বাসিন্দায় সব
বলবে, বন্ধু ভোর–সমীর !

(ভরুক ময়দান লুটাক পায়-পায়
অকৃতজ্ঞের খণ্ড শির !)
'বহুৎ দূর পথ বহুৎ বিচ্ছেদ
স্মৃতির ভুল্ হায় হয়নি তায়,
তাদের বাদশার গোলাম আজকেও
তাদের খোশনাম কয় সদাই !'
চলতে মোর পথ সামল প্যারি,
আঁচর্,, খাক্ আর খুন হতে ;
তোমার এশকের নিরাশ খুন-দিল
লোহ্‌য় পথ এ পূর্ণ যে !
এয় শাহানশাহ ! ওয়াস্তে আল্লার
শক্তি দাও এই, অহর্নিশ—
আসমানের ন্যায় চুম্বি অমনি
তোমার খাস রঙ-মহ্‌ল শীষ্ !
আশিস চায় এই 'হ্যাফিজ' হরদম,
কও 'আমিন' সব খুব মনে—
'লাল শিরিন ঠোঁট পিয়ার রোজ পাই,
ভরাই লাখ লাখ চুম্বনে !'

ছন্দসূত্র :

এয় ফরোগে মাহে হোস্‌ন্ আজ্ রুয়ে রোখ্‌শা নে শুমা
আবরূয়ে খুবি আজ্ চা হো জনখ্‌দা নে শুমা।

কুঞ্জিকা : রৌশন—জ্যোতির্ময়। টোলদার—টোল-খাওয়া (সুন্দরীদের গালের ও চিবুকের ছোট্ট টোলের সৌন্দর্যের তুলনা নাই !) গোল-বদন—পুষ্পপেলব সুন্দর মুখ। ফরমান—হুকুম। মোমটা ক্ষীণ—ক্ষীণ প্রদীপটা। আরজু—প্রার্থনা, নিবেদন। দেক্—বিরক্তি। নার্গিস-অক্ষি—নার্গিস (Narcissus) ফুলের মতো সুন্দর চোখ যে সুন্দরীর। মস্ত-চাউনি—ঘোর-ঘোর চটুল চাওয়া। নিদ-আতুর—নিদ্রাতুর। প্যারি—প্রিয়তমা। উজ্‌লি—উজ্জ্বল। স্মিরতিময়—স্মৃতিতে। আঁসু—অশ্রু। বোঁস্তা—কুঞ্জ। খোশবুদার—সুরভিত। খাক—মৃত্তিকা। থোড়া—সামান্য। দিল্‌দার পিয়া—দরদি প্রিয়া। জরুর—নিশ্চয়ই। জামশেদ—পারস্যের বিখ্যাত বাদশাহ্ ছিলেন এবং এঁরই আমলে প্রথম রাজদরবারে শরাবের জাম বা মদ্যের পিয়ালার প্রচলন হয়। এঁর 'জামশেদ' নাম হতেই পারসি জাম (শরাব—পেয়ালা) কথার উৎপত্তি। মদ্যপিও—মদ্য পান করো। য়্যাজদ্‌মুল্‌ক—পারস্যের এক প্রদেশের নাম, এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই নাকি ফকির দরবেশ ছিলেন। খোশ-নাম—প্রশংসা। খুন—রক্ত, স্থানবিশেষে রক্তাক্ত। এশক—প্রেম। শাহনশাহ—মহামহিম সম্রাট। ওয়াস্তে আল্লার—দোহাই আল্লার ! চুম্বি—চুম্বন করি। খাস—প্রধান। রঙমহল শীষ—রঙমহল বা প্রাসাদের চূড়া। 'আমিন'—তথাস্তু। লাল—চুনি-পান্নার মতো টুকটুকে। শিরিন—মধুভরা।

গজল—৫

হাত হতে মোর হৃদয় যায়
দোহাই বাঁচাও হৃদয়-বান্!
আফসোস! আমার গোপন সব
ফসকে যে দেয় নিদয় প্রাণ।
দশ দিনের এই দুনিয়া ভাই,
স্বপ্ন-কুহক কল্প-লোক;
করতে ভালোই বন্ধুদের,
বন্ধু, তোমার লক্ষ্য হোক!
বও অনুকূল বায়, এ নাও
ভগ্ন, মনেও শ্রান্তি হায়!
হয়তো দুবার দেখব ফের
সেই হারা মোর প্রাণ-পিয়ায়।
শরাব-সভায় কুঞ্জে আজ
বুলবুলি বাঃ বোল বিলায়—
লাও প্রভাতের মদের ভাঁড়,
মস্তানা সব জলদি আয়!
হাজার লাখ হে মহান-প্রাণ,
সালাম সালাম ধন্যবাদ।
দরবেশ এ দীন একটি দিন
প্রসাদ চায়, নাই অন্য সাধ।
দুই দুনিয়ার আরাম সব
ব্যাখ্যা ভাই এই এক কথায়,—
দোস্তে মধুর স্নিগ্ধ ভাব,
শত্রু যে—দাও রক্ষ তায়!
সুনাম সুযশ লাভের পথ
করলে হারাম, হে দুর্বোধ!
মন্দ বোধ হয় কু-নাম আজ?
বদলে দাও, বাস্ এ দূর পথ।
জমশেদের এই মদের গ্লাস
সিকান্দারের আয়না ভাই;
দারার দেশের সকল হাল
ঐ হেরো বন্ধ, ভায় না তায়?

শির ঝোঁকা, নয় মোমের ন্যায়
জ্বলবে—সে কি শরম কম?—
এ পিয়া যার পরশ ঘা'য়
কঠিন শিলাও নরম মোম।
বন্ধুদে' সব বৈতালিক
গায় যদি এই ফার্সি গীত
সন্ন্যাসী পীর ভাব-মোহিত
নাচবে; এ-গান সার্-নিহিত্।
ঐ খাঁটি মদ— সুফীর দল
পাপের মা কয়?— আ দুত্তোর!
আইবুড়ো সব ছুঁকরিদের
ঠোঁট-চুমোরও মধুরতর!
হস্ত খালি? বাস, আয়াস কর,
আয়েশ করার, শেখ সুখেও;
পরশ-পাথর মত্ততার
'কারুণ' বানায় ভিক্ষুকেও।
পরমায়ু দেয় মুমূর্ষুরে
ফারেস দেশের দিল-পিয়ায়,
এয় সাকি, এই খোশখবর
জ্ঞান-বুড়োদের বলবি ভাই!
খামখা হাফিজ দেয়নি গায়
শরাব-রঙিন কুর্তি এই,
আলখেল্লা পাক গায় হে শেখ!
লাচার, সব এই ফুর্তিতেই!

ছন্দ :

'দিল্ মি রওদ যে দস্তম্ সাহিব্ দিলাঁ খোদারা'
হাত্ হতে মোর হৃদয় যায় দোহাই—বাঁচাও হৃদয়-বান!

কুঞ্চিকা : নাও—নৌকা। মস্তানা—মাতাল, পাগল। সালাম—তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। দরবেশ—যে প্রার্থনা নিয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকে। দুই দুনিয়ার আরাম—ঐহিক পারত্রিক সুখ। হারাম—নিষিদ্ধ। জমশেদ—পারস্যের এক বাদশার নাম, ইহারই দরবারে সর্বপ্রথম শরাবের পেয়ালার প্রচলন হয় বলিয়া শরাবের পেয়ালাকে 'জামে-জমশেদ' বলে। সিকান্দার—মহাবীর আলেকজাণ্ডার (Alexander the great)। সিকান্দারের আয়না—কথিত আছে যে, সিকান্দার বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক অদ্ভুত আয়না নির্মাণ করেন, তাহাতে নাকি ইস্তাম্বুল শহর পর্যন্ত যেখানে যাহা হইত, এই আয়নায় তাহা প্রতিবিম্বিত হইয়া দেখা যাইত। দারা—পারস্যের এক বিখ্যাত সম্রাট। হাল—অবস্থা। শেখ—জ্ঞানী। 'কারুন'—কুবের। ফারেস—পারস্য। পাক—পবিত্র।

গজল—৬

মোর পাত্র মদ্য— রোশ্‌নায়ে কর রৌশন এয় সাকি !
গাও বান্দা, 'মোদের পুরবে সব আশ্‌ দুনয়া নয় ফাঁকি !'
মদ— পাত্রে মোর আজ বিম্বিত ছবি প্রিয়ার চাঁদ মুখের,
শোন বঞ্চিত যত হর্দমই মদ— টানার স্বাদ সুখের !
ঝাউ— ছিপছিপে তন— ন্নাঙ্গীদে' 'নাজ্‌ নখরা' সব ফুরোয়
ক্ষীণ দেবদারু-তনু মরালী পিয়ার যেই হয় অভ্যুদয়।
সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী শাশ্বত চির— জাগ্রত প্রেম যার ;
অবি— নশ্বর মম নাম তাই দোলে কাল-বুকে হেম-হার।
মোর 'দিলরুবা' পিয়ার আঁখিয়ার বড় মিঠি দিঠি আধ-ঘোর,
তাই চাউনির ওরই হাতে সঁপা মোর বাসনার বাগ-ডোর।
রোজ কিয়ামতে ভাই, জিতবে না,— আহা দুঃখে গাল খুঁটি !
মোর হারাম মদকে ভাণ্ড শেখের হালাল দাল-রুটি।
কভু বন্ধুদের সে ফুলবাগে যদি যাও দখিন হাওয়া ;
মোর কান্তারও কাছে এই কথাটুকু জরুর চাই যাওয়া ;
বলো প্রিয়তম ! স্মৃতি জোর করে ছি ছি ভোলা কি কখনো যায় ?
ওগো আপনি সেদিনও আসিবে, আর না দেখিবে স্বপনো তায় !
ওই পাতলা ছুড়িরই প্রেম দাগ বুকে 'লালা'-ফুল সম চিন্‌ ;
মম জালে ধরা দেবে মিলন-বিহগ— বাকি আর কতদিন ?
ওই সবজা দরিয়া আসমানের, আর চাঁদের নৌকা সেই,
সব ডুব গিয়া ভায়া 'কওয়াম হাজ্জি'র মাল এ মদ গ্যাসেই !
ফেল অশ্রুবিন্দু— শস্য-কণিকা হাফিজ কাঁদ রে কাঁদ,
ওরে মিলন-পক্ষী হয়তো লক্ষ্য করবে তা হলে ফাঁদ !

ছন্দ :

'সা কী ব-নূরে বা-দা বর-অফ্‌ রোজে জা-ম্‌ এমা'
মোর পাত্র মদ্য-রোশনায়ে কর রৌশন এয় সা—কী।

কুঞ্চিকা : রোশনায়—জ্যোতি। রৌশন—জ্যোতির্ময়। এয়—ওগো, ওহে। বান্দা—সভার গায়ক। নাজ-নখরা—ছলাকলা, হাবভাব। দিলরুবা—মন-হরণকারী। রোজ-কিয়ামত—শেষ বিচারের দিন। হালাল—শাস্ত্রসিদ্ধ। বাগ-ডোর—লাগাম। ফুলবাগে—পুষ্পোদ্যানে। জরুর—অবশ্য অবশ্য। লালা—এক রকম ফুল, এই ফুলের বুকে একটি ক্ষত বা দাগ থাকে। সবজা—সবুজ। দরিয়া—সমুদ্র। 'কওয়াম হাজ্জি'—কবি হাফিজের এক উজির-বন্ধু।

গাজল—৭

কোথায় সুবোধ সংযমী, তারতুল এ-মাতাল অপাত্রে ছাই !
তাদের পথ আর আমার এ-পথ বহুৎ বহুৎ তফাত যে ভাই !
ধরম শরম ? চুলোয় সে যাক ! প্রেম-শিরাজীর প্রেমিক এ-জন,
নীতির নীরস ঠোঁট চেপে শোন রোবাব-বীণের ঝিঝিট-বেদন ?
মসজিদে গ্যে' শিখনু পরা ফেরেব-বাজির কূর্তি কালো ;
ভাইরে, আমার আতশ-পূজা শরাব-শিরীর ফুর্তি ভালো।
মিলন-চুমুর শিরিন স্মৃতি আবছায়া তাও হয় না মনে !
হায় কোথা সেই জাদুর মায়া, মান করে জল নয়না-কোণে ?
দোস্তের স্বরূপ রূপ-দরিয়ায় দুশমনে ছাই পায় না রতন,
রবির শিখায় স্তিমিত প্রদীপ জ্বালতে সে ছাই খামখা যতন !
সেবের মতন স-টোল চিবুক-কূপটি প্রিয়ার রাস্তাতে না ?
আশেক পথিক, সামলে চলিস ! আস্তে ! পড়েই যাস তাতে বা !
সুর্মা, আঁখি অঞ্জন আমার, পীতম, তোমার চরণ-রেণু,
এই মদিনা-মক্কা, হেথাই বাজবে আমার মরণ-বেণু !
আশ করো না বন্ধু আমার, হাফিজ হতে চুম-ভরা ঘুম,
শান্তি কী চিজ ? আরাম কোথায় ? কলজেতে মোর আগুন।

গজল—৮

ছন্দ : আগর আঁ তুর্ কে শিরাজী বদস্‌ত্ আ-রদ্ দিলে মারা।
যদিই কান্তা শিরাজ সজ্‌নী ফেরত দেয় মোর
চোরাই দিল ফের্।

যদিই কান্তা শিরাজ সজনি ফেরত দেয় মোর
চোরাই দিল ফের,
সমরখন্দ আর বোখারায় দিই বদল তার লাল
গালের তিলটের !
লে আও সাকি, শরাব শেষটুক ! কোথাও নাই
ভাই, বেহেশতেও সে,
নহর, 'রোকনা-আবাদ'-তীর আর এমন ঈদগাহ,
এদেশ সেও সে।

বাঁচাও বন্ধু! নিলাজ চঞ্চল চটুল চুলবুল
প্রিয়ার মুখচোখ,
তুর্কি সৈন্যের 'লুটের খাঞ্চা'র মতোই বিলকুল
লুটলে সুখ-লোক!
অপূর্ণই মোর এশক-গুলবাগ তাতেই মশ্‌গুল
ভোমর চঞ্চল,
হুর যে চায় না স-টোল লাল গাল, হরিণ চোখ,
মুখ কোমল ঢলঢল।
আগেই জানতাম, ব্যাকুল-দিন-দিন আকুল—
যৌবন হাসিন 'ইউসফ'—
প্রেমের টান তার নাশবে হ'রবে 'জুলায়খা'র
সব নারীর গৌরব।
চলুক সেহলির শরাব-সঙ্গীত, কালের কুঞ্জি
নাই তলাস তার,
না-হক কসরত গ্রন্থি খুলবার রহস্যের এই রশির ফাঁসটার!
নীতির গীত শোন পীতম চঞ্চল! শান্ত সুন্দর
তারই ঠিক প্রাণ,
জ্ঞানের বৃদ্ধের নীতির বশ যে, সৎ কথায় যার
প্রাণ-অধিক জ্ঞান।
মন্দ কত? আহ, তাতেই জান তর্‌র! আবার
গাল দাও হে মোর লক্ষ্মী;
গাল তো নয় ও, মিষ্টি শর্বত ঢালছে পান্নার শিরিন ঠোঁটটি!
গজল-গীত নয়, মুক্তো গাঁথছিস, হাফিজ আয়,
ফের মধুর তান ধর।
তারার লাখ হার ছুঁড়বে বারবার অধীর আসমান্‌
শুনলে গান তোর।

নমস্কার

তোমারে নমস্কার—
যাহার উদয়-আশায় জাগিছে রাতের অন্ধকার।
বিহগ-কণ্ঠে জাগে অকারণ পুলক আশায় যার
স্তব্ধ পাখায় লাগে গতি-বেগ চপল দুর্নিবার।

ঘুম ভেঙে যায় নয়ন সীমায় লাগিয়া যার আভাস
কমলের বুকে অজানিতে জাগে মধুর গন্ধবাস।
জাগে সহস্র শিশির-মুকুরে সহস্র মুখ যার
না-আসা দিনের সূর্য সে তুমি, তোমারে নমস্কার !

নমো দেবী নমো নমো,
ছুটিয়া চলেছে স্রোত-তরঙ্গ পাহাড়ি হরিণী সম।
অটল পাষাণ-অচপল গিরিরাজের চপল মেয়ে
চলছে তটিনী তটে তটে নট-মল্লারে গান গেয়ে।
কূলে কূলে হাস পল্লবে ফুলে ফল ফসলের রানি,
বধির ধরারে শোনাও নিত্য কল কল কল-বাণী।
তব কলভাষে খলখল হাসে বোবা ধরণীর শিশু,
ওগো পবিত্রা কূলে কূলে তব কোলে দোলে নবশিশু।
তব স্রোত-বেগে জাগে আনন্দ জাগিছে জীবন নিতি,
চির-পুরাতন পাষাণে বহাও চির নূতনের গীতি।
জড়েরে জড়ায়ে নাচিছে প্রাণদা, দাও নব প্রাণ তার,
শ্মশানের পাশে ভাগীরথী তুমি, তোমারে নমস্কার !

মরু-ভাস্কর

প্রথম সর্গ

অবতরণিকা

জেগে ওঠ্ তুই রে ভোরের পাখি, নিশি-প্রভাতের কবি !
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব-রবি।
ওরে ওঠ্ তুই, নূতন করিয়া বেঁধে তোল্ তোর বীণ্ !
ঘন আঁধারের মিনারে ফুকারে আজান মুয়াজ্জিন।
কাঁপিয়া উঠিল সে ডাকের ঘোরে গ্রহ, রবি, শশী, ব্যোম,
ঐ শোন্ শোন্ 'সালাতের' ধ্বনি 'খায়রুম-মিনান্নৌম !'

রবি-শশী-গ্রহ-তারা-ঝলমল গগনাঙ্গনতলে
সাগর উর্মি-মঞ্জীর পায়ে ধরা নেচে নেচে চলে।
তটিনী-মেখলা নটিনী ধরার নাচের ঘূর্ণি লাগে
গগনে গগনে পাবকে পবনে শস্যে কুসুম-বাগে।
সে আজান শুনি' থমকি দাঁড়ায় বিশ্ব-নাচের সভা,
নিখিল-মর্ম ছাপিয়া উঠিল অরুণ জ্যোতির জবা।
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিল জাগর পাখির গানে,
ভুলোকে দ্যুলোক প্লাবিয়া গেল রে আকুল আলোর বানে !
আরব ছাপিয়া উঠিল আরবে ব্যোমপথে 'দীন্' 'দীন্'।
কাবার মিনারে আবার আসিল নবীন মুয়াজ্জিন !

ওরে ওঠ্ তোরা, পশ্চিমে ঐ লোহিত সাগর জল
রঙে রঙে হল লোহিততর রে লালে-লাল ঝলমল্ !
রঙ্গে ভঙ্গে কোটি তরঙ্গে ইরানি দরিয়া ছুটে,
পূর্ব-সীমায়,—সালাম জানায় আরব-চরণে লুটে।
দখিনে ভারত-সাগরে বাজিছে শঙ্খ, আরতি-ধ্বনি,
উদিল আরবে নূতন সূর্য—মানব-মুকুট-মণি।

খায়রুম্-মিনান্নৌম—নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনা ভাল। সালাত—উপাসনা। মুয়াজ্জিন—যে উপাসনার জন্য আহ্বান করে। আজান—উপাসনা আহ্বান ধ্বনি। দীন্—ধর্ম।

উত্তরে চির-উদাসিনী মরু, বালুকা-উত্তরীয়
উড়ায়ে নাচিয়া নাচিয়া গাহিছে—'জাগো রে, অমৃত পিও !'
লু-হাওয়া বাজায় সারেঙ্গী বীণ্ খেজুর পাতার তারে,
বালুর আবীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে স্বর্গে গগন-পারে।
খুশিতে বেদানা-ডালিম ডাঁশায়ে ফাটিয়া পড়িছে ভুঁয়ে,
ঝড়ে রসধারা নারঙ্গী সেব আপেল আঙুর চুঁয়ে।
আরবি ঘোড়ারা রাশ নাহি মানে, আসমানে যাবে উঠি',
মরুর তরুণী উটেরা আজিকে সোজা পিঠে চলে ছুটি'।
বয়ে যায় ঢল, ধরে না কো জল আজি 'জম্‌জম' কূপে।
'সাহারা' আজিকে উথলিয়া ওঠে অতীত সাগর রূপে।
পুরাতন রবি উঠিল না আর সেদিন লজ্জা পেয়ে,
নবীন রবির আলোকে সেদিন বিশ্ব উঠিল ছেয়ে।
চক্ষে সুর্মা বক্ষে 'খোর্মা' বেদুইন কিশোরীরা
বিনি কিম্মতে বিলালো সেদিন অধর চিনির সিরা !
'ঈদ'-উৎসব আসিল রে যেন দুর্ভিক্ষের দিনে,
যত 'দুশ্‌মনী' ছিল যথা নিল 'দোস্‌তী' আসিয়া জিনে।
নহে আরবের, নহে এশিয়ার, বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল গো বেহেশ্‌ত জ্যোতিহীন !
ধরার পঙ্কে ফুটিল গো আজ কোটি-দল কোকনদ,
গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ—'আসিল মোহাম্মদ !'

* * *

অভিনব নাম শুনিল রে ধরা সেদিন—'মোহাম্মদ !'
এতদিন পরে এল ধরার 'প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ !'
চাহিয়া রহিল সবিস্ময়ে ইহুদি আর ঈসাই সব,
আসিল কি ফিরে এতদিনে সেই মসীহ্ মহামানব ?
'তওরাত্' 'ইঞ্জিল' ভরি' শুনিল যাঁর আগমনী,
'ঈসা' 'মুসা' আর 'দাউদ' যাঁর শুনেছিল পা'র ধ্বনি !
সেই সুন্দর দুলাল আজ আসিল কি নীরব পায় ?
যেমন নীরবে আসে তপন পূর্ণ চাঁদ পুব-সীমায়।
এমনি করিয়া ওঠে রবি ওঠে রে চাঁদ, ধরা তখন
এমনি করিয়া ঘুমাইয়া রয়, রবি শশী হেরে স্বপন।
আলোকে আলোকে ছায় দিশি নব অরুণ ভাঙে রে ঘুম,
তন্দ্রালু সব আঁখি-পাতায় বন্ধু-প্রায় বুলায় চুম।

তেমনি মহিমা সেই বিভায় আসিল আজ আলোর দূত,
ঝর্নার সুরে পাখিরা গায়, আতর গায় বয় মারুত।
শুষ্ক সাহারা এত সে যুগ হেরেছে রে যার স্বপন,
বেহেশ্‌ত হতে নামিল ঐ সেই সুধার প্রস্রবণ।
খোর্মা খেজুরে মরু-কানন ফলবতী হলুদ-রং
মরুর শিয়রে বাজে রে ঐ জলধারার মেঘ-মৃদং!
শোনেনি বিশ্ব কভু যে নাম— 'মোহাম্মদ' শুনে সে আজ,
সেই সে নাম অবিশ্রাম একি মধুর, একি আওয়াজ!
আঁধার বিশ্বে যবে প্রথম হইল রে সূর্যোদয়
চেয়েছিল বুঝি সকল লোক এই সে রূপ সবিস্ময়!
এমনি করিয়া নবারুণের করিল কি নামকরণ,
সে আলোক-শিশু এমনি রে হরি' আঁধার হরিল মন!
এমনি সুখে রে সেই সেদিন বিহগ সব গাহিল গান,
শাখায় প্রথম ফুটিল ফুল, হল নিখিল শ্যামায়মান।
গুলে গুলে শাড়ি গুলবাহার পরি' সেদিন ধরণী মা
আঁধার সূতিকা-বাস ত্যজি' হেরে প্রথম দিক-সীমা।
ফুল-বন লুটি' খোশখবর দিয়ে বেড়ায় চপল বায়,
'ওরে নদ নদী, ওরে নির্ঝর, ছাড়ি পাহাড় ছুটিয়া আয়
সাগর! শঙ্খ বাজা রে তোর আসিলে ঐ জ্যোতিষ্মান,
একি আনন্দ, একি রে সুখ, এল আলোর এ কি এ বান।'
ফুলের গন্ধ পাখির গান স্পর্শসুখ ভোর হাওয়ার,
জানিল বিশ্ব সেই সেদিন, সেই প্রথম; আজ আবার
আঁধার নিখিলে এল আবার আদি প্রাতের সে সম্পদ্‌
নূতন সূর্য উদিল ঐ —মোহাম্মদ! মোহাম্মদ!

অনাগত

বিশ্ব তখনো ছিল গো স্বপ্নে, বিশ্বের বনমালী
আপনাতে ছিল আপনি মগন! তখনো বিশ্ব-ডালি
ভরিয়া ওঠেনি শস্যে কুসুমে; তখনো গগন-থালা
পূর্ণ করেনি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকার মালা।

আপন জ্যোতির সুধায় বিভোর আপনি জ্যোতির্ময়
একাকী আছিল—ছিল এ নিখিল শূন্যে শূন্যে লয়।

অপ্রকাশ সে মহিমার মাঝে জাগেনি প্রকাশ-ব্যথা,
ছিল না কো সুখ-দুখ-আনন্দে সৃষ্টির আকুলতা।
ছিল না বাগান, ছিল বনমালী।—সহসা জাগিল সাধ,
আপনারে লয়ে খেলিতে বিধির, আপনি সাধিতে বাদ।

অটল মহিমা-গিরি-গুহা-ত্যজি'—কে বুঝিবে তাঁর লীলা—
বাহিরিয়া এলো সৃষ্টি-প্রকাশ নির্ঝর গতিশীলা।
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের সৃজিয়া সে লীলা রাজ,
ভাবিল সৃজিবে পুতুল-খেলার মানুষ সৃষ্টি-মাঝ।
চলিতে লাগিল কত ভাঙাগড়া সে মহাশিশুর মনে,
মানুষ হইবে রসিক ভ্রমর সৃষ্টির ফুলবনে।
আদিম মানব 'আদমে' সৃজিয়া এক মুঠা মাটি দিয়া
বলিলেন, 'যাও, কর খেলা ঐ ধরার আঙনে গিয়া।'

সৃজিয়া মানব-আত্মা তাহার দানিল মানব-দেহে
কাঁদিতে লাগিল মানব-আত্মা পশিয়া মাটির গেহে।
বলে, 'প্রভু, আমি রহিতে নারি এ ধূলি-পঙ্কিল ঘরে,
অন্ধকার এ কারাঘরে একা রহিব কেমন করে!'
আদমের মাঝে বারেবারে যায় বারেবারে ফিরে আসে
চারিদিকে ঘোর বিভীষিকা শুধু, কাঁপিয়া মরে সে ত্রাসে।
কহিলেন প্রভু, 'ভয় নাই, দিনু আমার যা প্রিয়তম
তোমার মাঝারে—জ্বলিবে সে জ্যোতি তোমাতে আমারি সম।
আমা হতে ছিল প্রিয়তর যাহা আমার আলোর আলো—
—মোহাম্মদ সে, দিনু, তাঁহারেই তোমারে বাসিয়া ভালো।'
মানব-আত্মা পশিয়া এবার আদমের দেহ-মাঝে
হেরিল তথায় অতুল বিভায় মহাজ্যোতি এক রাজে।
আত্মার আলো ঘুচাতে পারেনি যে মহা অন্ধকার
তারে আলোময় করিয়াছে আসি' এ কোন্ জ্যোতি-পাথার!
বন্দনা করি' সে মহাজ্যোতিরে আদম খোদারে কয়,
'অপরূপ জ্যোতি-প্রদীপ্ত তনু এ কার মহিমময়!
কেবা এ পুরুষ, কেন এ উদিল আমার ললাট-তীরে,
ধন্য করিলে কেন এ মধুর বোঝা দিয়ে মোর শিরে?'

কহিলেন খোদা, 'এই সে জ্যোতির পুণ্যে আঁধার ধরা
আলোয় আলোয় হবে আলোময়, সকল কলুষ-হরা

এই সে আলোয় দীপ্তি ভাতিবে বিশ্ব নিখিল ভরি',
এ জ্যোতি-বিভায় হইবে প্রভাত পাপীদের শর্বরী।
আমার হাবিব্—বন্ধু এ প্রিয় ; মানব-ত্রাণের লাগি'
ইহারে দিলাম তোমাতে—হইতে মানব-দুঃখ-ভাগী।
মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল-প্রশংসিত,
ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।'

সিজ্‌দা করিয়া খোদারে আদম সম্ভ্রম-নত কয়,
'ধূলির ধরায় যাইতে আমার নাহি আর কোন ভয়।
আমার মাঝারে জ্বালাইয়া দিলে অনির্বাণ যে দীপ,
পরাইয়া দিলে আমার ললাটে যে মহাজ্যোতির টিপ।
ধরার সকল ভয়েরে ইহারি পুণ্যে করিব জয়,
আমার বংশে জন্মিবে তব বন্ধু মহিময় !
মোর সাথে হল ধন্য পৃথিবী।'—মোহাম্মদের নাম
লইয়া পড়িল, 'সাল্লাল্লাহু আলায়হিসাল্লাম্ !'

ধরায় আসিল আদিম মানব-পিতা আদমের সাথ
'খোদার প্রেরিত', 'শেষ বাণী-বাহী' কাঁদাইয়া জান্নাত।

* * *

শত শতাব্দী যুগযুগান্ত বহিয়া যায়
ফিরে-নাহি আসা স্রোতের প্রায়
চলে গেল 'হাওয়া', 'আদম', 'শিশ্' ও 'নূহ্' নবি—
জ্বলিয়া নিভিল কত রবি !
চলে গেল 'ঈসা', 'মুসা' ও 'দাউদ', 'ইব্‌রাহীম'
ফিরদৌসের দূর সাকিম।
গেল 'সুলেমান', গেল 'ইউনুস', গেল 'ইউসুফ' রূপকুমার
হাসিয়া জীবন-নদীর পার।
গেল 'ইসাহাক', 'ইয়াকুব', গেল 'জবীহুল্লাহ্ ইস্‌মাইল'
খোদার আদেশ করি' হাসিল।
এসেছিল যারা খোদার বাণীর দধিয়াল তুতী পাপিয়া পিক
বুলবুল্ শ্যামা, ভরিয়া দিক
যাদের কণ্ঠে উঠিয়াছিল গো মহান বিভুর মহিমা গান
উড়ে গেল তারা দূর বিমান !

ঊর্ধ্বে জাগিয়া রহিলেন 'ঈসা' অমর, মর্ত্যে 'খাজা খিজির'
—দুই ধ্রুবতারা দুই সে তীর—
ঘোষিতে যেন গো এপারে-ওপারে তাহারি আসার খোশ্‌খবর—
যাহার আশায় এ চরাচর
আছে তপস্যা-রত চিরদিন ; ঘুরিছে পৃথিবী যার আশে
সৌরলোকের চারিপাশে।

আদিম-ললাটে ভাতিল যে আলো ঊষার পুরব-গগন-প্রায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
আলোক, আঁধার, জীবন, মৃত্যু, গ্রহ, তারা তারে খুঁজিছে, হায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
খুঁজিছে দৈত্য, দানব, দেবতা, 'জিন' পরী, হুর পাগল-প্রায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
খোঁজে অপ্সর, কিন্নর, খোঁজে গন্ধর্ব ও ফেরেশ্‌তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
খুঁজিছে রক্ষ যক্ষ পাতালে, খোঁজে মুনি ঋষি ধেয়ানে তায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
আপনার মাঝে খোঁজে ধরা তারে সাগরে কাননে মরু-সীমায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
খুঁজিছে তাহারে, সুখে, আনন্দে, নব সৃষ্টির ঘন ব্যথায়,
কোথায় ওগো সে আলো কোথায় !
উৎপীড়িতেরা নয়নের জলে নয়ন-কমল ভাসায়ে চায়,
কোথায় মুক্তি-দাতা কোথায় !
শৃঙ্খলিত ও চির-দাস খোঁজে বন্ধ অন্ধকার কারায়,
বন্ধ-ছেদন নবী কোথায় !
নিপীড়িত মূক নিখিল খুঁজিছে তাহার অসীম স্তব্ধতায়,
বজ্র-ঘোষ বাণী কোথায় !
শাস্ত্র-আচার-জগদল-শিলা বক্ষে নিশাস রুদ্ধপ্রায়
খোঁজে প্রাণ, বিদ্রোহী কোথায় !
খুঁজিছে দুখের মৃণালে রক্ত-শতদল শত ক্ষত-ব্যথায়,
কমল-বিহারী তুমি কোথায় !
আদি ও অন্ত যুগযুগান্ত দাঁড়ায়ে তোমার প্রতীক্ষায়,
চির-সুন্দর, তুমি কোথায় !
বিশ্ব-প্রণব-ওঙ্কার-ধ্বনি অবিশ্রান্ত গাহিয়া যায়—
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় !

*   *   *

ধেয়ান্-স্তব্ধ বিশ্ব চমকি' মেলে আঁখি—
আরবের মরু আজিকে পাগল হ'ল নাকি?
খুঁজিছে যাহারে কোটি গ্রহ তারা চাঁদ তপন
মরু-মরীচিকা হেরিল কি আজ তার স্বপন?
পেল না কো খুঁজে সকল দিশির দিশারী যার,
মরুর তপ্ত বালুতে পড়িল চরণ তাঁর!
রৌদ্র-দগ্ধ চির-তাপসিনী তনু-কঠিন
এরি তপস্যা করি' কি আরব যাপিল দিন?
বালুকা-ধূসর কেশ এলাইয়া তপ্ত ভাল
তপ্ত আকাশ-তটে ঠেকাইয়া এত সে কাল
ইহার লাগি' কি ছিল হতভাগী জাগিয়া রে
বিশ্ব-মথন অমৃত ধন মাগিয়া রে!

*   *   *

দশ দিক ছাপি' ওঠে আবাহন, 'ধন্য ধন্য মুত্তালিব!
তব কনিষ্ঠ পুত্র ধন্য আবদুল্লাহ্ খোশ-নসিব,
ঔরসে যাঁর লভিল জনম বিশ্ব-ভূমান মহামানব,
ধেয়ানে যাহারে ধরিতে না পারি' নিখিল ভুবন করে স্তব।
ধন্য গো তুমি 'আমিনা' জননী, কেমনে জঠরে ধরিলে তাঁয়
যোগী মুনি ঋষি পয়গম্বর গেয়ানে যাঁহার সীমা না পায়!'
ধন্য ধরণী-কেন্দ্র মক্কা নগরী, কাবার পুণ্যে গো
বক্ষে ধরিলে তাঁহারে, যে জন ধরেনি; অসীম শূন্যে গো
যাহারে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি ঘুরিতেছে নিঃসীম নভে
ধরার কেন্দ্রে আসিবে সেজন, এও কি গো কভু সম্ভবে!
বিন্দুর রূপে আসিল সিন্ধু, শিশু-রূপ ধরি' এল বিরাট!
অসম্ভবের সম্ভাবনায় রাঙিল এশিয়া-অস্তপাট!
পূর্বে সূর্য ওঠে চিরদিন, পশ্চিমে আজ উঠিল ঐ,
স্বর্গের ফুল ফুটিল সেথায় যে-মরুতে ফোটে বালুকা-খই!
নিখিল-শরণ চরণের লাগি' তুই কি আরব এত সে দিন
তপস্যা করি' করিলি নিজেরে যেন সে বিরাট-চরণ-চিন!
ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ,
তোমাতে আসিল প্রথম নবী গো, তোমাতে আসিল নবীর শেষ!

অভ্যুদয়

আঁধার কেন গো ঘনতম হয় উদয়-উষার আগে?
পাতা ঝরে যায় কাননে, যখন ফাগুন-আবেশ লাগে
তরু ও লতার তনুতে তনুতে, কেন কে বলিতে পারে?
সুর বাঁধিবার আগে কেন গুণী ব্যথা হানে বীণা-তারে?
টানিয়া টানিয়া না বাঁধিলে তারে ছিঁড়িয়া যাবার মত
ফোটে না কি বাণী, না করিলে তারে সদা অঙ্গুলি ক্ষত?
সূর্য ওঠার যবে দেরি নাই, বিহগেরা প্রায় জাগে,
তখন কি চোখে অধিক করিয়া তন্দ্রার ঝিম লাগে?
কেন গো কে জানে, নতুন চন্দ্র উদয়ের আগে হেন
অমাবস্যার আঁধার ঘনায়, গ্রাসিবে বিশ্ব যেন!
পুণ্যের শুভ আলোক পড়িবে যবে শতধারে ফুটে
তার আগে কেন বসুমতী পাপ-পঙ্কিল হয়ে উঠে?
ফুল-ফসলের মেলা বসাবার বর্ষা নামার আগে,
কালো হয়ে কেন আসে মেঘ, কেন বজ্রের ধাঁধা লাগে?
এই কি নিয়ম? এই কি নিয়তি? নিখিল-জননী জানে,
সৃষ্টির আগে এই সে অসহ প্রসব-ব্যথার মানে!
এমনি আঁধার ঘনতম হয়ে ঘিরিয়াছিল সেদিন,
উদয়-রবির পানে চেয়েছিল জগৎ তমসা-লীন।
পাপ অনাচার দ্বেষ হিংসার আশীবিষ-ফণা তলে
ধরণীর আশা যেন ক্ষীণজ্যোতি মানিকের মত জ্বলে!
মানুষের মনে বেঁধেছিল বাসা বনের পশুরা যত,
বন্য বরাহে ভল্লুকে রণ, নখর-দন্ত-ক্ষত
কাঁপিতেছিল এ ধরা অসহায় ভিরু বালিকার সম!
শূন্য-অঙ্কে ক্লেদে ও পঙ্কে পাপে কুৎসিৎতম
ঘুরিতেছিল এ কুগ্রহ যেন অভিশাপ-ধূমকেতু,
সৃষ্টির মাঝে এ ছিল সকল অকল্যাণের হেতু!
অত্যাচারিত উৎপীড়িতের জমে উঠে আঁখিজল
সাগর হইয়া গ্রাসিল ধরার যেন তিন ভাগ থল!
ধরণী ভগ্ন তরণীর প্রায় শূন্য-পাথার তলে
হাবুডুবু খায়, বুঝি ডুবে যায়, যত চলে তত টলে।
এশিয়া য়ুরোপ আফ্রিকা—এই পৃথিবীর যত দেশ
যেন নেমেছিল প্রতিযোগিতায় দেখিতে পাপের শেষ!

এই অনাচার মিথ্যা পাপের নিপীড়ন-উৎসবে
মক্কা ছিল গো রাজধানী যেন 'জজিরাতুল্ আরবে।
পাপের বাজারে করিত বেসাতি সমান পুরুষ নারী,
পাপের ভাঁটিতে চলিত গো যেন পিপীলিকা সারি সারি।
বালক বালিকা যুবা ও বৃদ্ধে ছিল নাকো ভেদাভেদ,
চলিত ভীষণ ব্যভিচার-লীলা নিলাজ নির্বেদ!
নারী ছিল সেথা ভোগ-উৎসবে জ্বালিতে কামনা-বাতি,
ছিল না বিরাম সে বাতি জ্বলিত সমান দিবস-রাতি।
জন্মিলে মেয়ে পিতা তারে লয়ে ফেলিতেন অন্ধ কূপে,
হত্যা করিত, কিম্বা মারিত আছাড়ি' পাষাণ-স্তূপে!
হায়রে, যাহারা স্বর্গে-মর্ত্যে বাঁধে মিলনের সেতু
বন্যা-ঢল সে কন্যারা ছিল যেন লজ্জারই হেতু!
সুন্দরে লয়ে অসুন্দরের এই লীলা-তাণ্ডব
চলিতেছিল, এ দেহ ছিল শুধু শকুন-খাদ্য শব!
দেহ-সরসীর পাঁকের উর্ধ্বে সলিল সুনির্মল—
ত্যজিয়া তাহারে মেতেছিল পাঁকে বন্য-বরাহ দল।
চরণে দলিত কর্দমে যারে গড়িয়া তুলিল নর
ভাবিত তাহারে সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর!

আল্লার ঘর কাবায় করিত হল্লা পিশাচ ভূত,
শিরনি খাইত সেথা তিন শত ষাট সে প্রেতের পুত্।
শয়তান ছিল বাদশাহ্ সেথা, অগণিত পাপ-সেনা,
বিনি সুদে সেথা হতে চলিত গো ব্যভিচার লেনা-দেনা!
সে পাপ-গন্ধে ছিঁড়িয়া যাইত যেন ধরণীর স্নায়ু,
ভূমিকম্পে সে মোচর খাইত, যেন শেষ তার আয়ু!

এমনি আঁধার গ্রাসিয়াছে যবে পৃথ্বী নিবিড়তম—
উর্ধ্বে উঠিল সঙ্গীত, 'হল আসার সময় মম!'
ঘন তমসার সূতিকা-আগারে জনমিল নব শশী,
নব আলোকের আভাসে ধরণী উঠিলো গো উচ্ছ্বসি'।
ছুটিয়া আসিল গ্রহ-তারাদল আকাশ-আঙিনা মাঝে,
মেঘের আঁচলে জড়াইয়া শিশু-চাঁদেরে পুলক-লাজে
দাঁড়াল বিশ্ব-জননী যেন রে পাইয়া সুসংবাদ
চকোর-চকোরী ভিড় করে এল নিতে সুধার প্রসাদ।
ধরণীর নীল আঁখি-যুগ যেন সায়রে শালুক সুঁদি
চাঁদেরে না হেরে ভাসিত গো জলে ছিল এতদিন মুদি',

ফুটিল রে তারা অরুণ-আভায় আজ এত দিন পরে,
দুটি চোখে যেন প্রাণের সকল ব্যথা নিবেদন করে।

পুলকে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমে ওঠে দুলিয়া দুলিয়া কাবা,
বিশ্ব-বীণায় বাজে আগমনী, 'মার্হাবা! মার্হাবা!!

স্বপ্ন

প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা
গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরুণ-লেখা;
তেমনি হেরিছে স্বপ্ন আমিনা—যেদিন নিশীথ-শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।
যেন গো তাঁহার নিরালা আঁধার সূতিকা-আগার হতে
বাহিরিল এক অপরূপ জ্যোতি, সে বিপুল জ্যোতি-স্রোতে
দেখা গেল দূর বোস্‌রা নগরী দূর সিরিয়ার মাঝে—
ইরান-অধিপ নওশেরোয়াঁর প্রাসাদের চূড়া লাজে
গুঁড়া হয়ে গেল ভাঙিয়া পড়িয়া; অগ্নিপূজা-দেউল
বিরান হইয়া গেল গো, ইরান নিভে গিয়ে বিলকুল।
জগতের যত রাজার আসন উলটিয়া গেল পড়ি, !
মূর্তি পূজার প্রতিমা ঠাকুর ভেঙে গেল গড়াগড়ি
নব নব গ্রহ তারকায় যেন গগন ফেলিল ছেয়ে,
স্বর্গ হইতে দেবদূত সব মর্ত্যে আসিল ধেয়ে।
সেবিতে যেন গো আমিনায় তাঁর সূতিকা-আগার ভরি'
দলে দলে এল বেহেশ্‌ত হইতে বেহেশ্‌তী হুর-পরী।
যত পশু পাখি মানুষের মত কহিল গো যেন কথা,
রোম-সম্রাট-কর হতে ক্রুস্‌ খসিয়া পড়িল হোথা।
হেঁটমুখ হয়ে ঝুলিতে লাগিল পূজার মূর্তি যত!
হেরিলেন জ্যোতি-মণ্ডিত দেহ অপরূপ রূপ কত!

টুটিতে স্বপ্ন হেরিলেন মাতা, ফুটিতে আলোর ফুল
আর দেরি নাই, আগমনী গায় গুলবাগে বুলবুল।
কি এক জ্যোতির্শিখার ঝলকে মাতা ভয়ে বিস্ময়ে
মুদিলেন আঁখি। জাগিলেন যবে পূর্ব-চেতনা লয়ে,
হেরিলেন চাঁদ পড়িয়াছে খসি' যেন রে তাঁহার কোলে,
ললাটে শিশুর শত সূর্যের মিহির লহর তোলে!

শিশুর কণ্ঠে অজানা ভাষায় কোন্ অপরূপ বাণী
ধ্বনিয়া উঠিল, সে স্বরে যেন রে কাঁপিল নিখিল প্রাণী।

ব্যথিত জগৎ শুনেছে ব্যথায় যার চরণের ধ্বনি,
এতদিনে আজ বাজাল রে অর বাঁশুরিয়া আগমনী!
নিখিল ব্যথিত অন্তরে এর আসার খবর রটে,
ইহারি স্বপ্ন জাগেরে নিখিল-চিত্ত-আকাশপটে।
সারা বিশ্বের উৎপীড়িতের রোদনের ধ্বনি ধরি'
ধরণীর পথে অভিসার এর ছিল দিবা-শর্বরী।
সাগর শুকায়ে হল মরুভূমি এরি তপস্যা লাগি',
মরু-যোগী হল খর্জুর তরু ইহারি আশায় জাগি'।
লুকায়ে ছিল যে ফল্গুর ধারা মরু-বালুকার তলে
মরু-উদ্যানে বাহিরিয়া এল আজি ঝর্নার ছলে।

খর্জুর বনে এলাইয়া কেশ সিনানি' সিন্ধু-জলে
রিক্তাভরণা আরব বিশ্ব-দুলালে ধরিল কোলে!

'ফারানে'র পর্বত-চূড়া পানে ভাব-বাদী বিশ্বের
কর-সঙ্কেতে দিল ইঙ্গিত ইহারি আগমনের।

সেদিন শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সুখে হাসিল বিশ্বত্রাতা,
'সুয়োরানী' হল আজিকে যেন রে বসুমতী 'দুয়ো' মাতা।'

'মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরবি।'
গাহিতে নান্দী গো যাঁর নিঃস্ব হল বিশ্ব-কবি।
আসিল বন্ধ-ছেদন শঙ্কা-নাশন শ্রেষ্ঠ মানব,
পশিল অন্ধ গুহায় ঐ পুনরায় রক্ষ দানব।
ভাসিল বন্যাধারায় 'দজলা' 'ফোরাত' কন্যা মরুর,
সাহারায় নৌবতেরি বাজনা বাজে মেঘ-ডমরুর।
বেদুইন তাম্বু ছিঁড়ে বর্শা ছুঁড়ে অশ্ব ছেড়ে
খেলিছে গেন্ডুয়া-খেল, রক্ত ছিটায় বক্ষ ফেঁড়ে।
আরবের কুব্জা বঁধু উট ছেড়ে পথ সবজা-ক্ষেতী
খুঁজিছে আজকে ঈদে খোর্মা আঙুর খেজুর-মেতি।
খর্জুর কণ্টকে আজ বন্ধ খুলি' যুক্ত বেণীর
ঢালিছে মুক্ত-কেশী আরবি-নির্ঝর কলসি পানির!

জরিদার নাগরা পায়ে গাগ্‌রা কাঁখে ঘাগ্‌রা ঘিরা
বেদুইন বৌরা নাচে মৌ-টুস্‌কির মৌমাছিরা।
শরমে নৌজোয়ানীরা নুইয়ে ছিল ডালিম-শাখা।
আজি তার রস ধরে না, তাম্বুলী ঠোঁট হিঙুল মাখা
করে আজ খুনসুড়ি ঐ শুকনো কাঁটার খেজুর-তরু,
খেজুরের গুলতি খেয়ে 'উঃ' ডাকে 'লু' হাওয়ায় মরু।
আখ্‌রোট বাদাম যত আরবি-বৌ এর পড়ছে পায়ে,
বলে, 'এই নীরস খোসা ছাড়াও কোমল হাতের ঘায়ে !'
আরবের উঠ্‌তি বয়েস ফুল-কিশোরী ডালিম-ভাঙা
বিলিয়ে রঙ কপোলের আপেল-কানন করছে রাঙা।
ছুটিতে দুম্বা-সম স্থূল শ্রোণীভার হয় গো বাধা,
দশনে পেশ্‌তা কাটি' পথ-বঁধুরে দেয় সে আধা।
অধরের কামরাঙা-ফল নিঙড়ে মরুর তপ্ত মুখে,
উড়নী দেয় জড়ায়ে পাগ্‌লা হাওয়ার উতল বুকে।

না-জানা আনন্দে গো 'আরাস্তা' আজ আরব-ভূমি
অ-চেনা বিহগে গাহে, ফোটে কুসুম বে-মরসুমী।
আরবের তীর্থ লাগি' ভিড় করে সব বেহেশ্‌ত বুঝি,
এসেছে ধরার ধুলায় বিলিয়ে দিতে সুখের পুঁজি।

'রবিউল আউয়াল চাঁদ শুক্লা নবমীর তিথিতে
ধেয়ানের অতিথ্ এল সেই প্রভাতে এই ক্ষিতিতে।
মসীহের পঞ্চশত সপ্ততি এক বর্ষ পরে
সোমবার জ্যেষ্ঠ প্রথম—ধরার মানব-ত্রাণের তরে
আসিলেন বন্ধু খোদার মহান উদার শ্রেষ্ঠ নবি,
'মার্হাবা সৈয়দ মক্কী মদনী আল্-আরবি।'

আলো-আঁধারি

বাদলের নিশি অবসানে মেঘ-আবরণ অপসারি,
ওঠে যে সূর্য—প্রদীপ্ত রূপ তার মনোহারী।
সিক্তশাখায় মেঘ-বাদলের ফাঁকে
'বৌ কথা কও' পাপিয়া যখন ডাকে—

সে গান শোনায় মধুরতর গো সজল জলদ-চারী !
বর্ষায়-ধোওয়া ফুলের সুষমা বর্ণিতে নাহি পারি !

কান্নার চোখ-ভরা জল নিয়ে আসে শিশু অভিমানী,
হাসিয়া বিজলি চমকি' লুকায় তার কাছে লাল মানি'।
কয়লার কালি মাখি যবে হীরা ওঠে,
সে রূপ যেন গো বেশি করে চোখে ফোটে !
নীল নভো-ঠোঁটে এক ফালি হাসি দ্বিতীয়ার চাঁদখানি
পূর্ণ শশীর চেয়ে ভালে লাগে—কেন কেহ নাহি জানি !

পথের সকল ধুলো কাদা মাখি যে শিশু ফেরে গো ঘরে,
সে কি গো পাইতে বেশি ভালোবাসা যত্ন জননী-করে ?
মুছাবেন মাতা অঞ্চল দিয়া বলে
শিশুর নয়নে অকারণে বারি ঝলে ?
ধরার আঁচলে পাথরের সাথে সোনা বাঁধা এক থরে,
বিষে নীল হয়ে আসে মণি—সেকি অধিক মূল্য তরে ?

ডুবে এক-গলা নয়নের জলে তবে কি কমল ফোটে ?
মৃণাল-কাঁটার বেদনায় কি ও শতদল হয়ে ওঠে ?
শত সুষমায় ফোটাবে বলিয়া কি রে
মেঘ এত জল ঢালে কুসুমের শিরে ?
দগ্ধ লোহায় না বিঁধিলে সুর ফোটে না কি বেণু-ঠোঁটে ?
তত সুগন্ধ ওঠে চন্দনে যত ঘষে শিলাতটে !

মুছাতে এল যে উৎপীড়িত এ নিখিলের আঁখিজল,
সে এল গো মাখি' শুভ্র তনুতে বিষাদের পরিমল !
অথবা সে চির-সুখ-দুখ-বৈরাগী
নিখিল-বেদনা-ভাগী !
জানে বনমাতা, গন্ধে ও রূপে মাতাবে যে বনতল
সে ফুল-শিশুর শয়ন কেন গো কন্টক-অঞ্চল !

শুনে হাসি পায় এত শোকে, হায় ! বিশ্বের পিতা যার
'হাবিব্' বন্ধু, হারায়ে পিতায় সে এল ধরা মাঝার !
খোদার লীলা সে চির-রহস্যময়—
বন্ধুর পথ এত বন্ধুর হয় !

আবির্ভাবের পূর্বে পিতৃহীন হয়ে—বারবার
ঘোষিল সে যেন, আমি ভাই সাথী পিতাহীন সবাকার !
আলোকের শিশু এল গো জড়ায়ে আঁধার উত্তরীয়
জানাতে যেন গো, 'বিষ-জর্জর, এবার অমৃত পিও !'
তৃষ্ণাতুরের পিপাসা করিতে দূর
হৃদয় নিঙাড়ি' রক্ত দেয় আঙুর !
শোক-ছলছল ধরায় কেমনে হাসিয়া হাসি অমিয়
আসিবে সবার সকল ব্যথার ব্যথী বন্ধু ও প্রিয় !

পূর্ণ শশীরে হেরিয়া যখন সাগরে জোয়ার লাগে,
উথলায় জল তত কলকল্ল যত আনন্দ জাগে !
তেমনি পূর্ণ শশীরে বক্ষে ধরি'
'আমিনার চোখে শুধু জল ওঠে ভরি' !
সুখের শোকের গঙ্গা-যমুনা বিষাদে ও অনুরাগে
বয়ে চলে, যেন 'দজ্‌ল' 'ফোরাত' বস্‌রা-কুসুম-বাগে !

কাঁদিছে আমিনা, হাসিছেন খোদা, 'ওরে ও অবুঝ মেয়ে,
ডুবিয়াছে চাঁদ, উঠিয়াছে রবি বক্ষে দেখ না চেয়ে,
ভবনের স্নেহ কাড়িয়া কঠোর করে
ভুবনের প্রীতি আনিয়া দিয়াছি, ওরে !
ঘর সে কি ধরে বিশ্ব যাহার আলোকে উঠিবে ছেয়ে ?
নিখিল যাহার আত্মীয়—ভুলে রবে সে স্বজন পেয়ে ?

নীড় নহে তার—যে পাখি উদার অম্বরে গাবে গান,
কেবা তার পিতা কেবা তার মাতা, সকলি তার সমান !
নাহি দুখ সুখ, আত্মীয় নাই গেহ,
একের মাঝারে সে যে গো সর্বদেহ,
এ নহে তোমার কুটির-প্রদীপ, ভোরে যার অবসান,
রবি এ—জনমি পূর্ব-অচলে ঘেরিবে সারা আসমান !'

সে বাণী যেন গো শুনিয়া আমিনা জননী রহে অটল,
ক্ষণেক রাঙিয়া স্তব্ধ রহে গো যেমন পূর্বাচল !
কহিল জননী আপনার মনে মনে,—
'আমার দুলালে দিলাম সর্বজনে !'
থির হয়ে গেল পড়িতে পড়িতে কপোলে অশ্রুজল।
উদিল চিত্তে রাঙা রামধনু, টুটিল শোক-বাদল !

'দাদা'

সব-কনিষ্ঠ পুত্র সে প্রিয় আবদুল্লার শোকে,
সেদিন নিশীথে ঘুম ছিল না কো মুত্তালিবের চোখে !
পঁচিশ বছর ছিল যে পুত্র আঁখির পুতলা হয়ে,

বৃদ্ধ পিতারে রাখিয়া মৃত্যু তারেই গেল কি লয়ে !
হয়ে আঁখিজল ঝরে অবিরল পঁচিশ-বছরী স্মৃতি,
সে স্মৃতির ব্যথা যতদিন যায় তত বাড়ে হায় নিতি !
বাহিরে ও ঘরে বক্ষে নয়নে অশ্রুতে তারে খোঁজে,
সহসা বিধবা 'আমিনা'রে হেরি' সভয়ে চক্ষু বোঁজে !
ওরে ও অভাগী, কে দিল ও-বুকে ছড়ায়ে সাহারা-মরু ?
অসহায় লতা গড়াগড়ি যায় হারায়ে সহায়-তরু !
আঙনে বেড়ায় ও যেন রে হায় শোকের শুভ্রশিখা,
রজনীগন্ধা বিধবা মেয়েরে লয়ে কাঁদে কাননিকা !
মন্থর-গতি বেদনা-ভারতী আমিনা আঙনে চলে,
হেরিতে সহসা মুত্তালিবের আঁধার চিত্ততলে
ঈষৎ আলোর জোনাকি চমকি যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে,
আবদুল্লার স্মৃতি রহিয়াছে ঐ আমিনার সনে।
আসিবে সুদিন আসিবে আবার, পুত্রে যে ছিল প্রাণ
পুত্র হইতে পৌত্রে আসিয়া হবে সে অধিষ্ঠান।
দিন গোণে মনে মনে আর কয়, 'বাকি আর কতদিন,
লইয়া অ-দেখা পিতার স্মৃতিরে আসিবি পিতৃহীন !'

মুত্তালিবের আঁধার চিত্তে জ্বলেছে সহসা বাতি,
সে দিন আসিবে যেন শেষ হলে আজিকার এই রাতি !
চোখে ঘুম নাই, শূন্যে বৃথাই নয়ন ঘুরিয়া মরে,—
নিশি-শেষে যেন অতন্দ্র চোখে তন্দ্রা আসিল ভরে !
কত জাগে আর লয়ে হাহাকার, আঁধারের গলা ধরি'
আর কতদিন কাঁদিবে গো, চোখে অশ্রু গিয়াছে মরি !
আয় ঘুম, হায় ! হয়ত এবার স্বপনে হেরিব তারে,
বিরাম-বিহীন জাগি' নিশিদিন খুঁজিয়া পাইনি যারে !
হেরিল মোত্তালিব্ অপরূপ স্বপ্ন তন্দ্রা-ঘোরে,—
অভূতপূর্ব আওয়াজ যেন গো বাজিছে আকাশ ভরে !

ফেরেশ্‌তা সব যেন গগনের নীল সামিয়ানা তলে
জমায়েত হয়ে তক্‌বীর হাঁকে, সে আওয়াজ জলে-থলে
উঠিল রণিয়া। 'সাফা' 'মারওয়ান' গিরি-যুগ সে আওয়াজে
কাঁপিতে লাগিল। উঠিল আরাব, 'আসিল সে ধরা মাঝে !'
কে আসিল ? সে কি আমিনারে ঘরে ? ছুটিতে ছুটিতে যেন
আসিল যে ঘরে আমিনা ! ওকি ও, গৃহের ঊর্ধ্বে কেন
এত সাদা মেঘ ছায়া করে আছে ? শত স্বর্গের পাখি
বসিতেছে ঐ গেহ 'পরি যেন চাঁদের জোছ্‌না মাখি' !
ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া দেখিছে কি যেন গ্রহ তারাদল আসি',
আকাশ জুড়িয়া নৌবত্‌ বাজে ভুবন ভরিয়া বাঁশি !..

টুটিল তন্দ্রা মুত্তালিবের অপরূপ বিস্ময়ে—
ছুটিল যথায় আমিনা—হেরিল নিশি আসে শেষ হয়ে।
আমিনার শ্বেত ললাটে ঝলিত যে দিব্য জ্যোতি-শিখা,
কোলে সে এসেছে—হাতে চাঁদ তার ভালে সূর্যের টিকা !
সে রূপ হেরিয়া মূর্ছিত হয়ে পড়িল মুত্তালিব,
একি রূপ ওরে একি আনন্দ একি এ খোশ্‌নসিব !
চেতনা লভিয়া পাগলের প্রায় কভু হাসে কভু কাঁদে,
যত মনে পড়ে পুত্রে, পৌত্রে তত বুকে লয়ে বাঁধে !

পৌত্রে ধরিয়া বক্ষে তখনি আসিলেন কাবা-ঘরে,
বেদী 'পরে রাখি' শিশুরে করেন প্রার্থনা শিশু-তরে।
'আরশে' থাকিয়া হাসিলেন খোদা—নিখিলের শুভ মাগি'
আসিল যে মহা-মানব—যাচিছে কল্যাণ তারি লাগি' !
ছিল কোরেশের সর্দার যত সে প্রাতে কাবায় বসি'
যোগ দিল সেই 'মুনাজাতে' সবে আনন্দে উচ্ছ্বসি'।
সাতদিন যবে বয়স শিশুর—আরবের প্রথা-মতো
আসিল 'আকিকা'-উৎসবে প্রিয় বন্ধু স্বজন যত !
উৎসব-শেষে শুধাল সকলে, শিশুর কি নাম হবে,
কোন্‌ সে নামের কাঁকন পরায়ে পলাতকে বাঁধি' লবে।
কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি' নিখিলের সম্পদ,—
'নয়নাভিরাম ! এ শিশুর নাম রাখিনু, 'মোহাম্মদ' !'

চমকি' উঠিল কোরেশীর দল শুনি' অভিনব নাম,
কহিল, 'এ নাম আরবে আমরা প্রথম এ শুনিলাম !

বনি-হাশেমের গোষ্ঠীতে হেন নাম কভু শুনি নাই,
গোষ্ঠী-ছাড়া এ নাম কেন তুমি রাখিলে, শুনিতে চাই !'

আঁখিজল মুছি' চুমিয়া শিশুরে কহিলেন পিতামহ—
'এর প্রশংসা রণিয়া উঠুক এ বিশ্বে অহরহ,
তাই এরে কহি 'মোহাম্মদ' যে চির-প্রশংসমান,
জানি না এ নাম কেন এল মুখে সহসা মথিয়া প্রাণ !'

নাম শুনি' কহে আমিনা—'স্বপ্নে হেরিয়াছি কাল রাতে
'আহমদ' নাম রাখি যেন ওর !'
'জননী, ক্ষতি কি তাতে'
হাসিয়া কহিল পিতামহ, 'এই যুগল নামের ফাঁদে
বাঁধিয়া রাখিনু কুটিরে মোদের তোমার সোনার চাঁদে !'

একটি বোঁটায় ফুটিল গো যেন দুটি সে নামের ফুল,
একটি সে নদী মাঝে বয়ে যায়, দুইধারে দুই কূল !

পরভৃত

পালিত বলিয়া অপর পাখির নীড়ে
পিকের কণ্ঠে এত গান ফোটে কি রে ?
মেঘ-শিশু ছাড়ি' সাগর-মাতার নীড়
উড়ে যায় হায় দূর হিমাদ্রি-শির,
তাই কি সে নামি বর্ষাধারার রূপে
ফুলের ফসল ফলায় মাটির স্তূপে ?
জননী গিরির কোল ফেলে নির্ঝর
পলাইয়া যায় দূর বন-প্রান্তর,
তাই কি সে শেষে হয়ে নদী-স্রোতধারা
শস্য ছড়ায়ে সিন্ধুতে হয় হারা ?
বিহগ-জননী স্নেহের পক্ষপুটে
ধরিয়া রাখে না, যেতে দেয় নভে ছুটে
বিহগ-শিশুরে, মুক্ত-কণ্ঠে তাই
সে কি গাহে গান বিমানে সর্বদাই ?

বেণু-বন কাটি' লয়ে যায় শাখা গুণি,
তাই কি গো তাতে বাঁশরির ধ্বনি শুনি?

উদয়-অচল ধরিয়া রাখে না বলি'
তরুণ-অরুণ রবি হয়ে ওঠে জ্বলি'।
আড়াল করিয়া রাখে না তামসী নিশা,
তাই মোরা পাই পূর্ণ শশীর দিশা।
আকাশ-জননী শূন্য বলিয়া—তার
কোলে এত ভিড় গ্রহ চাঁদ তারকার।
তেমনি আমিনা জননী শিশুরে লয়ে
'হালিমা'র কোলে ছেড়ে ছিল নির্ভয়ে!
মা'র বুক ত্যজি' আসিল ধাত্রী-বুকে,
গিরি-শির ছাড়ি' এল নদী গুহা-মুখে!

কেমনে নির্ঝর এল প্রান্তরে বহি'
অভিনবতর সে কাহিনী এবে কহি।
আরবের যত 'খান্দানি' ঘরে বহুকাল হতে ছিল রেওয়াজ
নবজাত শিশু পালন করিতে জননী সমাজে পাইত লাজ;
ধাত্রীর করে অর্পিত মাতা জনমিলে শিশু অমনি তায়,
মরু-পল্লীতে স্বগৃহে পালন করিত শিশুরে ধাত্রী মা'য়।
মরু প্রান্তর বাহি' ধাত্রীরা ছুটিয়া আসিত প্রতি বছর,
ভাগ্যবান কে জনমিল শিশু বড় ঘরে—নিতে খবর।
দূর মরুপারে নিজ পল্লীতে শিশুরে লইয়া তারে তথায়
করিত পালন সন্তান-সম যত্নে—পুরস্কার-আশায়।

ঊর্ধ্বে উদার গগন বিথার নিম্নে মহান গিরি অটল;
পদতলে তার পার্বতী মেয়ে নির্ঝরিণীর শ্যামাঞ্চল।
সেই ঝর্নার নুড়ি ও পাথর কুড়ায়ে কুড়ায়ে দুই সে তীর
রচিয়াছে মরু-দগ্ধ আরবি শ্যামল পল্লী শান্ত নীড়।
সেথায় ছিল না নগরের কল-কোলাহল কালি ধূলি-স্তূপ,
ঝর্নার জলে ধোওয়া তনুখানি পল্লীর চির-শ্যামলী রূপ।
সে আকাশ-তলে সেই প্রান্তরে—সেই ঝর্নার পিইয়া জল
লভিত শিশুরা অটুট স্বাস্থ্য, ঋজুদেহ, তাজা প্রাণ-চপল।
খেলা-সাথী ছিল মেষ-শিশু আর বেদুইন-শিশু দুঃসাহস,
মরু-গিরি দরী চপল শিশুর চরণের তলে ছিল গো বশ।

মরু-সিংহেরে করিত না ভয় এইসব শিশু তীরন্দাজ,
কেশর ধরিয়া পৃষ্ঠে চড়িয়া ছুটাত তাহারে মরুর মাঝ।
আরবি ঘোড়ায় হইয়া সওয়ার বল্লম লয়ে করিত রণ,
মাগিত সন্ধি খেজুর শাখার হাত উঠাইয়া মরু-কানন।
নাশপাতি সেব আনার বেদানা নজরানা দিত ফুল ফলের,
সোজা পিঠ কুঁজো করিয়াছে উট সালাম করিতে যেন তাদের!
'লু' হাওয়ায় ছুটে পালাত গো মরু ইহাদেরি ভয়ে দিক ছেয়ে,
রক্ত-বমন করিত অস্ত-সূর্য এদেরি তীর খেয়ে!

আরবের যত গানের কবিরা 'কুলসুম' 'ইমরুল কায়েস'
এই বেদুইন-গোষ্ঠীতে তারা জন্মিয়াছিল এই সে দেশ!
গাহিতে হেথাই আলোর পাখি ও গানের কবিরা যত সে গান,
নগরে কেবল ছিল বাণিজ্য, পল্লীতে ছিল ছড়ানো প্রাণ।
আরবের প্রাণ আরবের গান, ভাষা আর বাণী এই হেথাই,
বেদুইনদের সাথে মুসাফির বেশে ফিরিত গো সর্বদাই।
বাজাইয়া বেণু চরাইয়া মেষ উদাসী রাখাল গোঠে মাঠে,
আরবি ভাষারে লীলা-সাথী করে রেখেছিল পল্লীর বাটে।...

যে বছর হল মক্কা নগরে মোহাম্মদের অভ্যুদয়,
দুর্ভিক্ষের অনল সেদিন ছড়ায়ে আরব-জঠরময়।
ঊর্ধ্বে আকাশ অগ্নি-কটাহ, নিম্নে ক্ষুধার ঘোর অনল,
রৌদ্রে শুষ্ক হইল নিঝর, তরুলতা শাখা ফুল-কমল।
মক্কা নগরে ছুটিয়া আসিল বেদুইন যত ক্ষুধা-আতুর,
ছাড়ি প্রান্তর, পল্লীর বাট খর্জুর-বন দূর মরুর।
বেদুইনদের গোষ্ঠীর মাঝে শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠী 'বনি সায়াদ',
সেই গোষ্ঠীর 'হালিমা' জননী—দুর্ভিক্ষেতে গণি' প্রমাদ
আসিল মক্কা, যদি পায় হতে কোনো সে শিশুর ধাত্রী-মা;
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, 'আমিনা-কোল জুড়ি' চাঁদ পূর্ণিমা,
কোনো সে ধাত্রী লয় নাই এই শিশুরে হেরিয়া পিতৃহীন—
ভাবিল—কে দেবে পুরস্কার এর পালিবে যে ওরে রাত্রিদিন?
শিশুরে হেরিয়া হালিমার চোখে অকারণে কেন ধরে না জল,
বক্ষ ভরিয়া এল স্নেহ-সুধা—শুষ্ক মরুতে বহিল ঢল।
আরবি ভাষার ধাত্রী-মা ছিল এই সে গোষ্ঠী 'বনি সায়াদ',
এই গোষ্ঠীতে রাখিতে শিশুরে সব সে শরীফ করিত সাধ।

এই গোষ্ঠীর মাঝে থাকি' শিশু লভিল ভাষার সে সম্পদ,
ভাবিত নিরক্ষর নবী ঘরে সকলে আলেম মোহাম্মদ।

শিশুরে লইয়া হালিমা জননী চলিল মরুর পল্লী দূর,
ছায়া করে চলে সাথে সাথে তার ঊর্ধ্বে আকাশে মেঘ মেদুর।

নতুন করিয়া আমিনা জননী কাঁদিলেন হেরি শূন্য কোল,
অদূরে 'দলিজে' মুত্তালিবের শোনা গেল ঘোর কাঁদন-রোল।
পলাইয়া গেল চপল শশক-শিশু শুনি' দূর ঝর্না-গান,
বনমৃগ-শিশু পলাল মা ছাড়ি শুনি বাঁশরির সুদূর তান।
বিশ্ব যাঁহার ঘর, সে কি রয় ঘরের কারায় বন্দী গো?
ঘর করে পর অপরের সাথে সেই বিবাগীর সন্ধি গো!
শিশু ফুল হরি' নিল বন-মালী ফুলশাখা হতে ভোরবেলায়,
লতা কাঁদে, ফুল হেসে বলে, 'আমি মালা হব মা গো গুণী-গলায়!'

আসিল হালিমা কুটিরে আপন সুদূর শ্যামল প্রান্তরে,
সাথে এল গান শুনাতে শুনাতে বুলবুল্ পথ-প্রান্তরে।
পাহাড়তলীর শ্যাম প্রান্তর হ'ল আরো আরো শ্যামায়মান,
ঊর্ধ্বে কাজল মেঘ-ঘন-ছায়া, সানুদেশে শ্যামা দোয়েল গান!

তরুণ অরুণ আসিল আকাশে ত্যজিয়া উদয়-গিরির কোল,
ওরে কবি, তোর কণ্ঠে ফুটুক নতুন দিনের নতুন বোল!

দ্বিতীয় সর্গ

শৈশব-লীলা

খেলে গো ফুল্লশিশু ফুল-কাননের বন্ধু প্রিয়,
পড়ে গা উপ্‌চে তনু জ্যোৎস্না চাঁদের রূপ অমিয়।
সে বেড়ায়, হীরক নড়ে,
আলো তার ঠিক্‌রে পড়ে!
ঘোরে সে মুক্ত মাঠে পল্লীবাটে ধরার শশী,
সে বেড়ায় শুষ্ক মরুর শুক্লা তিথি চতুর্দশী।

অদূরে স্তব্ধগিরি মৌনী অটল তপস্বী-প্রায়,
পায়ে তার পুষ্প-তনু কন্যা যেন উপত্যকায়।
শিরে তার উদার আকাশ,
ব্যজনী দুলায় বাতাস।
বয়ে যায় গন্ধ শিলায় ঝর্না নহর লহর লীলায়,
যেতে সে খোশবু পানি ছিটায় কুলের ফুল মহলায়!

পাখি সব শিস দিয়ে যায় কিস্‌মিসেরি বল্লরীতে,
আকাশ আর বন্ দেবীতে মন বিনিময় নীল হরিতে।
মাঝে তার ফুল্লশিশু বেড়ায় খেলে ফুল-ভুলানো,
বুকে তার সোনার তাবিজ নিখিল আলোক দোল্-দোলানো।

কভু সে দুম্বা চরায়, সাধ করে হয় মেষের রাখাল,
কভু তার দৃষ্টি হারায় দূর সাহারায়, যায় কেটে কাল।
অচপল মৌনী পাহাড় মন হরে তার, রয় বসে সে,
খেলাতে মন বসে না, যায় হারিয়ে নিরুদ্দেশে।
অসীম এই বিশাল ভুবন
ওগো তার স্রষ্টা কেমন!
কে সে জন কর্‌ল সৃজন বিচিত্র এই চিত্রশালা?
মেষেরা যায় হারিয়ে, মুগ্ধ শিশু রয় নিরালা।
কভু সে বংশী বাজায়, উট-শিশুরা সঙ্গে নাচে,
ভুলে নাচ বেড়ায় খুঁজে কে যেন তায় ডাক্‌ছে কাছে
সহসা আন্‌মনা হয় সঙ্গীজনের সঙ্গীতে সে,
চোখে তার কার অপরূপ বেড়ায় রূপের ভঙ্গি ভেসে।
সাথী সব ভয় পেয়ে যায়, চক্ষুতে তার এ কোন্ জ্যোতি!
ও আঁখি নীল সুঁদিফুল সুন্দরেরে দেয় আরতি।

ও যেন নয় গো শিশু, পথ-ভোলা এক ফেরেশ্‌তা কোন্
ও যেন আপন হওয়ার ছল করে যায়, নয়কো আপন।

হালিমা ভয় চকিতা রয় চেয়ে গো শিশুর পানে,
ও যেন পূর্ণ জ্ঞানী, সকল কিছুর অর্থ জানে।
কে জানে, কাহার সাথে কয় সে কথা দূর নিরালায়,
কে জানে, কাহার খোঁজে যায় পালিয়ে বনের সীমায়!
কভু সে শিশুর মত,
কভু সে ধেয়ান-রত।

একি গো পাগল তবে, কিম্বা ভূতে ধর্‌ল এরে,
এনে হায় পরের ছেলে পড়্‌ল কি কু-গ্রহের ফেরে !

স্বামী তার বল্‌ল ভেবে, 'শোন্ হালিমা, কাল সকালে
দিয়ে আয় যাদের ছেলে তাদের কাছে, নয় কপালে
আছে সে বদ্‌নামি ঢের, নাই এ গ্রামে ভূতের ওঝা,
কাবাতে 'লাত মানাতের কৃপায় এ ভূত হবেই সোজা।'

হালিমা অশ্রু মুছে মোহাম্মদে আন্‌ল আবার
হারানো মাতৃক্রোড়ে, বল্‌লে, 'লহ পুত্র সোনার !'

আমিনার বক্ষ বেয়ে অশ্রু ঝরে আকুল স্নেহে,
ওরে মোর সোনার দুলাল আজ ফিরেছে আঁধার গেহে !
এল আজ মুত্তালিবের চোখের মণি, শান্তি শোকের,
এল আজ সফর করে সফর চাঁদে চাঁদ মুসাফের !
পারায়ে কৃষ্ণা তিথি শুক্লা তিথির আস্‌ল অতিথ্,
কত সে দিনের পরে আঁধার ঘরে উঠল রে গীত !

প্রত্যাবর্তন

সে-বার দূষিত ছিল বড় বায়ু মক্কাপুরীর,
নিঃশ্বাসে ছিল বিষের আমেজ হাওয়ায় সুরির।
কহিলেন দাদা মুত্তালিব, 'গো হালিমা শুন,
মরু-প্রান্তরে লয়ে যাও মোর চাঁদেরে পুন !
আবার যেদিন ডাকিব, আনিবে ফিরায়ে এরে,
মাঝে মাঝে এনে দেখাইয়া যেয়ো মোর চাঁদেরে !'

আমিনার চোখে ফুরাল শুক্লা চাঁদের তিথি,
আবার আসিল ভবনে অতীত-আঁধার ভীতি।
স্বপনে চলিয়া গেল যেন চাঁদ স্বপনে এসে,
দ্বিতীয়ার চাঁদ লুকাল আকাশে ক্ষণেক ভেসে।
অঙ্গ ভরিয়া অশ্রু-চুমায় চলিল ফিরে
সোনার শিশু গো—নীড় ত্যজি' পুন অজানা তীরে।

হালিমার বুকে খুশি ধরে না কো, নীলাঞ্চলে
হারানো মানিক পুন পেল তার ভাগ্যবলে !
চলে অলক্ষ্যে সাথে বেহেশ্‌ত-ফেরেশ্‌তারা,
মক্কার মণি পুন মরুপথে হইল হারা।

হালিমার দুই কন্যা 'আনিসা' 'হাফিজা' ছুটি
চুমিল খুশিতে মোহাম্মদের নয়ন দুটি !
'আবদুল্লাহ্‌' হালিমা-দুলাল মানের ভরে
রহিল দাঁড়ায়ে অদূরে, নয়নে সলিল ঝরে
সে যখন ছিল ঘুমায়ে, তাহার জননী কখন্‌
নিয়ে গেল কোথা মোহাম্মদেরে ; ভাঙিতে স্বপন
খুঁজিল কত না সাথীরে তাহার কানন গিরি,
রোদন করুণ প্রতিধ্বনিতে এসেছে ফিরি'।
শয়নে স্বপনে ওই মুখ তার স্মৃতির মাঝে
উঠিয়াছে ভাসি', হেরেছে তাহারে সকল কাজে।
নড়িয়া উঠেছে খেজুরের পাতা বাতাসে যবে
সে ভেবেছে তা'রে ডাকিতেছে সাথী নূপুর-রবে।
শিস দিত যবে বুলবুলি বসি' আনার-শাখে,
মনে হত তার, বন্ধু বংশী বাজায়ে ডাকে।
দুম্বা মেষের শিশুরা করুণ নয়ন তুলি
চাহিয়া থাকিত, খুঁজিত কাহারে সকল ভুলি'।
মেষ-চারণের মাঠে তরুতলে বসিয়া একা
পাঠায়েছে তার হারানো সখারে সলিল-লেখা।
ফিরিয়া আসিল লুকোচুরি খেলে যদি সে চপল,
ওর সাথে আড়ি—বল্‌ মায়ে ওরে নিয়ে যেতে বল্‌ !

হালিমার স্বামী হারিস্‌ শিশুরে লইল কাড়ি',
আনন্দ তার পুনরায় যেন ফিরিল বাড়ি।

মোহাম্মদ সে আবদুল্লার কণ্ঠ ধরি'
বলে, 'আমি কত কেঁদেছি দোস্ত তোমারে স্মরি'।'

ছুটিল আবার দুটিতে পাহাড়ী চারণ-মাঠে,
বংশী বাজায়ে দুম্বা চরায়ে সময় কাটে।
রাখালের রাজা আসিল ফিরিয়া রাখাল-দলে,
আবার লহর-লীলায় পাহাড়ী নহর চলে !

‘শাক্কুস্ সাদ্‌র’
(হৃদয়-উন্মোচন)

এমনি করিয়া চরাইয়া মেষ, বংশী বাজায়ে গাহিয়া গান,
খেলে শিশু নবী রাখালের রাজা মরুর সচল মরুদ্যান।
চন্দ্র তারার ঝাড় লণ্ঠন ঝুলানো গগন চাঁদোয়া-তল,
নিম্নে তাহার ধরণীর চাঁদ খেলিয়া বেড়ায় চল-চপল।
ঘন কুঞ্চিত কালো কেশদাম কলঙ্ক শুধু এই চাঁদের,
ঘুমালে এ চাঁদ কৃষ্ণা তিথি গো, জাগিলে শুক্লা তিথি গো ফের!
চাঁদ কি আকাশে বংশী বাজায়, গ্রহ তারকারা শুনি’ সে রব
চরিয়া বেড়ায় মুক্ত আকাশে মেষ বৃষ রাশি রূপে গো সব?
খেলিতে খেলিতে আন্‌মনা চাঁদ হারাইয়া যায় দূর মেঘে
অন্ধকারের অঞ্চলতলে, আন্‌মনে পুন ওঠে জেগে।
খেলিতে খেলিতে সেদিন কোথায় হারাল বালক মোহাম্মদ,
খুঁজিয়া বেড়ায় খেলার সাথীরা প্রান্তর বন গিরি ও নদ।
কোথাও সে নাই! খুঁজি সব ঠাঁই ফিরিয়া আসিল বালক দল,
হালিমারে বলে, ‘আমাদের রাজা হারাইয়া গেছে, দেখিবি চল্!’

কাঁদিয়া ছুটিল হালিমা, খুঁজিয়া প্রান্তর গিরি মরু কানন,
রবিরে হারায়ে নিশীথিনী মাতা এমনি করিয়া খোঁজে গগন!
এমনি করিয়া সিন্ধু-জননী হারামণি তার খুঁজিয়া যায়—
কোটি তরঙ্গে ভাঙিয়া পড়িয়া ধূলির ধরায় বালু-বেলায়।
কত নাম ধরে ডাকিল হালিমা, ‘ওরে যাদুমণি, সোনা মানিক!
ফিরে আয়, আয় ও চাঁদ-মুখের হাসিতে আবার প্লাবিয়া দিক্।
পেটে ধরি নাই, ধরেছি ত বুকে, চোখে ধরা মোর মণি যে তুই,
মোর বনভূমে আসিস্‌নি ফুল, এসেছিলি পাখি এ বনভূঁই!’

সহসা অদূরে চির-চেনা স্বরে শুনি রে ও কার মধুর ডাক,
ওকে ও মধুচ্ছন্দা গায়ন-কণ্ঠে উহার ওকি ও বাক্?
ও যেন শান্ত মরু-তপস্বী, ধেয়ানে উঠিছে কণ্ঠে শ্লোক,
শিশু-ভাস্কর—উহারি আশায় জাগিয়া উঠিছে সর্বলোক!
হালিমা বক্ষে জড়ায়ে ধরিতে ভাঙিল যেন গো চমক তার,
যেন অনন্ত জিজ্ঞাসা লয়ে খুলিল কমল-আঁখি বিথার।
‘একি এ কোথায় আসিয়াছি আমি’—জিজ্ঞাসে শিশু সবিস্ময়,
চুম্বিয়া মুখ হালিমা জননী ‘তোর মার বুকে’ কাঁদিয়া কয়।

'ওরে ও পাগল, কি স্বপন-ঘোরে ছিলি নিমগ্ন, বল্ রে বল্।
ওরে পথ-ভোলা, কোন্ বেহশ্‌ত-পথ ভুলে এলি করিয়া ছল?
দেহ লয়ে আমি খুঁজেছি ধরণী, মনে খুঁজিয়াছি শত সে লোক,
এমনি করিয়া, পলাতকা ওরে, এড়াতে হয় কি মায়ের চোখ?'

এবার বালক মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া বলে, 'জননী গো,
কি জানি কে যেন নিতি মোরে ডাকে, যেন সে সোনার মায়ামৃগ!
আজও সে ডাকিতে এড়ায়ে সবারে এসেছিনু ছুটি এ-মরুপথ,
ছুটিতে ছুটিতে হারাইনু দিশা, ভুলিনু আমারে, মোর জগৎ।
এই তরুতলে আসিতে আমার নয়ন ছাইয়া আসিল ঘুম,
হেরিনু স্বপনে—কে যেন আসিয়া নয়নে আমার বুলায় চুম।
আলোর অঙ্গ, আলোকের পাখা, জ্যোতির্দীপ্ত তনু তাহার,
কহিল সে, 'আমি খুলিতে এসেছি তোমার হৃদয়-স্বর্গদ্বার।'
খোদার হাবিব্—জ্যোতির অংশ ধরার ধূলির পাপ-ছোঁওয়ায়
হয়েছে মলিন, খোদার আদেশে শুচি করে যাব পুন তোমায়।
ঐশী বাণীর আমিই বাহক, আমি ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল,
বেহেশত হতে আনিয়াছি পানি, ধুয়ে যাব তনু মন ও দিল্।'
এই বলি মোরে করিল সালাম, সঙ্গিনী তার হুরীর দল
গাহিতে লাগিল অপরূপ গান, ছিটাইল শিরে সুরভি জল।
তারপর মোরে শোয়াইল ক্রোড়ে, বক্ষ চিরিয়া মোর হৃদয়
করিল বাহির! হল না আমার কোনো যন্ত্রণা কোনো সে ভয়!
বাহির করিয়া হৃদয় আমার রাখিল সোনার রেকাবিতে,
ফেলে দিল, ছিল যে কালো রক্ত হৃদয়ে জমাট মোর চিতে।
ধুইল হৃদয় পবিত্র 'আব-জমজম্' দিয়ে জিব্রাইল,
বলিল, 'আবার হল পবিত্র জ্যোতিমহান তোমার দিল্।
এই মায়াবিনী ধরার স্পর্শে লেগে ছিল যাহা গ্লানি-কলুষ্
যে কলুষ লেগে ধরার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না এই মানুষ,
পূত জম্‌জম্-পানি দিয়া তাহা ধুইয়া গেলাম—তাঁর আদেশ,
তুমি বেহেশ্‌তি, তোমাতে ধরার রহিল না আর ম্লানিমা-লেশ।'
শেলাই করিয়া দিল পুন মোর বক্ষে রাখিয়া ধৌত দিল,
সালাম করিয়া উর্ধ্বে বিলীন হইল আলোক জিব্রাইল!'

বুঝিতে পারে না অর্থ ইহার—হালিমা কাঁদিয়া বুক ভাসায়,
বলে, 'কত শত জিন পরী আছে ঐ পর্বতে ঐ গুহায়,
আর তোরে আমি আসিতে দিব না মেষ-চারণের এই মাঠে
কোন্ দিন তোরে ভুলাইয়া তারা লয়ে যাবে দূর মরু-বাটে।'

ছুটিয়া আসিল পড়শী আবালবৃদ্ধ-বনিতা ছেলেমেয়ে,
বলে, 'আসেবের আসর হয়েছে উহার উপরে, দেখ চেয়ে!
অমন সোনার ছেলে, ওকি আর মানুষ, ও যে গো পথভোলা
কোকাফমুলুক পরীস্থানের পরীজাদা কোনো রূপওলা।'
বিস্ময়াকুল নয়নে[১] চাহিয়া খানিক কহিল মোহাম্মদ হাসি',
'আম্মা গো, ওরা কি বলিছে সব? আমি যে তোরেই ভালোবাসি!
তুমি আম্মা ও আমি আহ্‌মদ, পায়নি ত মোরে জিন পরী,
এসেছিল সে-ত জিব্রাইল সে ফেরেশ্‌তা! মা গো, হেসে মরি!
এই ত তোমার কোলে আছি বসে, দীওয়ানা কি আমি? তুই মা বল্‌!
আমারে পায়নি পরীতে, ওদেরে পাইয়াছে ভূতে তাই এ ছল্‌!'

হালিমা জড়ায়ে বক্ষে বালকে বলে, 'বাপ্পা তুমি বলেছ ঠিক!'
মনের শঙ্কা যায় না কো তবু, বাহিরে দস্যু ঘরে মানিক।
মনে পড়ে তার, সেদিনও ইহার জননী আমিনা এই কথাই
বলেছিল, 'কই, খোকার আমার কোথাও তেমন আভাসও নাই!
দেখিছ না ওর চোখ মুখ কত তেজ-প্রদীপ্ত, তাই লোকে
যা-তা বলে! আমি মানি না এসব, যদি দেখি ইহা নিজ চোখে!'
জননীর মন অন্তর্যামী, সে ত করিবে না কখনো ভুল,
দেখেনি ত এরা দুনিয়ায় কভু ফুটিবে এমন বেহেশ্‌ত্-গুল!
বারে বারে চায় বালকের চোখে—ও যেন অতল সাগর-জল,
কত সে রত্ন মণি-মাণিক্য পাওয়া যায় যেন খুঁজিলে তল।
বক্ষে চাপিয়া চুমিয়া ললাট বলে, 'যদি হস বাদ্‌শা তুই
মনে পড়িবে এ হালিমা মায়েরে? পড়িবে মনে এ পল্লীভুঁই?'

'মা গো মনে রবে।' হাসিয়া বালক কহিল কণ্ঠে জড়ায়ে মা'র;
ভবিষ্যতের দফ্‌তরে লেখা রহিল সে কথা, ও বাণী যেন গো খোদ খোদার!

সর্বহারা

সকলের তরে এসেছে যে জন, তার তরে
পিতার মাতার স্নেহ নাই, ঠাই নাই ঘরে।
নিখিল ব্যথিত জনের বেদনা বুঝিবে সে,
তাই তারে লীলা-রসিক পাঠাল দীন বেশে।

---
১. পাঠান্তর 'বিস্মিত চোখে'

আশ্রয়হারা সম্বলহীন জনগণে
সে দেখিবে চির-আপন করিয়া কায়মনে—
বেদনার পর বেদনা হানিয়া তাই তারে
ভিখারি সাজায়ে পাঠাল বিশ্ব-দরবারে !
আসিল আকুল অন্ধকারে বুকে হেথাই।
আলোর স্বপন হরিবে, আলোর দিশারী, তাই
নিখিল পিতৃহীনের বেদনা নিজ করে
মুছাবে বলিয়া—নিখিলের পিতা ধরা পরে
পাঠাইল তার বন্ধুরে করি' পিতৃহীন,
দীনের বন্ধু আসিল সাজিয়া দীনাতিদীন।
পিতৃহীন সে শিশু পুনরায় মাতারে তার
হারাইল আজ ! শোক-নদী হল শোক-পাথার !

* *

হালিমার কোলে গত হয়ে গেল পাঁচ বছর—
শশী-কলা সম বাড়িতে লাগিল শশী-সোদর।

সহসা সেদিন শ্যাম প্রান্তরে নিষ্পলক
চাহিয়া অদূরে কি মেঘের ছায়া হেরি বালক
উতলা হইল ফিরিবার লাগি জননী-ক্রোড় ;
গগন-বিহারী বিহগের চোখে নীড়ের ঘোর !
কত গ্রহ তারা কত মেঘ ডাকে নীলাকাশে,
বিহরি খানিক চপল বিহগ ফিরে আসে
আপনার নীড়ে ! ভুলিতে পারে না মা'র পাখা,
আকাশের চেয়ে তপ্ততর সে স্নেহ-মাখা !...

কাঁদিতে লাগিল মরু-পল্লীর মাঠ ও বাট,
ভাঙিয়া গেল গো খেজুর বনের রাখালি নাট।
পাহাড়তলীতে দুম্বা শিশুরা চাহিয়া রয়,
তাহাদের চোখে আজ পাহাড়ের ঝর্না বয় !
হালিমার ঘরে আলো নিভে গেল দমকা বায়,
পুত্র কন্যা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্চ্ছা যায়।
তবু তারে ছেড়ে দিতে হল ! ভাঙি' মেঘের বাঁধ
পলাইয়া গেল রাঙা পঞ্চমী তিথির চাঁদ !

আমিনার কোলে ফিরে এল আমিনার রতন,
বৃদ্ধ মুত্তালিবের যষ্ঠি-যখের ধন,
স্কন্ধে তুলিয়া বালকে বৃদ্ধ এল কাবায়,
বেদীতে রাখিয়া বালকে খোদার আশিস চায়।
সাত বার তারে করাইল কাবা প্রদক্ষিণ
প্রার্থনা করে, 'রক্ষ পিতা এ পিতৃহীন !'

আমিনা সাদরে হালিমায় কয়, 'কি দিব ধন
আমার রতনে করিয়াছ শত যতন,
মনের মতন দিব যে অর্থ, নাহি উপায়,
তবু বল মোর যা আছে ঢালিব তোমার পায়।
আমি ধরেছিনু গর্ভে—তুমি যে ধরি' বুকে
করেছ পালন—মোরা সহোদরা সেই সুখে।'

হালিমার চোখে বয়ে যায় জমজম পানি,—
মোহাম্মদেরে ধরে কাঁদে, নাহি সরে বাণী।
কাঁদিয়া কহিল মোহাম্মদের, 'যাদু আমার,
তুই দে আমায় আমার প্রাপ্য পুরস্কার !
আমিনা-বহিন জানে না ত তোরে কেমন সে
রাখিয়াছি বুকে দুধ দিয়ে না সে ভালোবেসে।'

ছুটিয়া আসিল বালক ফেলিয়া মায়ের কোল,
কণ্ঠ জড়ায়ে হালিমারে বলে মধুর বোল।
চুমু দিয়ে কয়, 'মা গো, এই লহ পুরস্কার !'
হালিমা মুছিয়া আঁখি, কয়, 'কিছু চাহি না আর !
সব পাইয়াছি আমিনা, ইহার অধিক বোন,
পারিবে আমারে দিতে জহরত মানিক কোন !'

জননীর কোল জুড়াল আবার নব সুখে,
চোখের অশ্রু শিশু হয়ে আজ দুলে বুকে !

পুনঃ রবিয়ল আউওল চাঁদ এল ফিরে,
এবার চাঁদের ললাট আসিল মেঘে ঘিরে।
কনক-কান্তি বালক খেলায় আঙ্গিনায়,
আমিনার মনে স্বামী-স্মৃতি নিতি কাঁদিয়া যায়।

ফিরিয়া ফিরিয়া আসিল সেই সে চান্দ্রমাস—
আবদুল্লাহ্ গেল পরবাসে ফেলিয়া শ্বাস,
আর ফিরিল না—মদিনায় নিল চির-বিরাম!
আমিনার চোখে 'সোবেহ্‌সাদেক' হইল 'শাম'!
মদিনার মাটি লুকায়ে রেখেছে স্বামীরে তার,
যাবে সে খুঁজিতে যদি বা চকিতে পায় 'দিদার'।
যে কবর-তলে আছে সে লুকায়ে, সেই কবর
জিয়ারত করি' পুছিবে স্বামীর তার খবর।
মৃত্যু-নদীর উজান ঠেলিয়া কেহ কি আর
ফিরিতে পারে না ওপার হইতে পুনর্বার?
দেখিবে ডুবিয়া—নাই যদি ফিরে, ভয় কি তায়?
হয়ত একূলে হারায়ে ওকূলে প্রিয়রে পায়!

আহ্‌মদে লয়ে আমিনা মা চলে মদিনা-ধাম,
জানে না, সে চলে লভিতে স্বামীর সাথে বিরাম।
জানে না সে চলে জীবন-পথের শেষ সীমায়,
ওপার হইতে চিরসাথী তা'রে ডাকিছে, 'আয়।'
কত শত পথ-মঞ্জিল মরু পারায়ে সে
দাঁড়াল স্বামীর গোরের শিয়রে আজ এসে।
বুঝিতে পারে না বালক, কেন যে জননী, হায়!
কবর ধরিয়া লুটায় আহত কপোতী-প্রায়!
বালকে বক্ষে জড়াইয়া বলে, 'ওঠ স্বামী,
তোমার অ-দেখা মানিকে এনেছি দিতে আমি!'
মার দেখাদেখি কাঁদিল বালক, চুমিল গোর,
বলে—'মা গো তোর চেয়ে ছিল ভালো পিতা কি মোর?
তোমার মতন ভালোবাসিত সে? তবে কেন
না ধরিয়া কোলে মাটিতে লুকায়ে রয় হেন?'

কি বলিবে মাতা! ক্রন্দনরত বালকে তার
বক্ষে ধরিয়া চুম্বে কবর বারম্বার।
মাখিয়া স্বামীর কবরের ধূলি সকল গায়
মক্কার পথে আবার আমিনা ফিরিয়া যায়।
ফিরে যেতে মন সরে না ছাড়িয়া গোরস্থান,
তবু যেতে হবে—এ বালক এ যে স্বামীর দান!
মরু-পথে বাজে উট-চালকের বংশী সুর,
মনে হয় যেন সেই ডাকে তারে ব্যথা-বিধুর!

মনে মনে বলে—'অন্তর্যামী ! শুনেছি ডাক,
তুমি ডাকিয়াছ—ছিঁড়ে যাব বন্ধন বেবাক !'
কিছুদূর আসি' পথ-মঞ্জিলে আমিনা কয়—
'বুকে বড় ব্যথা, আহ্‌মদ, বুঝি হ'ল সময়
তোরে একলাটি ফেলিয়া যাবার ! চাঁদ আমার,
কাঁদিস্‌নে তুই, রহিল যে রহমত্‌ খোদার !'
বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িল ঢলি',
ফিরদৌসের পথে মা আমিনা গেল চলি' !

বজ্র-আহত গিরি-চূড়া সম কাঁপি' খানিক
মার মুখ চাহি' রহিল বালক নির্নিমিখ্‌ !
পূর্ণিমা চাঁদে গ্রাসে রাহু এই জানে লোকে,
গরাসিল রাহু আজ ষষ্ঠী চন্দ্রকে !

* *

বাজ-পড়া তালতরু সম একা বৃন্তহীন
দাঁড়ায়ে বৃদ্ধ মুত্তালিব
আকাশ-ললাটে ললাট রাখিয়া নিশি ও দিন
দেখায় তাহার বদ্‌নসিব।
আবদুল্লাহ্‌ গিয়াছিল, গেল আমিনা আজ
মোহাম্মদেরে দিয়া জামিন !
দরদ-মুলুকে বাদশাহ শিরে বেদনা আজ
উন্নত শির বীর প্রাচীন,
ফরিয়াদ করে আকাশে তুলিয়া নাঙ্গা শির,
'ওরে বালক কেন এলি হেথায়,
নাহি পল্লব-ছায়া পোড়া তরু মরুর তার
কি দিয়া আতপ নিবারি হায় !
খাক হয়ে গেছে মরু-উদ্যান, বালুর উপরে বালুর স্তূপ
রয়েছে সেখানে কবরগাহ্‌
গুল্‌ নাই, কেন পোড়াইতে পাখা এলি মধুপ,
শোকপুরী—আমি শাহানশাহ !
নাহি পল্লব শাখা নাই একা তালতরু,
উড়ে এলি হেথা বুলবুলি !
ঊর্ধ্বে তপ্ত আকাশ নিম্নে খর মরু
'বিয়াবানে' এলি গুল্‌ ভুলি' !'

যত কাঁদে তত বুকে বাঁধে আরো, কে রে কপট
মায়াবী খেলিছে খেলা এমন,
প্রাচীন বটের সারা তনু ঘিরি, জটিল জট
আঁকড়িয়া আছে পোড়া কানন!
ব্যাধ-ভয়াতুর শিশু পাখি সম তবু বালক
জড়াইয়া পিতামহেরে তার,
জননীর চলে-যাওয়া পথে চাহে নিষ্পলক
ডাগর নয়ন ব্যথা বিথার।
যে ডাল ধরে সে, সেই ডাল ভাঙে অ-সহায়[২],
তবু আর ডাল ধরে আবার,
তৃণটিও ধরে আঁকড়ি স্রোতে যে ভাসিয়া যায়
আশা মনে—যদি পায় কিনার।
শোকে ঘুণ-ধরা জীর্ণ সে শাখা, তাই ধরি'
রহিল বালক প্রাণপণে,
জানে না, এ ডালও ভাঙিয়া পড়িবে শিরোপরি
আবার ঘোর প্রভঞ্জনে।

পাখা মেলে এল শোকের বিপুল 'সি-মোরগ'
কালো হ'ল ধরা সেই ছায়ায়,
দুবছর পরে—পিতামহ চলি' গেল স্বরগ
ছিঁড়ি জটায়ু-পাখা যেন,
আট বছরের বালকের বাহু শক্তি তায়
বাঁধিয়া রাখিবে নাই হেন।
আরবের বীর মক্কার শির মুত্তালিব
কোরায়শী সর্দার মহান,
আখেরি নবীর না-আসা বাণীর দূত নকিব
করিল গো আজ মহাপ্রায়াণ।
মুকুটবিহীন মক্কার বাদ্‌শাহ্ আজি
ফেলে গেল ধূলি সিংহাসন,
মক্কার ঘরে ওঠে ক্রন্দন বাজি',
মাতম করিছে শত্রুগণ।

ডাকিয়া পুত্র আবুতালেবেরে মুত্তালিব
দিয়াছিল সঁপি' আহ্‌মদে,
জ্যেষ্ঠতাতের কোলে এল সব-হারা 'হাবিব'
দিঘির কমল এল নদে।

মূলহারা ফুল স্রোতে ভেসে যায় নির্বিকার
নাহি আর সুখ-দুঃখলেশ,
শুধু জানে তারে ভাসিতে হইবে বারম্বার
এমনি অকূলে নিরুদ্দেশ!
রহস্য-লীলা রসিক খোদার অন্ত নাই,
কি জানি সাধিতে কোন্ সে কাজ
বন্ধুরে ডাকে বন্ধুর পথে—বেদনা নাই
ফুলেরে ফোটায় কাঁটার মাঝ।
নির্বেদ সে কি, নাহি গো দুঃখ ব্যথা কি তার?
সৃষ্টি কি তার শুধু খেয়াল?
শুধু ভাঙাগড়া পুতুল খেলা কি নির্বিকার
খেলে মহাশিশু চির সে কাল?
জগতেরে আলো দানিবে যে—কেন অন্ধকার
তার চারপাশে ঘিরিয়া রয়?
সব শোকে দিবে শান্তি যে—শৈশব তাহার
কেন এত শোক-দুঃখময়?
কেহ তা জানে না, জানিবে না কেহ, সদুত্তর
পাইবে না কেহ কোনো সেদিন,
শুধু রহস্য, জিজ্ঞাসা শুধু, চির-আড়াল
বিস্ময় আদি-অন্তহীন!
মাতৃগর্ভে শিশু যবে—হল পিতৃহীন,
পাইল না কভু পিতৃক্রোড়,
ষষ্ঠ বরষে হারাল মাতায়, স্নেহ-বিহীন
জীবনে কেবলি ঘাত্র কঠোর!
পুন অষ্টম বরষে হারাল পিতামহে
সবহারা শিশু নিরাশ্রয়
পড়িল অকূল তরঙ্গাকুল ব্যথা-দহে,
দশদিশি যেন মৃত্যুময়!
খেলে যে বেড়াবে ধুলা-কাদা লয়ে স্নেহনীড়ে,
ব্যথার উপরে পেয়ে ব্যথা
বালক-বয়সে হল সে খেয়ানী মরুতীরে—
অতল অসীম নীরবতা
ছাইল আজিকে জীবন তাহার, একা বসি'
ভাবে, এ জীবন মৃত্যু হায়!

কেন অকারণ? কেন কেঁদে ফেরে ক্রন্দসী
এই আনন্দময় ধরায়?

পলাতক শিশু ঘরে নাহি রয়, নিষ্কারণ
ঘুরিয়া বেড়ায় পথে পথে,
খুঁজিয়া বেড়ায় মরু-কান্তার খেজুর বন
অন্ধগুহায় পর্বতে,
সকল দিশার দিশারীর দেখা পাবে বুঝি,
হবে সমাধান সমস্যার,
'আব-হায়াতের' মৃত্যু-অমৃত পথে খুঁজি'—
খুঁজে পায়নি যা সেকান্দার।
এমনি করিয়া বেদনার পরে পেয়ে বেদন
অল্প বয়সে শেষ নবী
ভবে তারি কথা, এই রহস্য যার সৃজন—
আঁধার যাহার—যার রবি!

তৃতীয় সর্গ

কৈশোর

বিশ্ব-মনের সোনার স্বপনে কিশোর তনু বেড়ায় ঐ
তন্দ্রা-ঘোরে অন্ধ আঁখি নিখিল খোঁজে কই সে কই।
বাজিয়ে বাঁশি চরায় উট,
নিরুদ্দেশে দেয় সে ছুট,
'হেরার' গুহায় লুকিয়ে ভাবে—এ আমি ত আমি নই।
অতল জলে বিম্ব-সম ফুটেই কেন বিলীন হই!

রূপ ধরে ঐ বেড়ায় খেলে দাহন-বিহীন অগ্নিশিখ
পথিক ভোলে পথ চলা তার, দাঁড়িয়ে দেখে নির্নিমিখ।
সাগর-অতল ডাগর চোখ
ভোলায় আকাশ অলখ-লোক,
যায় যে পথে—ফিন্‌কি রূপের ছড়িয়ে পড়ে দিগ্বিদিক,
আরব-সাগর-মন্থন-ধন আরব দুলাল নীল মানিক।

পলিয়ে বেড়ায় পলাতকা, রাখতে নারে আপন জন,
কারুর পানে চায় না ফিরে, কে জানে তার কোথায় মন !
আদর করে সবাই চায়,
সে চলে যায় চপল পায়,
কে যেন তার বন্ধু আছে, ডাকছে তারে অনুক্ষণ,
তার সে ডাকের ইঙ্গিত ঐ সাগর মরু পাহাড় বন।

মক্কাপুরীর রত্ন-মালায় মধ্যমণি এই কিশোর,
পিক পাপিয়া অনেক আছে—দূর-বিহারী এ চকোর।
কি মায়া যে এ জানে,
অজানিতে মন টানে,
সবার চোখে নিথর নিশা, উহার চোখে প্রভাত ঘোর।
ফটিক জলের উষর দেশে সে এসেছে বাদল-মৌর।

এমনি করে দ্বাদশ বরষ একার জীবন যায় কাটি',
আবুতালেব বল্‌ল 'এবার কর্‌ব সোনা এই মাটি।
আহ্‌মদ, তোর দৌলতে !
এবার যাব দূর পথে
বাণিজ্যে 'শাম' 'মোকাদ্দসে', তুই যেন বাপ রোস খাঁটি,
দেখিস্ তুই এ তোর পিতাম'-পিতার পুত এই ঘাঁটি !'

'চাচা, তোমার সঙ্গে যাব', বল্‌ল কিশোর শেষ নবী ;
চক্ষে তাহার উঠল জ্বলে ভবিষ্যতের কোন্ ছবি !
কে যেন দূর পথের পার
ডাকছে তারে বারম্বার,
সন্ধানে তার পার হবে সে এই সাহারা এই গোবি,
আকাশ তারে ডাক দিয়েছে, আর কি বাঁধা রয় রবি ?

বুঝায় যত আবুতালেব, 'মানিক, সে যে অনেক দূর !
দজ্‌লা ফোরাত পার হতে হয়, লঙ্ঘিতে হয় পাহাড় তূর।
মরুর ভীষণ 'লু' হাওয়া,
যায় না সেথা জল পাওয়া,
কত সে পথ যাব মোরা, ঘুরতে হবে অনেক ঘুর !'
কিশোর চোখে ভেসে ওঠে কোকাফ মুলুক পরীর পুর।

লঙ্ঘি সবার নিষেধ-বাধা চাচার সাথে কিশোর যায়
বাণিজ্যে দূর দেশে প্রথম উটের পিঠে—মরুর নায়।
দেখ্‌বি রে আয় বিশ্বজন,
রত্ন খোঁজে যায় রতন!
ধুলায় করে সোনা-মানিক যে-জন ঈষৎ পার ছোঁওয়ায়,
আনতে সোনা সে যায় রে ঐ সোনার রেণু ছিটিয়ে পায়!

দেখবি কে আয়, দরিয়া চলে নহর থেকে আন্‌তে জল,
আন্‌তে পাথর চল্‌ল পাহাড় ঝর্না-পথে সচঞ্চল।
ফুলের খোঁজে কানন যায়,
নতুন খেলা দেখ্‌বি, আয়!
বেহেশ্‌ত্‌-দ্বারী রেজ্‌ওয়ান চায় কোথায় পাবে মিষ্টি ফল!
সূর্য চলে আলোর খোঁজে, মানিক খোঁজে সাগর-তল!

দেখবি কে আয় আজ আমাদের নওল কিশোর সওদাগর,
শুক্লা দ্বাদশ তিথির চাঁদের কিরণ ঝলে মুখের পর!
আয় মহাজন ভাগ্যবান,
এই সদাগর এই দোকান
আর পাবিনে, আর পাবিনে এমন বিকি-কিনির দর!
আয় গুনাহ্‌গার, এবার সেরা সওদাগরেরর চরণ ধর্‌!

আয় গুনাহ্‌গার, লাভ লোকসান খতিয়ে নে তোর এই বেলা,
আসবে না আর এমন বণিক, বস্‌বে না আর এই মেলা।
ফিরদৌসের এই বণিক
মাটির দরে দেয় মানিক!
জহর নিয়ে জহরত্‌ দেয়, নও-বণিকের নও-খেলা।
আয় গুনাহ্‌গার, ক্ষতির হিসাব চুকিয়ে নে তোর এই বেলা!

গুনাহ্‌গারীর জীবন-খাতায় শূন্য যাদের লাভের ঘর,
এই বেলা আয়—ভুলিয়ে নে সব, কিশোর বয়েস সওদাগর।
আন রে জাহাজ আন রে উট,
বিশ হাতে আজ মানিক লুট্‌।
অর্থ খুঁজে ব্যর্থ যে-জন, এর কাছে খোঁজ তার খবর।
শূন্য-ঝুলি দেউলিয়া আয়, পুণ্যে ঝুলি বোঝাই কর্‌।

আপন প্রেয় শ্রেয় যা সব মৃত্যুরে তা দান করে
অপরিমাণ জীবন-পুঁজি সে এনেছে অন্তরে।
তাই দিবে সে বিলিয়ে আজ
সকল জনে বিশ্বমাঝ!
আয় দেনাদার, বিনা সুদে ঋণ দেবে এ প্রাণ ভরে!
ঋণ-দায়ে যে পালিয়ে বেড়ায়, শোধ দেবে এ, আন্ ধরে!...

পক্ষীরাজে পাল্লা দিয়ে মরুর পথে ছুটছে উট
চরণ তার আজ বারণ-হারা, রুখ্‌তে নারে বল্গা-মুঠ।
পৃষ্ঠে তাহার এ কোন্ জন,
চলতে শুধু চায় চরণ
'হজজ্' 'রমল্' ছন্দ-দোলে দুলিয়ে তনু সে দেয় ছুট!
উট নয় সে, ফিরদৌসের বোররাক—নয় নয় এ ঝুট!
চলতে পথে মনে ভাবে যতেক আরব বণিক দল—
উষর মরুর ধূসর রোদেও কেম্‌নে তনু রয় শীতল!
মেঘ চাইতেই পায় পানি,
এ কোন্ মায়ার আমদানি!
খুঁড়তে মরু ঠাণ্ডা পানি উথ্‌লে আসে অনর্গল।
উড়ছে সাথে সফেদ কপোত ঝাঁক বেঁধে ঐ গগন-তল।

বুঝ্‌তে নারে, ভাবে এ-সব খোদার খেলা, নাই মানে!
মরুর রবি নিষ্প্রভ কি হল এবার, কে জানে।
ছিটায় না সে আগুন-খই,
সে 'লু'-হাওয়ায় ঘূর্ণি কই,
থাক্‌ত না ত এমন ডাঁশা আঙুর মরুর উদ্যানে।
যাদুকরের যাদু এ-সব—মরুর পথে সবখানে।

পৌঁছাল শেষ দূর বোস্‌রায় তালিব, আরব সওদাগর;
নগরবাসী আস্‌ল ছুটে, দেখবে জিনিস নতুনতর।
বণিক-দলে ও কোন্‌জনে—
চক্ষে নিবিড় নীলাঞ্জন,
এই বয়সে কে এল ঐ শূন্য করে কোন্ সে ঘর!
কার আঁচলের মানিক লুটায় মরুর ধুলায় পথের পর!

অপরূপ এক রূপের কিশোর এসেছে 'শাম', উঠল রোল,
মুখর যেমন হয় গো বিহগ আস্‌লে রবি গগন-কোল।
পালিয়ে হুরীস্থান সুদূর
এসেছে এ কিশোর হুর,
নওরোজের আজ বস্‌ল মেলা, রূপের বাজার ডামাডোল!
আকাশ জুড়ে সজল মেঘের কাজল নিশান দেয় গো দোল্।

রূপ দেখেছে অনেক তারা, এ রূপ যেন অলৌকিক,
এ রূপ-মায়া ঘনিয়ে আসে নয়ন ছেড়ে মনের দিক!
আস্‌ল পুরোহিতের দল,
দৃষ্টি তাদের অচঞ্চল;
'মোহন' ধ্যানে দেখ্‌লে যারে, রূপ ধরে কি সেই মানিক?
আস্‌ল মানব-ত্রাণের কিশোর ছেলে এই বণিক।

কবুতরায় কূজন-গীতি গাইছে কবুতরে ঝাঁক,
দুম্বা-শিশু মা ভুলে তার উহার মুখে চায় অ-বাক্।
গগন-বিথার কাজল মেঘ,
ফুল-ফোটানো পবন-বেগ,
মনের বনে শহ্‌দ ঝরে আপ্‌নি ফেটে মধুর চাক,
মুঞ্জরিল পুষ্পে পাতায় মলিন লতা তরুর শাখ।

সেথায় ছিল ঈসাই-পুরুত 'বোহায়রা' নাম, ধ্যান-মগন,
ঈসাই-দেউল মাঝে বসে উথ্‌লে ওঠে বয়ন-মন!
বস্‌ল ধ্যানে পুনর্বার,
আগমনী আজকে কার।
দেখ্‌লে ধ্যানে—সকল নবী ঈসা, মুসা, দাউদ, যন,
আসার খবর কইল যাহার আজ এসেছে সেই রতন!

দেখল—তারে বিলিয়ে ছায়া কাজল নীরদ ফিরছে সাথ,
লুটিয়ে পড়ে মূর্তি-পূজার দেউল, টুটে, 'লাত্ মানাত্'।
অগ্নি-পূজার দেউল সব
যায় নিভে গো, করে স্তব,
তরুর ছায়া সরে আসে বাঁচাতে গো রোদের তাত।
জন্তু জড় কইছে 'সালাত্', নতুন 'দীনের' 'তেলেস্‌মাত্'!

সে এসেছে বণিক বেশে এই সিরিয়ার এই নগর,
ধ্যান ফেলে সে আস্‌ল ছুটে, যথায় আরব-সওদাগর।
উদ্দেশ যার পায় না মন
হাতের কাছে আজ সে জন,
'বোহায়রা' চায় পলক-হারা, লুটাতে চায় ধূলার পর।
গগন ফেলে ধরায় এল আজকে ধ্যানের চাঁদ অ-ধর।

কিশোর নবীর দস্ত চুমি' 'বোহায়রা' কয়, 'এই ত সেই—
শেষের নবী—বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাঁহার উদ্দেশেই।
আল্লার এই শেষ 'রসুল',
পাপের ধরায় পুণ্যফুল,
দিন-দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নেই।
আল্লার এ রহমত রূপ, নিখিল খুঁজে পায় না যেই।'

বোহায়রা কয়, 'আমার মঠে রইল দাওয়াত আজ সবার।'
মুগ্ধ-চিতে শুন্‌ল আলিব সকল কথা বোহায়রার।
হাস্‌ল শুনে কোরেশগণ,
বলল, 'ফজুল ওর বচন!'
শুধায় তবু, 'কেমন করে তুমিই পেলে খবর তার?'
বোহায়রা কয় হেসে, 'যেমন দীপের নীচেই অন্ধকার।

'দেখ্‌ছি আমি কদিন থেকেই ধ্যানের চোখে অসম্ভব
অনেক কিছু—পাহাড় নদী কাহার যেন করে স্তব,
প্রতি তরু পাষাণ জড়
এই কিশোরের চরণ পর
পড়ছে ঝুঁকে অধোমুখে সিজ্‌দা করার লাগি' সব।
সেদিন হতে শুনছি কেবল নুতনতর 'সালাত'-রব।

'দেখেছি এর পিঠের পরে নবুয়তের মোহর সিল,
চক্ষে ইহার পলক-বিহীন দৃষ্টি গভীর নিতল নীল।
নদী ছাড়া কারেও গড়
করে না কো পাষাণ জড়!
'নজ্জুম' সব বল্‌ছে সবাই, আস্‌বে সেজন এ মঞ্জিল্—
এই সে মাসে; আমার ধ্যানে তাদের গোণায় আছে মিল।

'রুমীয়গণ দেখ্‌লে এরে হয়তো প্রাণে করবে বধ,
দিনের আলোয় আর এনো না, আবুতালিব, এ সম্পদ্ !
এই যে কিশোর সুলক্ষণ—
দেখলে ইহার শত্রুগণ—
ফেল্‌বে চিনে', মার্‌বে প্রাণে, খোদার কালাম কর্‌বে রদ।'
তালিব শুনে কাঁপ্‌ল ভয়ে, হাস্‌ল শুনে মোহাম্মদ।

এমন সময় আস্‌ল সেথা সপ্ত রোম্যান অস্ত্র-কর,
বোহায়রা কয়, 'কাহার খোঁজে এসেছে এই যাজক-ঘর ?'
বল্‌ল তারা, 'খুঁজছি তায়
শেষের নবীর আসন চায়
যে জন—তারে, বেরিয়েছে সে এই মাসে এই পথের পর !'
বোহায়রা কয়, 'বণিক এরা, ইহারা নয় নবীর চর !'

ফিরে গেল রোম্যান্ ইহুদ, বোহায়রা কয়, 'আজ রাতে
পাঠিয়ে দাও এ কিশোর কুমার তোমার স্বদেশ মক্কাতে।'
কিশোর নবী সওদাগর
চল্‌ল ফিরে আবার ঘর ;
বেলাল, আবুবকর চলে সঙ্গী হয়ে সেই সাথে।
জীবন-পথের চির-সাথী সাথী হল আজ প্রাতে।

সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ

আঁধার ধরণী চকিতে দেখিল স্বপ্নে রবি,
মক্কায় পুন ফিরিয়া আসিল কিশোর নবী।
ছাগ মেষ লয়ে চলিল কিশোর আবার মাঠে,
দূর নিরালায় পাহাড়তলীর একলা বাটে।
কি মনে পড়িত চলিতে চলিতে বিজন পুরে,
কে যেন তাহারে কেবলি ডাকিছে অনেক দূরে।
আস্‌মানি তার তাম্বু টাঙানো মাথার পরে,
গ্রহ রবি শশী দুলিতেছে আলো স্তরে স্তরে।
ভুলে গিয়ে পথ, ভুলি' আপনায়, বিশ্ব ভুলি'
বসিত কিশোর আসন করিয়া পথের ধূলি।

থমকি' দাঁড়াত গগনে সূর্য, ধেয়ান-রত
কিশোরে হেরিতে নমিত পাহাড় শ্রদ্ধা-নত।
সাগরের শিশু মেঘেরা আসিত দানিতে ছায়া,

* * *

সহসা বাজিল রণ-দুন্দুভি আরব দেশে,
'ফেজার' যুদ্ধ আসিল ভীষণ করাল বেশে।
মরুর মাতাল মাতিল রৌদ্র-শারাব পিয়া,
আরবের সব গোত্র সে রণে নামিল গিয়া।
যে গৃহ-যুদ্ধে আরব হইল মরু সাহারা,
আত্মবিনাশী সে রণে নামিল পুন তাহারা।

এ মহা-রণের জন্ম প্রথম 'ওকাজ' মেলায়,
মাতিত যেখানে সকল আরব পাপের খেলায়।
সকল প্রধান গোত্র মিলিত হেথায় আসি'
একে অন্যের পাত্রে ছিটাতে কাদার রাশি।
কবির লড়াই চলিত সেখানে কুৎসা গালির,
মদের অধিক ছুটিত বন্যা কাদা ও কালির।

এই গালাগালি লইয়া বাধিল যুদ্ধ প্রথম,
দেখিতে লাগিল 'ফেজার' দুপুরে মাতম্।
নবীর গোত্র 'বনি হাশেমী'রা সে ভীম রণে
হইল লিপ্ত তাদের মিত্র-গোত্র সনে।

তরুণ নবীও চলিল সে রণে যোদ্ধৃ সাজে,
যুদ্ধে যাইতে পরানে দারুণ বেদনা বাজে।
ভায়ে ভায়ে এই হানাহানি হেরি' পরান কাঁদে,
নাহি কি গো কেহ—এদের সোনার রাখিতে বাঁধে?
সকল গোষ্ঠী-সর্দারে ডাকি' বোঝায় কত,
আপনার দেহ করিস্ তোরা যে আপনি ক্ষত!
মৃত্যু-মদের মাতাল না শোনে নবীর বাণী,
পাঁচটি বছর চলিল ভীষণ সে হানাহানি।

সদা নিরন্ন আতুর দুঃখী দরিদ্রেরে
সেবিত যে, তারে ফেলিলে গো খোদা এ কোন্ ফেরে!
যুদ্ধভূমিতে গিয়া নবী হায় যুদ্ধ ভুলি
আহত সেনারে সেবিত আদরে বক্ষে তুলি'।

দেখিতে দেখিতে তরুণ নবীর সাধনা-সেবায়
শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।
সন্ধি হইল যুযুৎসু সব গোত্র দলে,
মোহাম্মদের মানিল সালিশ মিলি' সকলে।

বসিল সালিশ 'ইবনে জুদ্‌আন' গৃহে মক্কায়,
মধ্যে মধ্য-মণি আহমদ্ শোভে সে সভায়!
'হাশেম্', 'জোহরা' গোত্রের যত সেরা সর্দার
শরিক হইল শুভক্ষণে সে সালিশী সভার।
মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজি,
সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেব্-বাজি!
আল্লার নামে শপথ করিল হাজির সবে—
সন্ধির সব শর্ত এবার কায়েম রবে।
একটি পশম ভেজাবার মতো সমুদ্র-জল
রবে যতদিন, ততদিন রবে শর্ত অটল!

ফেলি' হাতিয়ার হাতে হাত রেখে মিলি ভাই ভাই
এই সে শর্তে হল প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ সবাই :
(১) আমরা আরবে অশান্তি দূর করার লাগি'
সকল দুঃখ করিব বরণ বেদনা-ভাগী।
(২) বিদেশির মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ যা কিছু
রক্ষিব, শির তাহাদের কভু হবে না নিচু।
(৩) অকুণ্ঠ চিতে দরিদ্র আর অসহায়েরে
রক্ষিব মোরা পড়িলে তাহারা বিপদ-ফেরে।
(৪) করিব দমন অত্যাচারীর অত্যাচারে,
দুর্বল আর হবে না পীড়িত তাদের দ্বারে।
দুর্বল দেশ, দুর্বল আজ স্বদেশবাসী,
আমরা নাশিব এ-উৎপীড়ন সর্বনাশী!

দু'চারি বছর সন্ধির এই শর্ত-মত
আরবের মরু হল না কলহ-ঝটিকাহত।
রক্তের তৃষা ব্যাঘ্র ক'দিন ভুলিয়া রবে,
মাতিল আরব বারে বারে ভাই ঘোর আহবে।
ভোলেনি আরবে শুধু একজন এ-কথা কভু,
মোহাম্মদ সে সত্যাগ্রহী দীনের প্রভু!

বহুকাল পরে পেয়ে পয়গম্বরী নবুয়ত্
এই প্রতিজ্ঞা ভোলেনি সত্যব্রতী হজরত।
ভীষণ 'বদর' সংগ্রামে হয়ে যুদ্ধ-জয়ী
বজ্র-ঘোষ কণ্ঠে কহেন, 'মিথ্যাময়ী
নহে নহে মোর প্রতিজ্ঞা-বাণী, শোন রে সবে,
যুদ্ধে-বন্দী শত্রুরা আজ মুক্ত হবে!
শত্রু-পক্ষ কেহ যদি আজ হাসিয়া বলে,
প্রতিজ্ঞা করি' ভোলাও এমনি মিথ্যা ছলে!
কেহ নাহি দেয়—আমি দিব সাড়া তাহার ডাকে,
সত্যের তরে এই 'ইসলাম' কহিব তাকে!
অসহায় আর উৎপীড়িতের বন্ধু হয়ে
বাঁচাতে এসেছে 'ইসলাম' নিজে পীড়ন সয়ে!'

ন্যায়েরে বসাবে সিংহ-আসনে লক্ষ্য তাহার;
মুসলিম সেই, এই ন্যায়-নীতি খেয়াল যাহার!

এমনি[৩] করিয়া ভবিষ্যতের সহস্র-দল
মেলিতে লাগিল পাপ্‌ড়ি তাহার আলোর কমল!
অনাগত তার আলোক আভাস গগনে লেগে
উঠিতে লাগিল নতুন দিনের সূর্য জেগে!
আকাশের চার কোণা রেঙে ওঠে সেই পুলকে,
দ্যুলোকের রবি আলো দিতে আসে এই ভূলোকে।

স্তব করে আর কাঁদে ধরণীর সন্তানগণ,
ব্যথা-বিমথন এস এস ওগো অনাথ-শরণ!

চতুর্থ সর্গ

শাদি মোবারক

[গজল-গান]

মোদের নবী আল্-আরবি
সাজল নওশার নওল সাজে;

৩. পাঠান্তর 'এমনই'

সে রূপ হেরি' নীল নভেরই
কোলে রবি লুকায় লাজে॥

আরাস্তা আজ জমিন্ আসমান
হুরপরী সব গাহে গান,
পূর্ণ চাঁদের চাঁদোয়া দোলে
কা'বাতে নৌবত বাজে॥

কয় 'শাদী মোবারক বাদী'
আউলিয়া আর আম্বিয়ার,
ফেরশ্‌তা সব সওদা খুশির
বিলায় নিখিল ভুবন মাঝে॥

গ্রহ তারা গতি-হারা
চায় গগনের ঝরোকায়,
খোদার আরশ দেখ্‌ছে ঝুঁকে
বিশ্ব-বধূর হৃদয়-রাজে॥

আয় রে পাপী দুঃখী তাপী
আয় হবি কে বরাতী,
শাফায়তের শিরীন শির্‌নি
পাবি না আর পাবি না যে॥

বিপুল বিত্ত-শালিনী 'খদিজা' ছিল আরবের চিত্ত-রানী,
রূপ আর গুণে পূজিত তাহায় মুগ্ধ আরব অর্ঘ্য দানি'।
স্তুতি গাহি তার যশ মহিমার হার মেনে যেত কবির ভাষা,
শুভ ভাগ্যের সায়র-সলিলে সে ছিল সোনার কমল ভাসা।
শুদ্ধাচারিণী সতী সাধ্বী সে ছিল আজন্ম, তাই সকলে
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি-ভরা নামে ডাকিত তাহারে 'তাহেরা' বলে।
হজরতের আর খদিজার ছিল একই গোষ্ঠী বংশ-শাখা,
আরব-পূজ্য যশোমণ্ডিত ত্যাগ-সুন্দর গরিমা-মাখা।
বীর 'আবুহানা' বিবি খদিজার আছিল প্রথম জীবন-সাথী,
মৃত্যু আসিয়া হরিল তাহারে, খদিজার প্রাণে নামিল রাতি।
বিধবার বেশে রহি কতকাল বরিল খদিজা 'আতীক' বীরে,
জীবনের পারে সে-ও গেল চলি, আসিল শোকের তিমির ঘিরে।

সে শোকের স্মৃতি শিশুদেরে বুকে চাপি' ভুলে রয় বুকের ব্যথা,
দ্বি-বিংশতি গো বৎসর গেল কাটি' জীবনের কেমন কোথা।

এমন সময় এল আহমদ্ তরুণ অরুণ ভাগ্যাকাশে,
পাণ্ডুর নভ ভরিল আবার আলো—ঝলমল ফুল্ল হাসে।
পঁচিশ বছরী যুবক তখন নবী আহমদ রূপের খনি,
সারা আরবের হৃদয়-দুলাল কোরেশ কুলের নয়ন-মণি।

'সাদিক'—সত্যবাদী বলে তারা ডাকিত নবীরে ভক্তিভরে,
যুবক নবীরে 'আমিন' বলিয়া ডাকিত এখন আদর করে।
বিশ্বাস আর সাধুতায় তাঁর মক্কাবাসীরা গেল গো ভুলি'
মোহাম্মদের আর সব নাম ; কায়েম হইল 'আমিন' বুলি।

'আমিন' 'তাহেরা' সাধু ও সাধ্বী, ইঙ্গিতে ওগো খোদারই যেন
আরববাসীরা না জানিয়া এই নাম দিয়েছিল তাদের হেন !
মহান খোদারই ইঙ্গিতে যেন 'সাধু' ও 'সাধ্বী' মিলিল আসি',
শক্তি আসিয়া সিদ্ধির রূপে সাধনার হাত ধরিল হাসি'।
গিরি-ঝর্নার স্রোত-বেগে আসি যোগ দিল যেন নহর-পানি,
ঊষর মরুর ধূসর বক্ষে বান ডেকে গেল উদার বাণী !

মরুর আকাশে ঘনাল যে ছায়া, বক্ষ ছাইল যে শীতলতা,
সুজলা সুফলা ধরা যুগে যুগে হেরেছে স্বপ্নে ইহারি কথা।

খদিজা

সদাগর-জাদি বিবি খদিজার সোনার তরী
ফেরে দেশে দেশে মণি মাণিক্য বোঝাই করি'।
স্বচ্ছলতার বান ডেকে যায় বাহিরে ঘরে,
তবু কেন সব শুনো-শুনো লাগে কাহার তরে !
কি যেন অভাব রিক্ততা কোন্ চিত্ততলে
মরু-ভিখারিনী কি যেন ভিক্ষা মাগিয়া চলে !

'সাদিক' সত্যব্রতী আহমদ জানিত সবে
'আমিন' শুদ্ধাচারী সাধু যে গো হইল কবে।

'তাহেরা' শুদ্ধাচারিণী সাধ্বী আরব দেশে
সে-ই ছিল, এল প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ সাধু সে তারে
দেখিবে বলিয়া দ্বার খুলি' রয় হৃদয়-দ্বারে।
হেথা ঘর ছাড়ি' গিরি-শিরে ফেরে অরুণ যুবা,
সহসা তাহারে নাম ধরে ডাকে কে দিল্‌রুবা?
খোঁজে গিরি-গুহা মরু-প্রান্তর যে আলো-শিখা,
পাবে না কি তার দিশা, এই ছিল ললাটে লিখা?
জন্ম-ধেয়ানী বসি' একদিন ধেয়ান মধুর
অসীম আলোক-পারাবারে ফেরে স্বপ্ন টুটে,
চিত্ত-কাননে আলোর মুকুল মুদিল ফুটে।
নিশিদিন শোনে যে দিল্‌রুবার মঞ্জু-গীতি
অন্তর-তলে, আজ কি গো এল সেই অতিথি।
মেলিতে নয়ন টুটিল স্বপন! নহে সে নহে,
তাহেরা খদিজা পাঠায়েছে তার বার্তাবহে!

কুর্নিশ করি কহিল বান্দা, 'মোদের রানী
দরশ-পিয়াসী তোমার, এনেছি তাহারি বাণী।
বিবি খদিজার প্রাসাদে তোমার চরণ-ধূলি
পড়িবে কখন, সেই আশে আছে দুয়ার খুলি।
বিশাল হেজাজ আরব যাহার প্রসাদ যাচে,
যাচিতে প্রসাদ সে পাঠাল দূত তোমার কাছে!'
অন্তর-লোক-বিহারী তরুণ বুঝিতে নারে,
তবু আন্‌মনে এল দূত সাথে খদিজা-দ্বারে।

সম্ভ্রম-নতা কহিল খদিজা সালাম করি,
'হে পিতৃব্য-পুত্র! কত সে দিবস ধরি
তোমার সত্যনিষ্ঠা, তোমার মহিমা বিপুল,
তব চরিত্র কলঙ্কহীন শশী সমতুল,
তোমার শুদ্ধ আচার, চিত্ত মহানুভব—
হেরিয়া তোমারে অর্ঘ্য দিয়াছি নিত্য নব!
এই হেজাজের সকলের সাথে গোপনে আমি,
আমিন, তোমারে শ্রদ্ধা দিয়াছি দিবস-যামী!
বিপুল আমার বিত্ত বিপুল যশ গৌরব,
নিষ্প্রভ আজি করেছে তাহারে তোমার বিভব।

বিশ্বাসী কেহ নাই পাশে, তাই বিত্ত মম
হইয়াছে ভার, দংশন করে কাঁটার সম।
মম বাণিজ্য-সম্ভার, মোর বিভব যত—
তুমি লও ভার, আমিন, ইহার ! চিত্তগত
সন্দেহ মোর দূর হোক ! আমি শান্তমুখ
ভুলে রব মোর গত জীবনের সকল দুখ !
তোমার পরশ তব গুণে মম বিভব-রাজি
সোনা হয়ে যাবে, সহস্র-দলে ফুটিবে আজি !
তুমি ছাড়া এই সম্পদ্ মোর হেজাজ দেশে
রবে না দু'দিন, স্রোতে অসহায় যাইবে ভেসে !
আরবে তুমিই বিশ্বাসী একা, কাহারে আর
নাহি দিতে পারি নিশ্চিন্তে এ বিপুল ভার !'
তরুণ উদাসী বসিয়া বসিয়া ভাবে কি যেন—
'ওগো খোদা, কেন কর পরীক্ষা আমারে হেন !
আমার চিত্তে সকল বিত্ত তুমি যে প্রভু,
তুমি ছাড়া মোর কোনো সে বাসনা নাহি ত কভু !'

মরীচিকা-মাঝে ভ্রান্ত-পথ সে মৃগের মত
ভীরু চোখ দুটি তুলি কহে যুবা শ্রদ্ধা-নত,—
'পিতৃতুল্য পিতৃব্য এ মাথার পরে
রয়েছেন আজো, তাঁরে জিজ্ঞাসি তোমার ঘরে
আসিব আবার, কহিব তখন যা হয় আসি।'
লইল বিদায় ; খদিজা হাসিল মলিন হাসি।

তরুণ তাপস চলিয়া গেল গো যে পথ বাহি',
সকল ভুলিয়া খদিজা রহে গো সে পথ চাহি'।
বেলা-শেষে কেন অস্ত-আকাশ বধূর প্রায়
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে ওঠে, কোন্ মায়ায় !
'জুলেখার' মত অনুরাগ জাগে হৃদয়ে কেন,
মনে মনে ভাবে, এই সে তরুণ 'য়ুসোফ' যেন !
দেখেনি য়ুসোফে, তবু মনে হয় ইহার চেয়ে
সুন্দরতম ছিল না সে কভু ! বেহেশ্‌ত্ বেয়ে
সুন্দরতর ফেরেশ্‌তা আজ এসেছে নামি',
এল জীবনের গোধূলি-লগনে জীবন-স্বামী !
ফোটেনি যে আজো সে মুকুলী মনে শতেক আশা,
শোনে কি গো কেহ ঝরার আগের ফুলের ভাষা !

চির-যৌবনা বাসনার কভু মৃত্যু নাহি,
মনের রাজ্যে অক্ষয় তার শাহানশাহী।

উদয়-বেলায় মন ছিল তার জলদে ঢাকা,
হেরেনি প্রেমের রবির কিরণ সোনায় মাখা।
আসিল জীবন-মধ্যাহ্নে যে—সে নহে রবি,
দিন চলি' গেছে—হেরিল না দিনমণির ছবি।
বেলা বয়ে যায়—সেই অবেলায় মেঘ-আবরণ
বিদারিয়া এল সোনার রবি কি ভুবন-মোহন!

আছে আছে বেলা, বেলা-শেষের সে অনেক দেরি,
পুরবীতে নয়—শ্রীরাগে এখনো বাজিছে ভেরী!
ওরে আছে বেলা, ভাঙেনি ক' মেলা, ইহারি মাঝে
প্রাণের সওদা করে নে, বরে নে হৃদয়-রাজে!
ফেরেনি রে নীড়ে এখনো বিদায়-বেলার পাখি,
নাহি ক' কাজল, আজো আছে জল-ভরা এ আঁখি।
শুকায়েছে ফুল, শুকায়েছে মালা,—নয়ন-জলে
রাজাধিরাজের হবে অভিষেক হৃদয়-তলে।
হোক হোক অপরাহ্ণ এ বেলা, হৃদ-গগনে
এই ত প্রথম উদিল, সূর্য শুভ-লগনে।
হোক অবেলায়—তবু এ প্রেমের প্রথম প্রভাত,
পহিল্ প্রেমের উদয়-ঊষার রাঙা সওগাত।
নূতন বসনে নূতন ভূষণে সাজিয়া তারে,
নব-আনন্দে বরিয়া লইবে হৃদয়-দ্বারে।

আবু তালিবের কাছে আসি' কহে তরুণ নবী
তাহেরা খদিজা কয়েছিল যাহা যাহা—সে সবি।
বৃদ্ধ তালিব শুনিয়া পরম ভাগ্য মানি'
খোদারে স্মরিয়া ভেজিল শোকর্ জুড়িয়া পাণি।
সুবৃহৎ ছিল পরিবার তাঁর পোষ্য বহু;
চিন্তায় তারি পানি হয়ে যেত দেহের লোহু।
দুর্ভিক্ষের হাহাকার ওঠে আরব জুড়ি',
যাহা কিছু ছিল সঞ্চিত যার গেল গো উড়ি'।
হেন দুর্দিনে আসিল যেন গো গায়েবি ধ্বনি,
না চাহিতে এল শুভ ভাগ্যের আমন্ত্রণী।

সৌভাগ্যের এ দাওত কেহ ফিরায় কি গো,
আপনি আসিয়া ধরা দিল আজ সোনার মৃগ।

আন্‌মনে চলে তরুণ 'আমিন' সেই সে পথে,
যে-পথে দৃষ্টি পাতিয়া খদিজা কখন হতে
বসি' আছে একা ; জাফ্‌রির ফাঁকে নয়ন-পাখি
উড়ে যেতে চায়,—কারে যেন হায় আনিবে ডাকি !
ধন্য সে আজ হেজাজের মাঝে ভাগ্যবতী—
ঐ আসে ঐ তরুণ অরুণ মৃদুল-গতি !
'মোতাকারিব' আর 'হজজ্‌' 'রমল্‌' ছন্দ যত
লুটাইয়া পড়ে যেন গো তাহার চরণাহত।

বাতায়নে বসি' খদিজার বুকে বেদনা বাজে,
না জানি কত না কণ্টক আছে ও-পথ মাঝে !
কঙ্করময় অকরুণ পথে চলিতে পায়ে
কত যেন লাগে, সে বাঁচে হৃদয় দিলে বিছায়ে !
আসিল তরুণ, কহিল সকল স্বপন সম,
দৃষ্টি নাহি ক কোথা ফোটে ফুল গোপনতম
কোন্‌ সে কাননে আলোকে তাহারি ! আপনমনে
খোঁজে সে কাহারে আকুল আঁধারে অজানা জনে।

খদিজা তাহার বাণিজ্য-ভার 'আমিনে' দিয়া
কহিল, 'সকলি দিলাম তোমারে সমর্পিয়া।'
নীরবে লইল সে ভার 'আমিন' স্বপ্নচারী,—
পুলকে খদিজা রুধিতে পারে না নয়ন-বারি।

* * *

লীলা-রসিক সে খোদার খেলা গো বুঝিতে পারে না এ চরাচর,
হবিব খোদার সাজিল আবার তাঁরি ইঙ্গিতে সওদাগর !
'কাফেলা' লইয়া চলে আবার
'শাম' 'এয়মন্‌' মরুভূমি-পার,
'হোবাশা' 'জোরশ' কত পরদেশে ঘুরিল তরুণ বণিকবর,
সব পুণ্যের ভাণ্ডারী ফেরে পণ্য লইয়া দর্‌ বদর্‌ !

রোজ কিয়ামতে পাপ-সিন্ধুর নাইয়া হবে যে নবী রসুল,
হ'ল বাণিজ্য-কাণ্ডারি সে গো, লীলা-বাতুলের মধুর ভুল !

বিদেশ ঘুরিয়া ফেরে স্বদেশ,
পুনঃ যায় দূর দেশের শেষ,
সোনার ছোঁওয়ায় পণ্য-তরুর শাখে শাখে ফোটে মণির ফুল।
উপকূলে খোঁজে রতন—যাহারে খুঁজিছে রত্নাকর অকূল।

অনুরাগ-রাঙা খদিজার হিয়া ধৈরয যেন মানে না আর,
ভার হয়ে ওঠে তরুণ বণিক বয়ে আনে যত রতন-ভার।
প্রতিভা জ্ঞানের নাহি সীমা—
একি চরিত্র-মাধুরিমা,
এ কি এ উদয়-অরুণিমা আজি ঝলকি ওঠে গো দিগ্‌বিথার !
পল্লবে ফুলে উঠিল গো দু'লে শুষ্ক মাধবী-লতা আবার !

কি হবে এ ছার মণিসম্ভার বিপুল করিয়া নিরবধি,
পরানের তৃষ্ণা অমৃতের ক্ষুধা মিটিল না এ জীবনে যদি।
উদাসীন যুবা ফিরে না চায়,
কোন্ বিরহিণী খোঁজে গো তায়,
সিন্ধুর তাতে কি বা আসে যায় যদি তারে নাহি চায় নদী,
আপনাতে সে যে পূর্ণ আপনি—বিরাট বিপুল মহোদধি।

মনের দেশের ও যেন নহে গো, বনের দেশের চির-তাপস,
মন নিয়ে খেলা ও যেন বোঝে না, ও চাহে না সম্মান ও যশ।
নয়নে তাহার অতল ধ্যান,
রহস্য-মাখা বিধু বয়ান,
ধরার অতীত ও যেন গো কেহ, ধরা নারে ওরে করিতে বশ।
ও যেন আলোর মুক্তির দূত, সৃজন-দিনের আদি-হরষ।

যত মনে হয় ধরার নহে ও, মায়াপুরীর ও রূপকুমার,
তত খদিজার মন কেন ধায় উহারি পানে গো দুর্নিবার।
যে কেহ হোক সে, নাহি ক' ভয়,
খজিদা তাহারে করিবে জয়,
নহে তপস্যা একা পুরুষের—নব-তপস্যা প্রেমের তার।
হয় তারে জয় করিবে, নতুবা লভিবে অমৃত মরণ-পার।

ছিল খদিজার আত্মার আত্মীয় সহচরী 'নাফিস্না' নাম,
কহিল তাহারে অন্তর-ব্যথা, হরেছে কে তার সুখ আরাম।

অনুরাগ-ভরে বেপথু মন
হু হু করে কেন সকল খন,
'সখি লো, জহর পিইয়া মরিব, না পুরিলে মোর মনস্কাম।
সে বিনে আমার এই দুনিয়ার সব আনন্দ সুখ হারাম।

'কে রেখেছে সখি শহদ্-শিরীন হেন মধুনাম—মোহাম্মদ !
হেজাজের নয়—ও শুধু আমার চির-জনমের প্রেমাস্পদ !
সব ব্যবধান যায় ঘুচে
বয়সের লেখা যায় মুছে,
যত দেখি তত মনে হয় সখি, আমি উপনদী সে যেন নদ,
বন্দী করিতে তাহারে, নিয়ে যা শাদী-মোবারক-বাদী-সনদ।'

দূতী হয়ে চলে নাফিসা একেলা প্রবোধ দানিয়া খদিজারে,
বলে, হেজাজের রানী যারে চায় বুলন্দ্-নসিব বলি তারে।
প্রসাদ যাহার যাচে আরব,
করে গুণগান—রচে স্তব,
যাচিয়া সে যারে চাহে বরি' নিতে, হানিতে সে হেলা কভু পারে?
বিরাট সাগর পায় কি ঝর্না? মহানদী মেশে পারাবারে !

যৌবন? সে ত ক্ষণিক স্বপন, ছুঁইতে স্বপন টুটিয়া যায়,
প্রেম সেথা চির মেঘ-আবৃত, তনু সেথা ভোলে তনু-মায়ায়।
নাহি শতদল শুধু মৃণাল—
কামনা-সায়র টাল-মাটাল,
সেথা উদ্দাম মত্ত বাসনা ফুলবনে ফেরে করীর প্রায়,
সুন্দর চাহে ফুলের সুরভি, অরসিকে শুধু সুষমা চায়।

যুবা আহমদ্ মগ্ন ধেয়ানে, নাফিসা আসিয়া ভাঙিল ধ্যান,
কহিল, 'আমিন ! আজিও কুমার-জীবন যাপিছ হয়ে পাষাণ,
কোন্ দুখে বল, তাপস-প্রায়
কোন কিছু যেন চায় না, হায় !
হেজাজ-গগনে তুমি যে হেলাল, তুমি কেন থাক চিন্তাম্লান?'

রুচির শুভ্র হাসি হেসে বলে তরুণ ধেয়ানী মহিমময়,
'বিবাহের মোর সম্বল নাই, বিবাহ আমার লক্ষ্য নয় !'
কহিল নাফিসা, 'হে সুন্দর !
যাচে যদি কেহ তোমারে বর,

গুণে গৌরবে তুলনা যাহার নাই, গাহে যার হেজাজ জয়,
সেই মহীয়সী নারী যদি যাচে, তুমি হবে তার? দাও অভয়!'

ধ্যানের মানস-নেত্রে হেরিল তরুণ ধেয়ানী ভবিষ্যৎ—
কল্যাণী এক নারী দীপ জ্বালি গহন তিমিরে দেখায় পথ।
চারি ধারে অরি—বন্ধুহীন
যুঝিছে একাকী যেন আমীন,
সে নারী আসিয়া বর্ম হইয়া দাঁড়াল সুমুখে, ধরিল রথ!
সাধনা-ঊর্ধ্বে সে এল সহসা শক্তিরূপিণী—সিদ্ধিবৎ!

এমনি চোখের চেনাচেনি নিতি, মানস-চক্ষে দেখেনি তায়,
দেখেনি তাহার অন্তরে কবে ফুটেছে প্রেম শত বিভায়।
প্রেম-লোকে সে যে জ্যোতিমতী
চির-যৌবনা চির-সতী!
তবু নাফিসারে কহিল আমিন, 'কোন ললনা সে, বাস কোথায়?'
নাফিসা হাসিয়া কহিল, 'খদিজা, হেজাজ লুটায় যাহার পায়!'

হজরত ক'ন, 'বামন হইয়া কেমনে বাড়াব চন্দ্রে হাত!'
নাফিসা কহিল, 'অসম্ভব যা, সে আসে এমনি অকস্মাৎ।'
খদিজা শুনিল খোশ্ খবর,
পরানে খুশির বহে নহর।
আবুতালিবের কাছে এল নিয়ে খদিজার দূত সে সওগাত!
চাঁদ যেন হাতে পাইল শুনিয়া আখেরে-নবীর খুল্লতাত।
তালিবের মনে খুশির বন্যা টইটম্বুর সর্বদাই,
আরবের রানী তাহিরা খদিজা বধূমাতা হবে, আর কি চাই!
'আমার ইব্‌নে আসাদ' বীর
খদিজার পিতৃব্য ধীর
শুভ বিবাহের পয়গাম তারে পাঠাল—দেশের রেওয়াজ তাই।
দিন ও তারিখ হল সব ঠিক, গলাগলি করে দুই বেয়াই।

খদিজার ঘরে জ্বলিল দীপালি, নহবতে বাজে সুর মধুর,
খদিজারে মন সদা উচাটন বেপথু সলাজ প্রেম-বিধুর!
প্রণয়-সূর্য হল প্রকাশ,
ঝলমল করে হৃদি-আকাশ,
তরুণ ধ্যানীর ঘুম ভেঙে যায়, ব্যথা-টনটন চিত্তপুর,
মরু-উদ্যান এল কোথা হতে বন্ধুর পথে যেতে সুদূর!

তরুণ নবীর রবির আলোক চুরি করে এল এ কোন্ চাঁদ,
স্বর্গের দূত ধরিতে কি সে গো পেতেছে ধরায় নয়ন-ফাঁদ !
মানবীর প্রেম এই যদি
টলমল করে মন-নদী,
না জানি কেমন প্রেম তার করে সৃজন যে-জন নিরবধি !
নদী হেরি মন এমন, না জানি কি হয় হেরিলে সে জলধি !

সম্প্রদান

বাজিল বেহেশ্‌তে বীণ আসিল সে শুভদিন
মুক্তি-নাট-নটবর সাজে বর-বেশে,
সুন্দর সুন্দরতম হল আজ ধরা 'পর
সন্ধ্যারানী বধূবেশে নামিল গো হেসে।
হায় কে দেখেছে কবে দুই চাঁদ এক নভে,
সেহেলি সখিরা সবে মূক বাণী-হারা
কাহারে ছাড়িয়া কারে দেখিবে, বুঝিতে নারে,
স্তব্ধ অচপল-গতি তাই আঁখিহারা।

শাদীর মহফিল মাঝে বসিয়া নওশার সাজে
নবীবর, আত্মীয় কুটুম্ব ঘিরি' তারে,
চারিদিকে তারা-দল, মাঝে চাঁদ ঝলমল,
হুরপরী লুকায় তা হেরি' দিকপারে।
তালিব উঠিয়া কহে 'লগ্ন যায়, আর নহে,
বন্ধুগণ শুভকার্য হোক সমাপন।'
আনন্দের সে সভায় সকলে দানিল সায়
মজ্‌লিসে বসিল আসি' কন্যাপক্ষগণ।

হেজাজি আচার-মত রেস্‌ম্ রেওয়াজ যত
হলে শেষ—খজিদার পিতৃব্য আসাদ্
আহ্‌মদের কর ধরি' দিল সমর্পণ করি'
কন্যারে—সভায় ওঠে মোবারক-বাদ।

কহিল আসাদ বীর করে মুছি' অশ্রু-নীর,
'হে সাদিক, হে আমিন, হেজাজের মণি !
পিতৃহীনা খদিজায় দিলাম তোমায় পায়,
তোমারে জামাতা পেয়ে ভাগ্য বলে গণি।
হে নয়ন-অভিরাম ! সার্থক তোমার নাম
রয় যেন চিরদিন পবিত্র হেজাজে,
চির-প্রেমাস্পদ হয়ে এ বধূ-রতনে লয়ে
আদর্শ দম্পতি হও আরবের মাঝে।'
'তাই হোক, তাই হোক' কহিল সভার লোক ;
বর-বেশ-নবী সবে করিল সালাম।
নহবতে বাঁশি বাজে, হোথায় অন্দর মাঝে
নৃত্যগীত-স্রোত বয়ে চলে অবিরাম।
হুরী পরী নাচে গায় বেহেশ্‌তের জলসায়
আরশ্‌ আরাস্তা হল !—খোদার হবিব
হবিবায় পেল আজি, ভেরী তূরী ওঠে বাজি,
খুশির খবর বিশ্বে শোনায় নকিব।

বয়সের বন্ধনে কে বাঁধিবে যৌবনে,
যুসোফ বুঝিয়াছিল দেখে জুলেখায়,
চল্লিশ বছর তার বয়স হইল পার
তবু তারে দেখে জোহ্‌রা আকাশে পলায়।
সে কাহিনী নব-রূপে রূপ ধরি এল চুপে,
গোধূলি-বেলায় রূপ দেখিবি কে আয় !
উদয়-উষাও আজ পলায় পাইয়া লাজ,
উঠিয়া ঈদের চাঁদ আবার লুকায়।

চল্লিশ বসন্ত দিন আছে এ মালায় লীন।
শুকায়নি আজো বঁধু পরেনি ক বলে,
প্রেমের শিশির-জলে ভিজায়ে অন্তর-তলে
রেখেছিল জিয়াইয়ে—দিল আজি গলে।
উদয়-গোধূলি সাথে বিদায়-গোধূলি মাতে
হাতে হাত জড়াইয়া দাঁড়াইল নভে,
রবি শশী মনোদুখে ধরা দিল রাহু-মুখে,
এত রূপ অপরূপ কে দেখেছে কবে।

নও কাবা

হিয়ায় মিলিল হিয়া,
নদী-স্রোত হল খরতর আরো পেয়ে উপনদী-প্রিয়া।
স্রোতাবেগ আর রুধিতে পারে না, ছুটে অসীমের পানে,
ভরে দুই কূল অসীম-পিয়াসী কুলু কুলু কুলু গানে।
কোথা সে সাগর কত দূর পথ, কোন দিকে হবে যেতে,
জানে না কিছুই, তবু ছুটে যায় অজানার দিশা পেতে।
কত মরু-পথ গিরি পর্বত মাঝে কত দরী বন,
বাধা-নিষেধের সব ব্যবধান লঙ্ঘিয়া অনুখন
তবু ছুটে চলে, শুনিয়াছে সে যে দূর সিন্ধুর ডাক,
রক্তে তাহারই প্রতিধ্বনি সে আজও শোনে নির্বাক।
সকল ভাবনা হয়ে গেছে দূর, অনন্ত অবকাশ
ধ্যানের অমৃতে উঠিছে ভরিয়া। দিবস বরষ মাস
কোথা দিয়া যায়, উদ্দেশ নাই। শুধু অন্তর-পুর
শুনিতেছে দূর আহ্বান-বাণী অনাগত বন্ধুর।

পথে যেতে যেতে চমকিয়া চায়, কে যেন পথের পাশে
ডাক-নাম ধরে ডেকে গেল তারে, হাতছানি দিয়া হাসে।
তারি সন্ধানে ঊষর মরুর ধূসর বুকে সে ফেরে,
সে বুঝি লুকায়ে গিরি-গহ্বরে ঐ দূর একটেরে!
কোথাও না পেয়ে তরুণ ধেয়ানী হারায় ধেয়ান-লোকে,
একি এ বেদনা-আর্ত মূরতি ফোটে গো সহসা চোখে।
যে দোস্ত লাগি' ফেরে সে বিবাগি, খোঁজে সে যে সুন্দরে,
সে কোথাও নাই, বিরাট বেদনা দাঁড়ায়ে বিশ্ব 'পরে।
অনন্ত দুখ শোক তাপ ব্যথা, অসীম অশ্রুজল—
অকূল সে জলে একাকী সে দোলে বেদনা-নীলোৎপল।
বিপুল দুখের অক্ষয় বট দাঁড়ায়ে বিশ্ব ছেয়ে,
বেদনা ব্যথার কোটি কোটি ঝুরি নেমেছে অঙ্গ বেয়ে।
শুধু ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধু একটানা অবিরাম
রণিয়া উঠিছে ব্যাপিয়া বিশ্ব, নিখিল বেদনা-ধাম।

পড়ে যায় মাঝে কালো যবনিকা, সহসা আঁখির আগে
অসুন্দরের কুৎসিত লীলা ব্যভিচার শত জাগে।

উদ্যত-ফণা কুটিল হিংসা দ্বেষ হানাহানি শত
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষে দংশি' মারিতেছে অবিরত।
পাপে অসূয়ায় পঙ্কিল পাঁকে ডুবে আছে চরাচর,
দিশারী তাদের শয়তান, তার অনুচর নারী নর!
দেখিতে পারে না এ-দৃশ্য আর, নিমিষে টুটে সে ধ্যান,
দুঃখ-পাপের লোকালয় পানে ছুটে আসে ব্যথা-ম্লান।

হেরে প্রান্তরে কুটিরের দ্বারে কাঁদে অনাথিনী একা,
কাল তার স্বামী গিয়াছে চলিয়া, জীবনে হবে না দেখা।
অদূরে পুত্র-শোকাতুরা মাতা পুত্রের নাম ধরি'
ডাকে আর কাঁদে—বঞ্চিত স্নেহ আঁখিজল পড়ে ঝরি'।
পথে যেতে যেতে খঞ্জ অন্ধ ভিখারিরা অসহায়
ক্ষুধার তাড়নে পড়ে মুমূর্ষু, ভরে মন করুণায়।
পিতৃমাতৃহীন শিশুদল চায় পথিকের পানে,
তাহারা তাদের পিতা ও মাতার সন্ধান বুঝি জানে।

তরুন তাপস চলিতে পারে না, বেদনার উচ্ছ্বাস
ফুলে ফুলে ওঠে অন্তর-কূলে, বন্ধ হয় বা শ্বাস!
ঊর্ধ্বে আলোর অনন্ত-লীলা, নিম্নে ধরণী পরে
এমন করিয়া দুঃখ-গ্লানির কেন গো বরষা ঝরে।
ক্লান্ত চরণে চলিতে চলিতে হেরে পথে ধনী যুবা
নগ্ন মাতাল টলে আর চলে, পাশে তার দিলরুবা।
দিলরুবা নয়—প্রতিবেশিনী ও কুমারী চেনা সে মেয়ে,
অর্থের বিনিময়ে ও মাতাল এনেছে তাহারে চেয়ে!

সহসা হেরিল—বর্বর এক পিতা তার ক্রোড়ে লয়ে
চলিছে সদ্যোজাত কন্যারে বধিতে সমাজ-ভয়ে!
কন্যা হওয়া যে 'লাত মানাতের' অভিশাপ, তাই তারে
বধিতে চলেছে—অভাগী জননী কাঁদিছে পথের ধারে।
হেরিল অদূরে ভীম হানাহানি পশুতে পশুতে রণ
নারী লয়ে এক—বিজয়ীরে বীর বলিছে সর্বজন!
চলিতে চলিতে হেরে দূরে এক বাজার বসেছে ভারী,
ছাগ উট সাথে বিক্রয় লাগি' বসে অপরূপ নারী।
মালিক তাহার হাঁকিতেছে দাম, বলির পশুর সম
শত বন্ধন জর্জর নারী কাঁপে মূক অক্ষম।

তাহারি পার্শ্বে পশু ধনী এক তাহার গোলামে ধরি'
হানিছে চাবুক—কুক্কুরে বুঝি মারে না তেমন করি' !
সহসা শুনিল অনাহত বাণী ঊর্ধ্বে গগন-পারে—
'হে ত্রাণ-কর্তা, জাগো জাগো, দূর কর এই বেদনারে !'
চমকিয়া ওঠে নবীর চিত্ত, শিহরণ জাগে প্রাণে,
মনে লাগে যেন ইহাদের সে-ই মুক্তির দিশা জানে।

স্বপ্ন-আতুর যুবক ধেয়ানী আনমনে পথ চলে,
চলিতে চলিতে কখন সন্ধ্যা ঘনায় আকাশ-তলে।
ধরার ঊর্ধ্বে অসীম গগন, কোটি কোটি গ্রহ-তারা
সে গগন ভরি' ঢালে আনন্দে নিশিদিন জ্যোতিধারা।
তাহাদের মাঝে নাহি ত বিরোধ, প্রেমের আকর্ষণে
ভালোবেসে নিজ নিজ পথে চলে, মাতে না প্রলয়-রণে।
এই আলো এই আননদ এই সহজ সরল পথ
এই প্রেম, এই কল্যাণ ত্যজি'—রচে এরা পর্বত
শত ব্যবধান-নদী প্রান্তর ঘরে ঘরে মনে মনে,
অকল্যাণের ভূত শয়তান পূজা করে জনে জনে !
তপঃপ্রভাবে সাধনার জোরে অসুন্দর এ ধরা
করিতে হইবে সুন্দরতম, রবে না এ শোক জরা।
রবে না হেথায় পাপের এ ক্লেদ, এ গ্লানি মুছিতে হবে,
পতিতা পৃথ্বী পাবে ঠাঁই পুন আলোর মহোৎসবে।
আঁধার ইহার কক্ষে আবার জ্বলিবে শুভ্র আলো,
হে মানব, জাগো ! মেঘময় পথে বজ্র-মশাল জ্বালো।

আছে পথ, আছে দুঃখের শেষ, আমি শুনেছি সে বাণী,
বিশ্ব-সুষমা-সভায় এ-ধরা হাসিবে অতীত-গ্লানি।
দেখেছি বেদনা-সুন্দরে আমি তোমাদের ম্লান মুখে,
ঘুচিবে বিষাদ—আসিবে শান্তি প্রেম-প্রশান্ত বুকে।
হেথায় খদিজা একা—
কাঁদে বিরহিণী, উদাসীন তার স্বামীর নাহিক দেখা !
পলাতকা ওরে বাঁধিবে কেমনে, কোথায় তেমন ফাঁসি,
কার কথা ভাবি' চমকিয়া ওঠে হেরে ভালোবাসাবাসি।
বক্ষে তাহারে পুরিয়া রাখিলে নিশাসে উড়িয়া যায়,
নয়নে রাখিলে আঁখি-বারি হয়ে গলে পড়ে সে যে, হায় !

বাহুতে বাঁধিলে ঘুম-ঘোরে সে যে ছিঁড়ে বন্ধন-ডোর,
বক্ষের মণি-হার করে রাখে, চুরি করে নেয় চোর!

কেন এ বিবাগী, কার অনুরাগী সকল সুখেরে দ'লে
রৌদ্র-তপ্ত কঙ্করভরা মরুপথে যায় চলে।
আপনার মনে সে কাহার সনে নিশিদিন কথা কয়,
বসিলে ধেয়ানে চাহিতে পারে না, রবি সে জ্যোতির্ময়!
আদর করিয়া পাগল বলিলে শিশুর মত সে হাসে,
একি রহস্য, এত অবহেলা, তবু যেন ভালোবাসে।

একদা ইহারি মাঝে
প্রেমিকে তাঁহার লাগালেন খোদা তাঁর প্রিয়তম কাজে।

আদি উপাসনা-মন্দির কা'বা—যাহারে ইব্‌রাহিম
নির্মিল কোন্ প্রভাতে পুজিতে খোদারে মহামহিম,—
সেই কাবা ঘরে ছিল না প্রাচীর, ভেঙেছিল তারে কাল,
চারিদিক ঘিরি' জমেছিল তার মূর্তি ও জঞ্জাল।
বর্ষার জল ঢুকি' সেই ঘরে করিত পঙ্কময়,
পবিত্র কাবা রক্ষিতে যত কোরেশ সহৃদয়
চারিদিকে তার রচিল প্রাচীর, তাও কিছুকাল পরে
বর্ষার স্রোতে ভেসে গেল। ওঠে আল্লার ঘর ভ'রে
ধূলি-জঞ্জালে। মিলিয়া তখন ভক্ত কোরেশ সবে
ভাবিতে লাগিল কি উপায়ে এর রক্ষা-সাধন হবে।
পূজা-মন্দিরে রবে না'ক ছাদ, এই বিশ্বাসে তারা
ছাদহীন করে রেখেছিল কাবা ঝরিবে আশিস্-ধারা
ঊর্ধ্ব হইতে। ভূত প্রেত যত দেবতারা নামি রাতে
লইবে সে পূজা, ফিরে যাবে যদি বাধা পায় তারা ছাতে।

লঙ্ঘি কাবার ভগ্নপ্রাচীর এরি মাঝে এক চোর
মূর্তি-পূজারী ভক্তের মনে হানিল ব্যথা কঠোর।
মূর্তির গায়ে ছিল অমূল্য যা কিছু অলঙ্কার
মণি মাণিক্য,—হরিল সকল। অভাবিত অনাচার!
কাবার সুমুখে ছিল এক কূপ, ভক্ত পূজারী দল
পূজা-সামগ্রী দেব-উদ্দেশে সেই কূপে অবিরল
ফেলিতে লাগিল, সেই সব বলি, ফুল পাতা ক্রমে পচে
কাবা-মন্দিরে বিকট-গন্ধ নরক তুলিয়া রচে।

হেরিল একদা ভক্ত সে এক—সে কূপ-গাত্র বেয়ে
উঠিয়া আসিছে অজগর এক সর্পিল বেগে ধেয়ে।
ক্রমে নাগরাজ কূপ-গুহা ছাড়ি' কাবায় পাতিল হানা,
ভক্ত পূজারী ভয়ে সেথা হতে উঠাইল আস্তানা।
পূজা দিতে আর কেহ নাহি আসে, ভীষণ সর্প-ভীতি;
কত শত করে মানত তাহারা ভূত উদ্দেশে নিতি।
একদিন এক ঈগল পক্ষী সহসা সে অজগরে
ছোঁ মারিয়া লয়ে গেল তারে দূর পর্বত কন্দরে!
আবার চলিল নব-উদ্যমে মূর্তি-পূজার ঘটা,
ভক্তদলের মনে এল এই বিশ্বাস আলো-ছটা।
কাবা-মন্দির সংস্কারের মানত করেছে বলে
অজগরে লয়ে গেলেন ঠাকুর ঈগল পাখির ছলে।

সকল গোত্র-সর্দার আসি' মিলিল সে এক ঠাঁই,
যা দিয়া গড়িবে কায়েম করিয়া কাবারে, হেজাজে নাই
তেমন কিছুই। শুনিল তাহারা একদিন লোকমুখে—
গ্রিক-বাণিজ্য-পোত এক গেছে ভাঙিয়া 'জেদ্দা'-বুকে;
ঝটিকা-তাড়িত ভগ্ন সে তরী আছে, বিক্রয় লাগি।
সর্দার সব এ খবর পেয়ে উঠিল আবার জাগি'।
আনিল অলিদ ভগ্ন পোতের তক্তা সকল কিনে,
কাবা মন্দির গড়িয়া তুলিল সবে মিলে কিছু দিনে।

নির্মিত যবে হল মন্দির সকলের সাধনায়,
একতা তাদের টুটাইয়া দিল কোন্ এক অজানায়।
আছিল 'হাজর্ আস্ওয়াদ্' নামে প্রস্তর কা'বার দ্বারে,
কা'বার বোধন-দিনে হজরত ইব্রাহিম সে তারে
রাখিয়াছিলেন চিহ্ন-স্বরূপ সেকালের প্রথামত,
সেই হতে সেই প্রস্তর সবে চুমিত শ্রদ্ধা-নত।
কেহ কেহ বলে, আদিম মানব 'আদম' স্বর্গ হতে
আনিয়াছিলেন ঐ প্রস্তর ধূলির ধরণী-পথে।
সেই পবিত্র প্রস্তর ধূলির ধরণী-পথে।
সেই পবিত্র প্রস্তর তুলি যে-গোত্র কাবা-দ্বারে
রক্ষিবে—সারা হেজাজ শ্রেষ্ঠ গোত্র বলিবে তারে।
এই ধারণায় সকল গোত্রে বাধিল কলহ ঘোর,
প্রতি গোষ্ঠী সে বলে, 'ও-পাথরে একা অধিকার মোর।

সে কলহ ক্রমে হইতে লাগিল ভীম হতে ভীমতর ;
আবার ভীষণ যুদ্ধ সূচনা, কাঁপে দেশ থরথর।
রক্ত-পূর্ণ পাত্রে হস্ত ডুবাইয়া তা'রা সবে
করিল মরণ-প্রতিজ্ঞা তারা—মাতিবে ভীম আহবে।
দামামা নাকাড়া ডিমি ডিমি বাজে, হাঁকিল নকিব তূরী,
পক্ষ মেলিয়া 'মালিকুল মউত্' আঁটিল কটিতে ছুরি।

ছিল হেজাজের প্রবীণতম সে জইফ্ 'আবু উমাইয়া',
যুযুৎসু সব গোত্রে অনেক কহিলেন সমঝাইয়া—
'যে শুভ-ব্রতের করিলে সাধনা, অশুভ কলহ-রণে
নাশিও না তারে সিদ্ধিলাভের মহান শুভক্ষণে।
শুভ্রশ্মশ্রু এই বৃদ্ধের শোনো উপদেশ বাণী,
সংবর এই আত্মবিনাশী হীন রণ হানাহানি।
কা'বা মন্দিরে সর্বপ্রথম প্রবেশিবে আজ যেই
এই কলহের শুভ মীমাংসা করুক একাকী সেই !'

শ্রদ্ধাস্পদ বৃদ্ধের এই কল্যাণ-বাণী শুনি'
বিরত হইল কলহে তাহারা, বলে, 'মারহাবা গুণী !'
অপলক চোখে নিরুদ্ধ শ্বাসে চাহিয়া রহিল সবে,
না জানি সে কোন্ অজানিত জন পশিবে কাবায় কবে—

সহসা আসিল তরুণ মোহাম্মদ কা'বা-মন্দিরে
সর্বপ্রথম পশে উপাসনা লাগি' আনমনে ধীরে।
সকল গোষ্ঠী সর্দার ওঠে আনন্দে চিৎকারি'—
'সম্মত এরে মানিতে সালিশ—আমিন এ ব্রত-চারী !'

হেজাজ-দুলাল সত্য-ব্রতী বিশ্বাসী আহমদ
ছিল সকলের নয়নের মণি গৌরব-সম্পদ।
শুনিয়া সকল, কহিল তরুণ সাধক, 'আমার বিধি
মান যদি সব বীর সর্দার—স্ব-গোত্র প্রতিনিধি
করহ নির্বাচন, তারপরে সব প্রতিনিধি মিলে
পবিত্র এই প্রস্তর নিয়ে চল কা'বা-মঞ্জিলে।
আমার উত্তরীয় দিয়া এরে বাঁধিয়া তাহার পর
এক সাথে এরে রাখিব কা'বায়।' কহে সবে 'সুন্দর !

সুন্দর এই মীমাংসা তব, আমিন, হেজাজে ধন্য !
তুমি রাখ এই পাথর একাই, ছুঁইবে না কেহ অন্য !'
রাখিলেন হযরত পবিত্র প্রস্তর কা'বা-ঘরে,
থামিল ভীষণ অনাগত রণ খোদার আশিস্-বরে।

ধন্য ধন্য পড়ে গেল রব হেজাজের সবখানে,
এসেছে সাদিক আমিন মোহাম্মদ আরবস্তানে।

জব্বুর তওরাত ইঞ্জিল যাহার আসার বাণী
ঘোষিল যুগ-যুগান্ত পূর্বে, বেহেশ্‌ত্ হইতে টানি'
আনিল পীড়িতা মূক ধরণীর তপস্যা আজি তারে,
ব্যথিত হৃদয়ে ফেলিয়া চরণ, অবতার এল দ্বারে।
সকল কালের সকল গ্রন্থ, কেতাব, যোগী ও ধ্যানী,
মুনি, ঋষি, আউলিয়া, আম্বিয়া, দরবেশ মহাজ্ঞানী
প্রচারিল যার আসার খবর—আজি মন্থন-শেষ
বেদনা-সিন্ধু ভেদিয়া আসিল সেই নবী অমৃতেশ !
হেরিল প্রাচীনা ধরণী আবার উদয় অভ্যুদয়
সব-শেষ ত্রাণকর্তা আসিল, ভয় নাই, গাহ জয় !
যে সিদ্দিক ও আমিনে খুঁজেছে বাইবেল আর ঈসা,
তওরাত্ দিল বারে বারে যেই মোহাম্মদের দিশা,
পাপিয়া-কণ্ঠ দাউদ গাহিল যার অনাগত গীতি,
যে 'মহামর্দে' অথর্ব-বেদ-গান খুঁজিয়াছে নিতি,
সে অতিথি এল, কতকাল ওরে—আজি কতকাল পরে
ধেয়ানের মণি নয়নে আসিল ! বিশ্ব উঠিল ভরে ;—
আলোকে, পুলকে, ফুলে ফলে, রূপে রসে, বর্ণ ও গন্ধে,
গ্রহতারা লোক পতিতা ধরায় আজি পূজা করে, বন্দে !

সাম্যবাদী

আদি উপাসনালয়—
উঠিল আবার নূতন করিয়া—ভূত প্রেত সমুদয়
তিন শত ষাট বিগ্রহ আর মূর্তি নূতন করি'
বসিল সোনার বেদীতে রে হায় আল্লার ঘর ভরি।

সহিতে না পারি এ দৃশ্য, এই স্রষ্টার অপমান,
ধেয়ানে মুক্তি-পথ খোঁজে নবী, কাঁদিয়া ওঠে পরান।
খদিজারে কন—'আল্লাতালার কসম, কা'বার ঐ
'লোৎ' 'ওজ্জা'র করিব না পূজা, জানি না আল্লা বই।
নিজ হাতে যারে করিল সৃষ্টি খড় আর মাটি দিয়া
কোন্ নির্বোধ পূজিবে তাহারে হায় স্রষ্টা বলিয়া!'

সাধ্বী প্রতিব্রতা খদিজাও কহেন স্বামীর সনে—
'দূর কর এ লাত্ মানাতেরে, পূজে যাহা সব-জনে।
তব শুভ-বরে একেশ্বর সে জ্যোতির্ময়ের দিশা
পাইয়াছি প্রভু, কাটিয়া গিয়াছে আমার আঁধার নিশা।'

ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল : মোহাম্মদ আমিন
করে না কো পূজা কাবার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।

কাব্য আমপারা

আরজ

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র 'কোর-আন' শরীফের বাংলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্তত পড়ে বুঝবার মতোও আরবি-ফারসি ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

কোর-আন শরীফের মতো মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হতো না—যদি আরবি ও বাংলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোনো যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হতেন।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র—পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু—কোর-আন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবি ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা—বাঙালি মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি! আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোর-আন মজীদ, হাদিস, ফেকা প্রভৃতির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন তাহলে বাঙালি মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান-অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালি মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভদিন এলে আমার মতো অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস, পবিত্র কোর-আন শরীফ যদি সরল বাংলা পদ্যে অনূদিত হয়, তা হলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন—অনেক বালক-বালিকাও সমস্ত কোর-আন হয়তো মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করবার চেষ্টা করেছি। খুব বেশি কৃতকার্য যে হয়েছি তা বলতে পারিনে—কেননা কোর-আন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুণ্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মতো দুরূহ কাজ আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্তাধীন নয়।

মক্তব-মাদ্রাসা স্কুল-পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের এবং স্বল্প-শিক্ষিত সাধারণের বোধগম্য ভাষাতেই আমি অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছি। যদি আমার এই দিক দিয়ে এই প্রথম প্রচেষ্টাকে পাঠকবর্গ সাদরে গ্রহণ করেন—আমার সকল শ্রম সার্থক হল মনে করব।

আমি এই অনুবাদে যে যে পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছি, নিচে তার তালিকা দিলাম। —Sale's Quran, Moulana Md. Ali's Quran, Tofsir-i-Hosainy, Tofsir-

i-Baizabi, Tofsir-i-Kabiri, Tofsir-Azizi, Tofsir—Mowlana Abdul Hoque Dehlavi, Tofsir-i-Jalalain, Etc., এবং মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান ও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আমপারা।

বহু ভাগ্যগুণে আমি বিখ্যাত মেসার্স করিম বখশ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী মৌলানা আবদুর রহমান খান সাহেবের মতো দারাজ-দিল ও দারাজ-দস্ত মহানুভবের স্নেহ লাভ করেছি। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে, অর্থে ও সাহায্যে আমি 'আমপারা শরীফ' অনুবাদ করতে পেরেছি। উক্ত বীর সাধকের যোগ্য পুত্র দেশ-বিখ্যাত কর্মী মৌলবী রেজাউর রহমান খান এম. এ., বি.এল. (ডিপুটি প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল কাউন্সিল) সাহেবও অযাচিত স্নেহ ও প্রীতি-গুণে আমায় সর্ব বিষয়ে সাহায্য করে আমায় চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের ঋণ স্বীকার করবার মতো ভাষা ও সাধ্য আমার নেই।

মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজউদ্দিন ফখরোল-মোহাদ্দেসীন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাবনবী) সাহেব, মিঃ ইসকান্দর গজনভী বি.এ. সাহেব, মৌলবী কে.এম. হেলাল সাহেব ও আরো অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি করে অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয় সহযোগিতাও করেছেন, তাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ অনুবাদ হয়তো এতটা নির্ভুল হতো না। এঁদের সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করছি।

আমার সোদর-প্রতিম সাহিত্যিক আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন বি.এ. শুধু আমার প্রতি প্রীতিবশত যেভাবে এর জন্য আয়াস স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাঁকে সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করছি। ইনি না থাকলে এ অনুবাদ হয়তো পুস্তক-আকারে আর বের হতো না। এর প্রুফ দেখা, আমায় অকিদ দিয়ে লেখানো ইত্যাদি সমস্ত কাজ আবদুল মজিদ দিবারাত্রি পরিশ্রম করে শেষ করেছেন।

পরম করুণাময় আল্লাহতালা এঁদের সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল করুন, ইহাই প্রার্থনা।

এ সত্ত্বেও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থাকে, মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ আমায় জানালে পরের সংস্করণে সানন্দে ঋণ স্বীকার করে তার সংশোধন করব। আরজ ইতি—

খাদেমুল ইসলাম—
নজরুল ইসলাম

উৎসর্গ

বাংলার নায়েবে-নবী
মৌলবী সাহেবানদের
দস্ত মোবারকে—

সুরা ফাতেহা

(শুরু করিলাম) লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লার মহিমা,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা।
বিচার-দিনের বিভু! কেবল তোমারি
আরাধনা করি আর শক্তি ভিক্ষা করি।
সরল সহজ পথে মোদেরে চালাও,
যাদেরে বিলাও দয়া সে পথ দেখাও।
অভিশপ্ত আর পথ-ভ্রষ্ট যারা, প্রভু,
তাহাদের পথে যেন চালায়ো না কভু!

সুরা—শ্লোক। ফাতেহা—উদ্‌ঘাটিকা।
যাবতীয় সুরার শানে-নজুল ও আবশ্যকীয় হাওয়ালা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সুরা নাস

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বলো, আমি তাঁরি কাছে মাগি গো শরণ
সকল মানবে যিনি করেন পালন।
কেবল তাঁহারি কাছে,—ত্রিভুবন মাঝ
সবার উপাস্য যিনি রাজ-অধিরাজ।
কুমন্ত্রণাদানকারী 'খান্নাস' শয়তান
মানব দানব হতে চাহি পরিত্রাণ।

নাস—মানুষ। খান্নাস—কুমন্ত্রণাদাতা।

সুরা ফলক

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা ও দয়া যাঁর অশেষ অপার।

বলো, আমি শরণ যাচি উষা-পতির,
হাত হতে তার—সৃষ্টিতে যা আছে ক্ষতির।
আঁধার-ঘন নিশীথ রাতের ভয় অপকার—
এসব হতে অভয় শরণ যাচি তাঁহার !
জাদুর ফুঁয়ে শিথিল করে (কঠিন সাধন)
সংকল্পের বাঁধন, যাচি তার নিবারণ।
ঈর্ষাতুরের বিদ্বেষ যে ক্ষতি করে।
শরণ যাচি, পানাহ্ মাগি তাহার তরে।

ফলক্—উষা, প্রাতঃকাল। পানাহ্—পরিত্রাণ।

সুরা ইখলাস

শুরু করিলাম পূত নামেতে আল্লার,
শেষ নাই সীমা নাই যাঁর করুণার !

বলো, আল্লাহ এক ! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।

ইখলাস—বিশুদ্ধ।

সুরা লাহব

শুরু করি নামে সেই আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ধ্বংস হোক, আবু লাহাবের বাহুদ্বয়,
হইবে বিধ্বস্ত তাহা হইবে নিশ্চয়।

করেছে অর্জন ধন সম্পদ সে যাহা
কিছু নয়, কাজে তার লাগিবে না তাহা।
শিখাময় অনলে সে পশিবে ত্বরায়
সাথে তার সে অনল-কুণ্ডে যাবে হায়
জায়া তার—অপবাদ-ইন্ধনবাহিনী,
তাহার গলায় দড়ি বহিবে আপনি।

লহব্—শিখাময় বহ্নি।

সুরা নসর

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার,
নাই আদি অন্ত যাঁর করুণা কৃপার।

আসিছে আল্লার শুভ সাহায্য বিজয়!
দেখিবে—আল্লার ধর্মে এ জগৎময়
যত লোক দলে দলে করিছে প্রবেশ,
এবে নিজ পালক সে প্রভুর অশেষ
প্রচার হে প্রশংসা কৃতজ্ঞ অন্তরে,
করো ক্ষমা-প্রার্থনা তাঁহার গোচরে।
করেন গ্রহণ তিনি সবার অধিক
ক্ষমা আর অনুতাপ-যাচ্ঞা সঠিক।

নসর্—সাহায্য।

সুরা কাফেরুন

আরম্ভ করি লয়ে নাম আল্লার,
আকর যে সব দয়া কৃপা করুণার।

বলো, হে বিধর্মিগণ, তোমরা যাহার
পূজা করো,—আমি পূজা করি না তাহার।
তোমরা পূজ না তাঁরে আমি পূজি যাঁরে,
তোমরা যাহারে পূজ—আমিও তাহারে

পূজিতে সম্মত নই। তোমরাও নহ
প্রস্তুত পূজিতে, যাঁরে পূজি অহরহ।
তোমাদের ধর্ম যাহা তোমাদের তরে,
আমার যে ধর্ম রবে আমারি উপরে।

কাফেরুন—বিধর্মীসকল।

সুরা কাওসার

শুরু করিলাম পূত নামেতে খোদার,
কৃপা করুণার যিনি অসীম পাথার।

অনন্ত কল্যাণ তোমা দিয়াছি নিশ্চয়
অতএব তব প্রতিপালক যে হয়
নামাজ পড়ো ও দাও কোরবানি তাঁরেই,
বিদ্বেষে তোমারে যে, অপুত্রক সে-ই।

কাওসার—বেহেশতের একটি নহরের নাম ; অমৃত।

সুরা মাউন

শুরু করি নামে সেই পবিত্র আল্লার
করুণা দয়ার যাঁর নাই শেষ পার।

তুমি কি দেখেছ, বলে ধর্ম মিথ্যা যেই?
পিতৃহীনে তাড়াইয়া দেয়, ব্যক্তি এই।
দরিদ্র কাঙালগণে অন্নদান তরে
এই লোক উৎসাহ দান নাহি করে।
যাবে ভণ্ড তপস্বীরা বিনাশ হইয়া,
ভ্রান্ত যারা নিজেদের নামাজ লইয়া ;
সৎকাজ করে যারা দেখাইতে লোক,
বাধা দেয় দান ধ্যানে, ধ্বংস তারা হোক !

মাউন—ঘটি, বাটি, দা, কুঠার প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু যাহা লোকে তাহাদের দরকারের সময় চাহিয়া লয় ; ইহাতে জাকাতও বুঝায়।

সুরা কোরায়শ

শুরু করিলাম শুভ নামে আল্লার
রহিম ও রহমান যিনি দয়ার পাথার।

কি অদ্ভুত আচরণ কোরায়শগণের,
ব্যক্ত যাহা পর্যটনে শীত গ্রীষ্মের।
এখন উচিত, তারা সেই অনুরাগে
এই গৃহাধিপতির অর্চনায় লাগে।
যিনি অন্ন দিয়াছেন তাদের ক্ষুধায়,
ভয়ে দিয়াছেন শান্তি—পূজুক তাহার।

কোরায়শ—আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র। এই গোত্রেই হজরত জন্মগ্রহণ করেন।

সুরা ফীল

শুরু করিলাম শুভ নামে সে আল্লার
করুণানিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

দেখো নাই, তব প্রভু কেমন (দুর্গতি)
করিলেন সেই গজ-বাহিনীর প্রতি?
(দেখো নাই, তব প্রভু) করেননি কি রে
বিফল তাদের সেই দুরভিসন্ধিরে?
পাঠালেন দলে দলে সেথা পক্ষী আর
করিতে লাগিল তারা প্রস্তর প্রহার
গজপতিদের। তিনি তাদেরে তখন
করিলেন ভক্ষিত সে তৃণের মতন।

ফীল—হস্তী।

সুরা হুমাজাত

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার
দয়া করুণার যিনি অসীম আধার।

নিন্দা ও ইঙ্গিতে নিন্দা করে যে—তাহার,
গণে গণে রাখে ধন, জমায় যে আর,

চিরজীবী হবে ধনে মনে স্নেহ করে,
সর্বনাশ (ইহাদের সকলের তরে),
নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হবে সে যে 'হোতামায়'
'হোতামা' কাহারে বলে, জানো কি তাহায়?
(ইহা) আল্লার সেই লেলিহান শিখা,
হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করে যে (জ্বালা দাহিকা)।
রুদ্ধদ্বার সে অনল আবদ্ধ আবার
দীর্ঘ স্তম্ভে (আশা নাই মুক্তির তাহার)।

হুমাজাত—দুর্নাম প্রচার করা, নিন্দা করা, অপবাদ দেওয়া।

সুরা আসর

শুরু করি শুভ নামে সেই আল্লার
করুণা-আধার যিনি কৃপা-পারাবার।

অনন্ত কালের শপথ, সংশয় নাই,
ক্ষতির মাঝারে রাজে মানব সবাই।
(তারা ছাড়া) ধর্মে যারা বিশ্বাস সে রাখে,
আর যারা সৎকাজ করে থাকে,
আর যারা উপদেশ দেয় সত্য তরে,
ধৈর্যে সে উদ্বুদ্ধ যারা করে পরস্পরে।

আসর—কাল, অপরাহ্ন।

সুরা তাকাসুর

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার
নাহি আদি নাহি অন্ত যাঁর করুণার।

অধিক লোভের বাসনা রেখেছে তোমাদেরে মোহ-ঘোরে,
যাবৎ না দেখো তোমরা গোরস্থানের আঁধার গোরে।
না, না, না, তোমরা শীঘ্র জানিবে পুনরায় (কহি) ত্বরা
জ্ঞাত হবে; না, না, হতে যদি জ্ঞানী ধ্রুব সে জ্ঞানেতে ভরা।

দোজখ-অগ্নি করিবে তোমরা নিশ্চয় দর্শন
দেখিবে তাহারে তারপর লয়ে বিশ্বাসীর নয়ন।
—নিশ্চয় তার পরে
হইবে জিজ্ঞাসিত আল্লার চিরসম্পদ তরে।

তাকাসুর—প্রাচুর্যের গর্ব করা।

সুরা ক্কারেয়াত

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার পাথার।

প্রলয়ান্তক সেই বিপদ
কোন সে বিপদ ধ্বংস ভয়?
কিসে সে তোমারে জানাল, সেই
বিপদ ভীষণ প্রলয়ময়?
বিক্ষিপ্ত পতঙ্গপ্রায়
সেদিন উড়িবে লোক সবায়,
বিধূনিত লোমবৎ সেদিন
পর্বতরাজি উড়িবে বায়।
সেদিন সে পাবে সুখী জীবন
পাল্লা যাহার হবে ভারি,
পাল্লা হবে হাল্কা যার
(হবে) 'হাভিয়া' দোজখ মাতা তারি।
হাভিয়া কি, তুমি জানো কি সে?
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি সে।

ক্কারেয়াত—ভীষণ বিপদ।

সুরা আ'দিয়াত

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
কৃপা করুণার যিনি অপার পাথার।

বিদ্যুৎ-গতি দীর্ঘশ্বসা
(বীর-বাহী উটের শপথ)

যাহার চরণ-আঘাতে উগারে
তপ্ত বহ্নি ফিন্‌কিবৎ।
প্রত্যুষে করে ধূলি উৎক্ষেপি
(শত্রু-শিবির) আক্রমণ,
অনন্তর সে (অরি) দলে পশে
(এই হেন করে বিলুণ্ঠন)।
শপথ তাদের—নিঃসংশয়
অকৃতজ্ঞ মানবকুল
তাদের পালনকর্তা প্রভুর
পরে, নিশ্চয়, (নহে সে ভুল !)
আর সে নিজেই সাক্ষী ইহার
কঠিন বিষয়াসক্তি তার,
সে কি তা জানে না, কবর হইতে
উঠানো হইবে সবে আবার ?
হৃদয়ে তাদের লুকানো যা-কিছু
প্রকাশ করাব সব সেদিন,
জানিবে তাদের (সকল গোপন)
কথা—'রাব্বুল আলামিন'।

আ'দিয়াত—উটের পায়ের শব্দ। রাব্বুল আলামিন—সর্ব-জগতের প্রভু।

সুরা জিলজাল

শুরু করি লয়ে 'পাক' নাম আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপার পাথার।

ঘোর কম্পনে ভূমণ্ডল প্রকম্পিত সে হবে যে দিন
ধরা তার ভার বাহির করিয়া দিবে (সে দিন)।
'কি হইল এর' কহিবে লোকেরা,
সেদিন ব্যক্ত করিবে সে
নিজের যা কিছু খবর, তোমার
প্রভু সে খোদার নির্দেশে।
প্রত্যাগত সে হইবে সে দিন
দলে দলে যত লোকসকল,

দেখানো হইবে কর্মসকল
তাদের (পাপ ও পুণ্য-ফল) !
এক রেণুবৎ যে পুণ্য
করিবে, তাহাও দেখিবে সে,
পাপ যে করেছে এক রেণুবৎ
দেখা দিবে তারে তাও এসে।

জিলজাল্—ভূমিকম্প হওয়া।

সুরা বাইয়েনাহ

শুরু করিলাম নামে পবিত্র আল্লার,
সীমা নাই যাঁর দয়া কৃপা করুণার।

'আহলে কেতাব' আর অংশিবাদিগণ
নিবৃত্ত হয়নি যারা বিশ্বাসে আপন।
ভিন্ন-মত হয় নাই তাহারা তাবৎ,
না এল তাদের কাছে প্রমাণ যাবৎ।
আল্লার রসুল যিনি, পবিত্র কোরান
উদগাতা যাহাতে দৃঢ় সত্য অধিষ্ঠান
(ভিন্ন-মত হইল তাহারা তাঁর 'পরে)
'আহলে কেতাব' দল এইরূপ করে,
যতদিন আসে নাই পরম প্রমাণ,
করে নাই দলাদলি, করেছে সম্মান।
তাদেরে কেবল মাত্র আজিকার মতো
এই সে আদেশ দেওয়া আছিল সতত—
কর্মেতে 'হানিফ' হয়ে কেবল আল্লার
করুক তাহারা পূজা, উপাসনা আর।
নামাজ পড়ুক, দিক জাকাত সে সাথে,
চির-দৃঢ় সত্য ধর্ম, ইহাই ধরাতে।
'আহ্‌লে কেতাব' আর 'মুশরিক' যারা
প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সত্যধর্ম তারা
দোজখ-আগুনে হবে হবে চিরস্থায়ী,
সৃষ্টির অধম তারা, সংশয় নাই।

সৃষ্টির বরেণ্য তারা নিশ্চয়ই, যারা
ঈমান আনিয়া করে সৎকাজ তারা।
তাহাদের পুরস্কার দর্গায় আল্লার
বেহেশত-কানন আছে তলদেশে যার
নহর-লহর বহে; তারা সেই লোকে
অনন্ত কালের তরে রবে নিরাশোকে।
প্রসন্ন তাদের প্রতি সদা বিশ্বপতি,
তাহারাও প্রীত তাই আল্লাহের প্রতি।
জীবন-প্রভুরে হেন ভয় যার মনে
এই পুরস্কার আছে তাদেরি কারণে।

বাইয়েনাহ—নিশ্চিত প্রমাণ। আহলে কেতাব—গ্রন্থ-বিশ্বাসী; অর্থাৎ তওরাত, জবুর প্রভৃতি খোদার প্রেরিত গ্রন্থের যাহারা অনুপন্থী।

সুরা কদর

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
আদি অন্তহীন যিনি দয়া করুণার।

করিয়াছি অবতীর্ণ কোরান পুণ্য 'শবে কদরে';
জানবে কিসে শবে কদর কয় কারে? ধরা পরে
হাজার মাসের চেয়ে বেশি কদর এই যে নিশীথের,
এই সে রাতে ফেরেশ্‌তা আর জিবরাইল আলমের
করতে সরঞ্জাম সকলি নেমে আসে ধরণী,
উষার উদয় তক্ থাকে এই শান্ত পূত রজনী।

কদর—সম্মান। আলম—জগৎ। শবে-কদর—মহিমময়ী রজনী।

সুরা আলক

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

পাঠ করো প্রভুর নামে, স্রষ্টা যে জন,
করেছেন যিনি ঘন সে শোণিতে মানবে সৃজন।

পাঠ করো, তব বিধাতা মহিমা-মহান সেই,
দিয়াছেন সবে লেখনীর দ্বারা শিক্ষা যেই।
—সে জানিত না যাহা,
মানুষেরে তিনি দেছেন শিক্ষা তাহা,
না, না, মানুষ সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়,
ধন-গৌরবে মত্ত যে ভাবে সে আপনায়
নিশ্চয় তব প্রভুর পানে যে ফিরিতে হবে।
দেখেছ কি তারে—আমার দাসেরে সে জন যবে
নিবারণ করে দাস মোর যবে নামাজ পড়ে?
দেখেছ, সে জন থাকিত যদি রে সুপথ ধরে!
সে যদি অন্যে সংযমী হতে করিত আদেশ!
সত্যেরে যদি মিথ্যা বলে সে (শাস্তি অশেষ)।
(সত্য হইতে) মুখ সে ফিরায়! সে জন তবে
জানে না কি, খোদা দেখিতেছেন যে তার সে সবে?
না, না, যদি নিবৃত্ত সে না হয়, শেষ
টানিয়া আনিব ধরিয়া তাহার ললাট-কেশ
মিথ্যাবাদী সে মহা পাতকীর ললাট (ধরি)
(টানিব)। ডাকুক সভা সে তাহার পারিষদেরি।
আমিও আমার বীর সেবকেরে দিই খবর,
না, না, না, কখনো মানিও না তাদের 'পর
সেজদা করো,
হও ক্রমে মোর নিকট হইতে নিকটতর।

আলক—রক্ত ও তাহার পরিবর্তিত অবস্থা।

সুরা তীন

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা ও কৃপা যাঁর অনন্ত অপার।

শপথ 'তীন' 'জায়তুন' 'সিনাই' পাহাড়
শপথ সে শান্তিপূর্ণ নগর মক্কার—
নিশ্চয় মানুষে আমি করেছি সৃজন
দিয়া যত কিছু শ্রেষ্ঠ মূরতি গঠন।
(যে জন সুবিধা এর লইল না তারে)
করিয়াছি নীচাদপি নীচ সে জনারে।

কিন্তু যে ঈমান আনে, সৎকাজ করে,
অনন্ত সে পুরস্কার আছে তার তরে।
‘সুবিচার পাবে সবে’ বলিলে তোমায়
মিথ্যার আরোপ করে কে সে তবে, হায়?
আল্লাহ্ কি নন
সব বিচারক চেয়ে শ্রেষ্ঠতম জন?

তীন—হজরত ঈসার জন্মভূমি বয়তুল মোকাদ্দসে তীন জায়তুনের গাছ খুব বেশি বলিয়া উঁহাকে এই নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।
সিনাই—এক পাহাড়ের নাম। এই পাহাড়ে হজরত মুসা তওরাত গ্রন্থ প্রাপ্ত হন এবং খোদার জ্যোতি দর্শন করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

সুরা ইনশেরাহ

শুরু করি লয়ে পাক নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

তোমার কারণ
করিনি কি আমি তব বক্ষ বিদারণ?
নামায়ে সে ভার (মুক্তি) দিইনি তোমারে?
ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ ছিলে তুমি যে বোঝার ভারে?
নাম কি তোমার
করিনি কি মহীয়ান মহিমা-বিথার?
সংকটের সাথে আছে শুভ নিশ্চয়,
অতএব অবসর পাবে যে সময়—
উপাসনায় রত হবে সংকল্প লয়ে,
প্রভুর করিবে ধ্যান একমন হয়ে।

ইন্‌শেরাহ্—বিদারণ, উন্মোচন।

সুরা দ্বোহা

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
অনন্ত সাগর যিনি দয়া করুণার।

শপথ প্রথম দিবস-বেলার
শপথ রাতের তিমির-ঘন,

করেননি প্রভু বর্জন তোমা,
করেননি দুশমনি কখনো।
পরকাল সে যে উত্তমতর
ইহকাল আর দুনিয়া হতে,
অচিরাৎ তব প্রভু দানিবেন
(সম্পদ) খুশি হইবে যাতে।
পিতৃহীন সে তোমারে তিনি কি
করেননি পরে শরণ দান?
ভ্রান্ত–পথে তোমারে পাইয়া
তিনিই না তোমা পথ দেখান?
তিনি কি পাননি অভাবী তোমারে
অভাব সব করেন মোচন?
করিয়ো না তাই পিতৃহীনের
উপরে কখনো উৎপীড়ন।
যে জন প্রার্থী—তাহারে দেখিও
করো না তিরস্কার কভু,
ব্যক্ত করহ নিয়ামত যাহা
দিলেন তোমারে তব প্রভু!

দ্বোহা—দিবসের প্রথম প্রহর।

সুরা লায়ল

শুরু করি শুভ নাম লয়ে আল্লার,
দয়া করুণার যিনি মহা-পারাবার।

শপথ রাতের আবৃত যখন করে সে অন্ধকারে
দিনের শপথ প্রোজ্জ্বল যাহা করে দেয় জ্যোতিঃধারে,
নর ও নারীর শপথ—যাদের তিনি সে স্রষ্টা প্রভু,
তোমাদের যত কর্মফল একমত নহে কভু।
যারা দাতা সংযমী, সত্যধর্মে সত্য বলিয়া লয়,
সহজ করিয়া দিব কল্যাণে তাহাদেরে নিশ্চয়।
কিন্তু যাহারা কৃপণ, নিজেরে ভাবে অতি বড় যারা,
বলে সত্যধর্মে মিথ্যা, শীঘ্র দেখিতে পাইবে তারা

সহজ করিয়া দিয়াছি তাদের দোজখের পথ, আর
রক্ষা করিতে পারিবে না তারে তার ধন-সম্ভার।
তখন ধ্বংস হইবে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
কর্তব্য সে আমার। একাল পরকাল সবখন
কেবল আমারি এখ্‌তিয়ারে সে। জেনো সুপথ প্রদর্শন
প্রজ্জ্বলিত সে অনল হইতে জ্বলজ্বল লেলিহান।
হতভাগা সেইজন সত্য হতে যে মুখ ফিরায়,
সে ছাড়া সেই যে অগ্নিকুণ্ডে পশিবে না কেহ হায়!
সে অনল হতে রক্ষা পাইবে সেই সংযমী জন
শুদ্ধ হবার মানসে যে জন করে ধন বিতরণ।
কাহারো দয়ার প্রতিদানরূপে করে না সে ধন দান,
তাহার মহিমময় সে প্রভুরে তুষিতে যত্নবান।

লায়ল—রাত্রি।

সুরা শামস

শুরু করি লয়ে নাম মহান আল্লার,
যিনি সব দয়া-কৃপা-করুণা-আধার।

শপথ রবি ও রবি-কিরণের
যখন চন্দ্র চলে সে পিছনে তার
দিবস যখন করে সপ্রকাশ
রবিরে, রজনী অন্ধকার,
যখন ছাইয়া ফেলে সে রবিরে;
নভ-নির্মাণ-কারী তাহার;
এই সে পৃথিবী স-বিস্তার;
আত্মা, সুচারু গঠন তার।
সেই আত্মার সৎ ও অসতের
দিয়াছি দিব্য জ্ঞান,
এই সকলের শপথ ইহারা
সকলে করিছে সাক্ষ্য দান—
আত্মশুদ্ধি হইল যার,
নিশ্চয় সার্থক জীবন,
আত্মায় কলুষিত করিল যে
চির-বঞ্চিত হলো সে জন।

সত্যেরে বলিল মিথ্যা
'সামুদ' জাতি সে গর্বভরে
অগ্রসর হলো হতভাগারা
(রসুলেরে নাহি গ্রহণ করে)।
কহিলেন রসুল খোদার প্রেরিত
—সলিল করিতে পান
ওই আল্লার উটেরে
দিও নাকো বাধা বধো না প্রাণ।
বলিল নবীরে মিথ্যাবাদী
তথাপি তাহারা বধিল উটেরে,
তাহাদের তাই পাপের ফলে
বিধ্বস্ত করিল আল্লা অদেরে।
ধূলিসাৎ করে ফেলিলেন খোদা
তাদেরে; এই সে ধ্বংস-লীলার
পরিণাম ফলে বে-পরোয়া তিনি
(কোনো ভয় কভু নাই তাঁর)।

শামস—সূর্য।

সুরা বালাদ

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
যিনি দয়াশীল আর কৃপার আধার।

শপথ করি এই নগরের
যেহেতু বিরাজ করিছ হেথায়
শপথ পিতার আর তাহাদের সন্তানের
(অধিবাসী এই নগর মক্কায়)।
মানুষে করেছি সৃষ্টি যে আমি
নিশ্চয় দুঃখ ক্লেশের মাঝ,
সে কি ভাবে, তার পরে প্রভুত্ব
করিতে কেহই নাহি সে আজ?
'উড়ায়ে দিয়াছি রাশি রাশি টাকা
আমি'—সে বলে বিনাশিতে তোমারে,

সে কি (এই শুধু) মনে করে
কেহ দেখিতেছে না তাহারে?
আমি কি তাহার মঙ্গল লাগি
দিইনি তাহারে যুগল নয়ন?
জিহ্বা ওষ্ঠ দিইনি? দেখায়ে
দিইনি উভয় পথ সে-কারণ?
কিন্তু তো প্রবেশ করিল না তো সে
দুর্গম পথে উপত্যকার;
উপত্যকার দুর্গম সেই
পথ—জানো তুমি সন্ধান তার?
সে পথ—দাসেরে মুক্তিদান
ও অন্নদান সে ক্ষুধার্তেরে
আশ্রয় দান ধূলি-লুণ্ঠিত
কাঙালে, 'এতিম', আত্মীয়েরে।
এমনি করে সে হয় একজন
তাদের মতোই, ঈমান যারা
আনে আর দেয় উপদেশ
সব বিপদে (মহৎ তারা)।
উপদেশ দেয় পরস্পরে সে
দয়াশীল হতে তারাই হবে
দক্ষিণ কর অধিকারী। আর
এ আয়াতে অবিশ্বাস করে গো যারা—হবে
বাম হস্তের অধিকারী তারা, তাদের তরে
আছে নিবদ্ধ হুতাশনের বরাদ্দ রে।

বালাদ—নগর।

সুরা ফজর

শুরু করি লয়ে পাক নাম আল্লার
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

উষার শপথ। দশ সে রাত্রের শপথ করি,
জোড়-বিজোড় সে দিনের শপথ! সে বিভাবরী,

যবে অবসান হতে থাকে করি তার শপথ
জ্ঞানীদের তরে যথেষ্ট শপথ—এই তো।
ভীমবাহু ঐ ইরামীয় 'আদ'দের 'পরে
করেছেন কিবা প্রভু তব, দেখোনি কি ওরে?
হয়নি সৃজিত নগরসমূহে তাদের প্রায়
আর সে 'সামুদ' জাতি যে পাথর কাটিয়া
সে উপত্যকায়—
বসাইয়াছিল নগর বসতি, আর বহু কীলকধারী;
ফেরাউন সাথে বিনাশ সাধিলাম কেন
আমি তাহারি?

নগরে নগরে করেছিল ঔদ্ধত্যক—আর
বহু অনাচার এনেছিল তথায় আবার।
শাস্তি দণ্ড তোমাদের প্রভু
তাদের উপরে দিলেন তাই,
নিশ্চয় তব প্রভু দেখে সব,
থাকেন সময় প্রতীক্ষায়।
মানবে যখন দিয়ে সম্পদ
সম্মান, করে পরীক্ষা প্রভু,
'আমার প্রভুই দিলেন এ সব
সম্মান'—বলে অবোধ তবু।
আবার তাহারে পরীক্ষা যবে
করেন জীবিকা হ্রাস করে,
সে বলে, 'আমার প্রভুই এ হেন
অপমানিত গো করিল মোরে!'
নহে, নহে, তাহা কখনোই নহে,
এ সবের তরে তোমরা দায়ী,
এতিমে তোমরা গ্রাহ্য করো না
কাঙালে খাদ্য দিতে উৎসাহ নাহি
অন্নমুষ্টি তারে নাহি দাও,
অত বেশি করো অর্থের মায়া,
পিতৃ-সম্পদ বিনা বিচারে সে
যাও যে তোমরা ভোগ করিয়া।
জানো না কি, যবে ভীষণ রবে
এ-ধরিত্রী বিচূর্ণিত হবে,

দলে দলে ফেরেশ্‌তাগণ
তখন হাজির হবে সবে।
আর আসিবেন সে-দিন
তব মহান প্রভু সেথায়,
দোজখ সেদিন হইবে আনীত,
সেদিন মানুষ স্মরিবে, হায় !
কিন্তু সেদিন স্মরণে কি হবে ?
'হায় হায়' করি কাঁদিবে সব,
'পূর্বে যদি এ জীবনের তরে
প্রেরিতাম পুণ্যের বিভব !'
অন্য কেহ সে পারিবে না দিতে
তেমন শাস্তি সেদিন,
অন্য কেহই তখন বাধা দিতে
পারিবে না সেই যে দিন।
শান্তি-প্রাপ্ত মানব-আত্মা !
ফিরে এস নিজ প্রভু পানে।
তুমি তার প্রতি প্রীত যেমন
তিনি তব প্রতি প্রীত তেমন।
অনুগত মোর দাস যারা
এস সেই দলে,
বেহেশ্‌তে মোর করিবে প্রবেশ
অবহেলে।

ফজর—উষা।

সুরা গ্বাবিয়া

শুরু করি শুভ নাম লয়ে আল্লার,
করুণা-নিধান যিনি কৃপা-পারাবার।

—আসিয়াছে নিকটে তোমার
বৃত্তান্ত কি আচ্ছন্নকারী ঘটনার ?
বহু সে আনন হবে নত জ্যোতিহীন ;
শ্রান্ত কর্ম-পরিক্লান্ত তাহারা সে দিন—
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া
ফুটন্ত উৎসের জল যাইবে পিইয়া।

বিষ কণ্টক শুধু পাইবে আহার,
করিবে না পুষ্ট দেহ, নিবৃত্তি ক্ষুধার।
খুশিতে হইবে বহু মুখ উজ্জ্বল,
হরষে লইবে তারা নিজ পুণ্য ফল।
মহিমা–সুন্দর পারে তাহারা বাগান,
শোনে না কেহই সেথা মিথ্যার ব্যাখ্যান।
সেথা চির বহমান উৎস সুমদয়,
সমুন্নত সিংহাসন সেইখানে রয়।
রাখা আছে পান–পাত্র, শত উপাধান,
বিছানো মখমল শয্যা (আরাম–শয়ান)।
দেখে নাকি উট সবচেয়ে তারা সবে?
কিরূপে তাদের সৃষ্টি হইল, না ভাবে?
দেখে না বিনা স্তম্ভে আকাশ কেমনে
উচ্চে হয়েছে রাখা? পর্বতগণে
দেখে না কেমনে হলো তাদের স্থাপন?
বিস্তারিত হলো এ–ধরা সে কেমন?
তুমি উপদেষ্টা শুধু, উপদেশ দাও,
তুমি তো প্রহরী নহ, (পথ সে দেখাও)
মানিবে না আদেশ যে, ফিরাইবে মুখ,
দিবেন আল্লাহ তারে কঠোর সে দুখ।
নিশ্চয় ফিরিতে হবে তারে মোর পাশে,
হিসাব নিকাশ হবে আমারি সকাশে।

গাশিয়া—আচ্ছন্নকারী (প্রলয় ঘটনা)।

সুরা আ'লা

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা–নিধান যিনি দয়ার পাথার।

মহত্তম যা নাম প্রভুর,
বর্ণনা করো পবিত্রতা তার,

সৃজন করিয়া যিনি পূর্ণতা
দানিয়াছেন তায় আবার।
উচিত ধর্মে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া তিনিই দেখান পথ,
সৃজিয়া তৃণাদি তারে আবার
করেন কৃষ্ণ ভস্মবৎ।
আমি তোমা পড়াইব কোরান,
বিস্মৃত তাই হবে না আর,
তবে আল্লাহ্ জানেন সব
প্রকাশ গোপন সব ব্যাপার।
তোমার তরে সে কল্যাণের
পথেরে সহজ দিব করে,
অতএব উপদেশ বিলাও
যদি সে সুফল হয়, ওরে!
উপদেশ তব লবে ত্বরায়
সেই জন আছে যাহার ভয়,
অতিশয় হতভাগ্য যে
তাহা হতে দূরে সরিয়া রয়,
দোজখের মহাঅনল মাঝ
করিবে প্রবেশ সেই সে জন
বাঁচিবেও না সে (শাস্তিতে)
হবে না সেথায় তার মরণ।
সেইজন হয় সফলকাম
অন্তকরণ পবিত্র যার,
নামাজ পড়ে যে, করি স্মরণ
নাম সে দয়াল প্রভুর তার।
পছন্দ সে করিল হায়
পার্থিব এই জীবনকেই
উত্তম আর অবিনাশী
জীবন যা পাবে পরকালেই।
নিশ্চয় পূর্বের সকল
কেতাবেই আছে তা বিদ্যমান,
বিশেষ করিয়া ইব্রাহিম,
মুসার কেতাব তার প্রমাণ।

আ'লা—মহত্তম।

সুরা তারেক

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-সাগর যিনি দয়ার পাথার।

শপথ 'তারেক' ও আকাশের
সে 'তারেক' কি তা জানো কিসে?
নক্ষত্র সে জ্যোতিষ্মান
(নিশীথে আগত অতিথি সে)।
এমন কোনো সে নাহি মানব
রক্ষক নাই উপরে যার,
অতএব দেখা উচিত তার
কোন্ বস্তুতে সৃষ্টি তার।
বেগে বাহিরায় উছল জল-
বিন্দু তাতেই সৃজন তার
পিঠ ও বুকের মধ্য দেয়
সেই যে জল স্থান যাহার
সক্ষম তিনি নিশ্চয়ই
করিতে পুনর্জীবন দান
অভিব্যক্তি হবে সবার
গুপ্ত বিষয় হবে প্রমাণ,
রবে না শক্তি সহায় আর
সেদিন তাহার কোনো কিছুই,
শপথ নীরদ-ঘন নভের
শপথ বিদায়শীল এ-ভুঁই।
ইহাই চরম বাক্য ঠিক,
নিরর্থক এ নহে সে দেখ,
মতলব করে তাহারা এক
মতলব করি আমি ও এক
অবসর তুমি দাও হে তাই
বিধর্মীদের ক্ষণতরে
দাও অবকাশ তাহাদেরে।

তারেক—নৈশ আগন্তুক।

সুরা বুরুজ

শুরু করিলাম লয়ে নাম আল্লার,
করুণা কৃপার যিনি অসীম পাথার।

গ্রহ-উপগ্রহ-ভরা শপথ আকাশের,
আর শপথ প্রতিশ্রুত রোজ হাশরের
শপথ উপস্থিত, উপস্থাপিত সবার,
ধ্বংস হলো সে অধিকারিগণ পরিখার।
কাষ্ঠপূর্ণ অগ্নিকুণ্ড—অধিকারিগণ
বসেছিল তদুপরি তাহারা যখন।
আল্লায়-বিশ্বাসিগণে ধরিয়া তথায়
ফেলিয়া দেখিতেছিল নিজেরাই, হায়!
সাজা দিতেছিল শুধু অপরাধে এই
বিশ্বাসিগণের প্রতি; বিশ্বাসীরা যেই
ঈমান আনিয়াছিল আল্লাহর প্রতি,
অনন্ত-প্রতাপ যিনি মহীয়ান অতি।
স্বর্গ মর্ত রাজত্বের অধিপতি যিনি,
জ্ঞাত এ-সবের তত্ত্ব একমাত্র তিনি।
ঈমানদার সে নর-নারীরে যাহারা
দেয় যন্ত্রণা, তৌবা নাহি করে তাহারা
ইহারই জন্য যাবে দোজখে নিশ্চয়,
অনল দাহন জ্বালা যেথা শুধু রয়।
অবশ্য যাহারা সৎ 'নেক' কাজ করে,
আনে সে ঈমান; আছে তাহাদের তরে,
এমন বাগান, যার নিম্নদেশ দিয়া
পুণ্য-তোয়া নদী সব চলিছে বহিয়া।
শ্রেষ্ঠ সফলতা এই নিশ্চয় তোমার
প্রভু প্রতাপান্বিত বিপুল বিথার।
প্রথমে সৃজিয়া যিনি গড়েন আবার
তিনি মহা প্রেমময় ক্ষমাবান, আর
জগৎ-সাম্রাজ্য-সিংহাসনের পতি,
ইচ্ছাময় প্রভু তিনি গরীয়ান অতি।
ফেরাউন সামুদের সেনা—সম্বার
তাদের বৃত্তান্ত শোনা আছে কি তোমার?

জানো কি কেমনে হলো তারা ছারখার ?
যে জন অমান্য করে আদেশ আমার
সত্যেরে অসত্য বলা কাজ যে তাহার।
অথচ আল্লাহতালা ঘিরিয়া তাহায়
পরিব্যাপ্ত রয়েছেন চারিদিকে, হায় !
মহিমান্বিত মহা কোর-আন এই
লিখিত সুরক্ষিত পাক 'লওহে'-ই।

বুরুজ্—গ্রহ বা রাশিচক্র।

সুরা ইনশিকাক

শুরু করিলাম শুভ নামেতে আল্লার,
করুণা কৃপার যাঁর নাই নাই পার।

(রোজ কিয়ামতে) যবে ফাটিবে আকাশ,
হবে সে প্রভুর নিজ আজ্ঞাবহ দাস,—
এই উপযোগী করে গড়েছি তাহায় ;
লাগিবে সে আকর্ষণ যখন ধরায় ;
যাহা কিছু আছে তার মধ্যে 'ফেলি' তায়
হইয়া যাইবে শূন্য-গর্ভ সে, হায় !
মানিবে পৃথিবী আজ্ঞা তাহার খোদার,
এরি উপযোগী করে সৃজন যে তার।
তোমার খোদার পানে চলিতে, মানব !
তোমারে করিতে হবে চেষ্টা অসম্ভব।
তবে সে করিবে লাভ মিলন তাঁহার !—
মিলিবে 'আমল-নামা' ডান হাতে যার,
সহজে দিবে সে তার হিসাব নিকাশ,
হরষে ফিরিবে নিজ পরিজন পাশ।
যে পাবে আমল-নামা পশ্চাৎ পানে,
'সর্বনাশ' বলিয়া সে কাঁদিবে সেখানে
পশিবে সে অগ্নিকুণ্ডে। —আত্মীয়-স্বজনে
বেষ্টিত ছিল সে যবে হরষিত মনে,

ধরিয়া লইয়াছিল মনে সে তাহার
ফিরিতে কখনো তারে হইবে না আর।
—তারে সর্বদা
দেখিতেছিলেন, নিশ্চয়, তার যে খোদা
সান্ধ্য-গগনের ঐ গোধূলি-রাগের
শপথ করি আর যে তিমির রাতের,
যামিনী সংগ্রহ করে যত কিছু তার,
আর শপথ করি আমি পূর্ণ-চন্দ্রমার ;—
নিশ্চয় তোমরা পৌঁছিবে পরে পরে
এক স্তর হতে পুনরায় অন্য স্তরে।
(অতএব) তাহাদের কি হয়েছে? তারা
বিশ্বাস করে না এ বিশ্বাস-হারা!
কোরান তাদের কাছে যবে পাঠ হয়,
(কেন) তাহারা সেজদা নাহি করে সে সময়!
অমান্য করে যারা তারাই আবার
সত্যে সে আরোপ করে তারাই মিথ্যার।
তাহারা পোষণ করে মনে যাহা যত,
আল্লাহ্ বিশেষরূপে তাহা অবগত।
—কঠোর দণ্ডের
অতএব দিয়ে রাখো সংবাদ তাদের।
(তবে) যাহারা ঈমান আনে, নেক কাজ করে,
অন্তহীন পুরস্কার তাহাদের তরে।

ইনশিকাক—বিদারণ, ফাটিয়া যাওয়া।

সুরা তাৎফিফ

শুরু করি লয়ে পূত নাম বিধাতার
করুণা ও দয়া যার অনাদি অপার।

সর্বনাশ তাহাদের, হ্রাস-কারী যারা,
যখন লোকের কাছে মেপে লয় তারা,
তখন পূর্ণ করে চায় মেপে নিতে,
তাদেরে ওজন করে হয় যবে দিতে,
তখন কম সে করে মাপে ও ওজনে।
উঠিতে হইবে পুন, করে না তা মনে।

উঠিবে মানব পুন মহান সেদিন,
বিশ্ব-পালকের কাছে দাঁড়াবে যেদিন।
পাপিষ্ঠ লোকের সে কার্য সমুদয়
নিশ্চয় 'সিজ্জিনে' থাকে, কভু মিথ্যা নয়।
জানো কি, সে 'সিজ্জিনে' কি? লিখিত কেতাব
(লেখা রবে যাতে তার পাপের হিসাব)।
—সর্বনাশ হবে।
তাদের—সত্যেরে বলে মিথ্যা যারা সবে।
কর্মফল প্রাপ্তির এদিন হাশরের—
বলে মিথ্যা—সর্বনাশ হবে তাহাদের।
আদেশ-লঙ্ঘনকারী পাতকী ব্যতীত।
আর কেহ বলে না—এ সত্যের অতীত।
তার কাছে পাঠ হলে আমার এ বাণী
সে বলে এ 'পূর্বতন লোকের কাহিনী।'
—কখনোই নহে, তাহা নহে
অভ্যস্ত তাদের নিজ কাজগুলি রহে,
জমেছে মরিচা-রূপে তাহাদের মনে।
সেদিন তাহারা নিজ খোদার সদনে,
পারিবে না যেতে নিশ্চয়! তারপর
প্রবেশ করিবে তারা দোজখ ভিতর।
সেই কর্মের ফল জেনো ইহা সেই,
তোমরা মিথ্যা সদা বলিতে এরেই।
কখনোই মিথ্যা নহে, রহিবে নিশ্চয়,
লেখা 'ইল্লিয়নে' সব কার্য সমুদয়
যত সৎলোকের সে। জানো 'ইল্লিয়ন'
কারে কয়? লিখিত সে কেতাব রতন।
প্রত্যক্ষ কেবল তারা করিবে দর্শন
আল্লার নিকটে যাবে যে মানবগণ।
সুপ্রচুর সুখে রবে পুণ্য-আত্মাগণ,
সুউচ্চ তখ্‌তে রহি করিবে দর্শন।
—সে সুখ-পুলকে
দেখিতে পাইবে তারা নিজ মুখে-চোখে
—শিলমোহর করা
তাহারা করিবে পান সুপবিত্র সুরা।
কস্তুরীর সে মোহর। কামনা কারুর
থাকে যদি—করুক কামনা এ দারুর।

'তস্‌নীম' সুধা মেশা হয় সে সুরায়,
'তস্‌নীম' সে প্রস্রবণ-উৎস, যাহার
আল্লার নিকট যারা, করে তারা পান।
অবিশ্বাসী সবার প্রতি বিদ্রূপ-বাণ
হানিত যে অপরাধিগণ নিশ্চয়,
আঁখি-ঠারে ইঙ্গিত তারা যে সময়
করিত পরস্পরে বিশ্বাসীরে দেখে
তাহাদের পাশ দিয়া যাইলে তাহাকে।
স্বজনের কাছে সব ফিরে গিয়ে পুন
করিত বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ ইহারা তখনো।
দেখায়ে (বিশ্বাসিগণ) বলিত, 'ইহারা
নিশ্চয়, নিশ্চয়ই, সবে পথহারা!'
বিশ্বাসীদের পরে অথচ বেশক
প্রেরিত হয়নি এরা হইয়া রক্ষক।
ঈমান এনেছে যারা, তারা আজিকে
উপহাস করিবে বিধর্মী দেখে।
উঁচু সে তখতে বসি করিবে দর্শন,
কর্মফল পেল আজ বিধর্মিগণ।

তাৎফিফ—পরিমাণ হ্রাসকরণ।

সুরা ইনফিতার

শুরু করি লয়ে শুভ নাম আল্লার,
করুণা-পাথার যিনি দয়া-পারাবার।

আসমান সবে বিদীর্ণ হবে
খসিয়া পড়িবে তারকা সব,
সমাধি-পুঞ্জ হবে উন্মুক্ত
উচ্ছ্বসিত হবে অর্ণব,
তখন জানিবে প্রত্যেক লোকে
জীবনে করেছে কি সঞ্চয়,
রাখিয়া এসেছে পশ্চাতে কিবা!
হে মানব! তবে সে কৃপাময়
প্রভু হতে রাখে বঞ্চিত করে
তোমার কিসে? যে প্রভু তোমার

সৃজিয়া তা'পর সাজাল কেবল
কৌশলে যেথা যাহা মানায়।
যুক্ত তোমায় করেছেন তিনি
যে আকারে তাঁর ইচ্ছা হয়,
মিথ্যা বল যে কর্মফলেরে
নহে নহে তাহা কখনো নয়।
নিয়োজিত আছে রক্ষীবৃন্দ
নিশ্চয় তোমাদিগের 'পর,
যাহা কিছু কর, মহান হিসাব—
লেখকদের তা হয় গোচর।
রবে নিশ্চয় পরমাহ্লাদে
পুণ্যবান সৎকর্মীরা,
নিশ্চয় যাবে দোজখে সে যত
দুঃশীল কু-ব্যক্তিরা।
করিবে প্রবেশ রোজ কিয়ামতে
সে দোজখে তারা। পশি সেথা
লুকাতে পলাতে পারিবে না আর,
তাহা কি জানাল তোমা কে তা?
জিজ্ঞাসা করি আবার তোমারে
কিয়ামত কি তা জানো কি সে?
ইহা সেই শেষ-বিচার দিবস,
যে-দিন মানব-মানবী সে
কেহই কারুর উপকারে কোনো
আসিবে না, হবে নিঃসহায়,
একমাত্র সে আল্লাতা'লার
হুকুম সেদিন রবে সেথায়।

ইনফিতার—বিস্ফোরণ, বিদারণ।

সুরা তকভীর

শুরু করিলাম শুভ নামেতে খোদার,
করুণা-আকর যিনি দয়ার আধার।

সঙ্কুচিত হয়ে যবে সূর্য যাবে জড়ায়ে,
তারকা সব পড়বে যখন ইতস্তত ছড়ায়ে,

পর্বত সব সঞ্চারিয়া ফিরবে যখন (ধূলির প্রায়)।
পূর্ণ-গর্ভা উটগুলিরে দেখবে না কেউ উপেক্ষায়,
বেরিয়ে আসবে বুনো যত জানোয়ারেরা বেঁধে দল,
হবে প্লাবন উদ্বেলিত যখন সকল সাগর-জল।
আত্মা হবে যুক্ত দেহে। জ্যান্ত পোঁতা কন্যাদের
পুছ্‌ব যখন কোন দোষে বধ করছে পিতা তোদের?
যখন খোলা হবে সবার আমল-নামা; সেই সেদিন
জ্বলবে দোজখ ধু ধু, হবে আকাশ আবরণ-বিহীন,
জানবে সেদিন প্রতি মানব, সাথে সে কি আনল তার!
শপথ করি ঐ চলমান আর স্থিতিশীল তারকার,
রাত্রি যখন পোহায় এবং ঊষা যখন ছায় সে দিক
শপথ তাদের, মহিমময় রসুলের এ বাণী ঠিক।
আরশ-অধিপতির কাছে প্রতিষ্ঠা তাঁর, সেই রসুল
বিশ্বস্ত, সম্মানার্হ, শক্তিধর, ধরায় অতুল।
পাগল নহে তোমাদের এই সহচরী, সাক্ষ্য দিই,
মুক্ত দিগন্তরে জিব্রাইল দেখেছেন সে তিনিই।
অদেখা যা দেখেন ইনি ব্যক্ত করেন তখন তাই,
বিতাড়িত শয়তানের এ উক্তি নহে (কহেন খোদাই)।
তোমরা যবে অতঃপর কোন সে দিকে?
বাণীতে—যাহা কই,
বিশ্ব-নিখিল-শুভ তরে নয় তো এ উপদেশ বই!
এই উপদেশ তাহার তরে, তোমাদিগের মাঝ হতে
চলিতে যে চাহে আমার সুদৃঢ় সরল পথে।
নিখিল-বিশ্ব-অধিরাজের ইচ্ছা না হয় যতক্ষণ,
তোমরা ইচ্ছা করতে নাহি পারবে জানি ততক্ষণ।

তকভীর—আরবণ।

সুরা আবাসা

শুরু করি লয়ে নাম আল্লার,
দয়া করুণার যার নাই নাই পার।

(মোহাম্মদ) ভ্রূ-ভঙ্গি করি ফিরাইল মুখ
যেহেতু আসিল এক অন্ধ আগন্তুক

তাঁহার নিকট। তুমি জানো (মোহাম্মদ) ?
হয়তো বা লভিবে সে শুদ্ধির সম্পদ ;
কিংবা তব উপদেশমতো সে চলিবে,
তাহাতে তাহার তরে সুফল ফলিবে।
মানে না যে তব কথা বে-পরোয়া হয়ে,
বুঝাইতে কত যত্ন তব, তার লয়ে !
অথচ সে শুদ্ধাচারী না হইলে পর
তোমার দায়িত্ব নাই প্রভুর গোচর।
কিন্তু তব পাশে ছুটে আসে যেইজন
আল্লার সে ভয়-ও রাখে, তার থেকে মন
সরাইয়া লও তুমি ! উচিত এ নয়,
আল্লার এ উপদেশ জানিও নিশ্চয় ;
কাজেই যাহার ইচ্ছা, করুক উহার
আলোচনা। (সেই উপদেশ-সম্ভার)
মহিম-মহান পত্রাবলীতে (লিখিত),
উন্নত পূত লেখক হস্তে (সুরক্ষিত)।
(আর সে লেখকগণ) সৎ ও মহান।
সর্বনাশ মানুষের ! সে কৃতঘ্ন-প্রাণ
অতি ঘোর ! (হায়), তারে কোন বস্তু হতে
সৃজন করিয়াছেন তিনি ? শুক্র হতে !
—তারে সৃষ্টি করে
যথাযথভাবে তারে সাজান, তা'পরে
সহজ করেন তার জন্য পথ তার,
পরে মৃত্যু ঘটাইয়া সমাধি মাঝার
লন তারে। পুনরায় ইচ্ছা সে যখন,
বাঁচাইয়া তুলিবেন তাহারে তখন।
না, না, তিনি করেছেন যে আদেশ তারে
সমাধা সে করিল না তাহা (একেবারে)।
করুক মানুষ এবার দৃষ্টিপাত
তাহার খাদ্যের পানে, কত বৃষ্টিপাত
করিয়াছি (তার তরে) ; মাটিরে তা'পরে
বিদীর্ণ করিয়াছি কত ভাল করে।
অনন্তর জন্মায়েছি ফসল প্রচুর,
আঙ্গুর শাক-সব্জি, জায়তুন, খেজুর,

গহন কানন-রাজি, তৃণাদি ও ফল ;
তোমাদের, তোমাদের পশুর মঙ্গল
সাধিতে। আসিবে যবে সে বিপদ-দিন,
(ভীষণ নিনাদে) লোক পালাবে সে দিন
নিজ ভ্রাতা, নিজ পিতা মাতা হতে,
সঙ্গিনী ও পুত্রগণে (ফেলে রেখে পথে)।
সে-দিন এমনই হবে অবস্থা লোকের,
ভাবিতে সে পারিবে না কথা অন্যের।
সে-দিন উজ্জ্বল হবে কত সে আনন,
হাসিরাশি-ভরা আর পূর্ণ-হরষণ ;
আবার কত সে মুখ ধূসর ধুলায়।
(হইবে হায় রে) আচ্ছাদিত কালিমায় ?
—ইহারা তাহারা,
অমান্যকারী আর ভ্রষ্টাচারী যারা।

আবাস—ভ্রূ-ভঙ্গিকরণ।

সুরা নাজেয়াত

শুরু করি লয়ে পূত নাম সে খোদার,
যিনি চির-দয়াময় করুণা-আধার।

তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে টানে যারা (ধনুর্গুণ)
তাদের শপথ ছুটে (যে শর) তীব্র সে গতি-নিপুণ।
তাদের শপথ পূর্ণ-বেগে যারা সন্তরণ-কারী,
দ্রুতবেগে অগ্রগামী (অশ্ব যে) প্রমাণ তারি।
করে যারা সব বিষয়ের ব্যবস্থা তাদের প্রমাণ।
কম্পনের সে পরে যেদিন ধরা হবে কম্পমান,
কত সে অন্তরাত্মা সেদিন হবে ঘন-স্পন্দিত,
দৃষ্টিগুলি তাদের সেদিন হবে অবনমিত।
বলছে তারা (ব্যঙ্গসুরে) 'আমরা কি গো পুনর্বার
জীর্ণ অস্থি হবার পরেও পূর্বজীবন পথে আর
(বিতাড়িত হবে)। ওহো, তবে বড়ই ক্ষতিকর
হবে তো সে জীবন পাওয়া।' একটিমাত্র তাড়নায়
প্রান্তর-ভূমিতে তারা অমনি হাজির হবে, হায় !

তোমার কাছে পৌঁছেনি কি মুসার সেই সে বিবরণ?
তাহার প্রভু যখন তারে করিলেন সেই সম্বোধন
পূত 'তোওয়া' প্রান্তরে ফেরাউনের বরাবর,
উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে সে। কলবে তারে অতঃপর,—
তুমি পাক হতে কি চাও? দেখাইয়া দিই তোমায়
তোমার প্রভুর দিকের পন্থা, চলবে হে ভয় করে তায়।'
(পরে) মুসা দেখাল তায় শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন,
সে সত্যরে মিথ্যা বলে লইল না তা (ফেরাউন)।
প্রবৃত্ত সে হইল কুচেষ্টায় যে অতঃপর,
ঘোষণা সে করিল ফলে জুটিয়ে (বহু লস্কর),
বলিল তখন, 'আমিও তো পরম প্রভু তোদের রে!'
ইহকাল আর পরকালের শাস্তি দিতে চাই তারে
ধৃত করিলেন আল্লাহ্। ভয় রাখে যে তাঁর তরে
বিশেষ করে জানার উপদেশ আছে (কোরান ভরে)।
তোমাদের কি সৃষ্টি অধিক কঠিন? না ঐ আকাশের?
সৃজিয়া তায় উর্ধ্বকে তার করিলেন সুউচ্চ ফের।
ঠিক-ঠাক তায় দিলেন করে। রজনীকে তিমির-ময়
করলেন (দূর করে তাহার আলোকরাশি সমুদয়)।
প্রসারিত করলেন এই ধরায় তিনি অতঃপর
তাহার থেকে করলেন বাহির পানি এবং চারণ-চর।
(তোমাদের ও তোমাদের পশুর উপকার তরে)
প্রতিষ্ঠিত করলেন ঐ শৈলমালা উপরে।
সে মহাবিপদ আসবে যে দিন অতঃপর,
অর্জন সে করেছে কি বুঝতে পারবে সেদিন নর।
দর্শকে দেখানোর তরে দোজখ হবে সুপ্রকাশ,
লঙ্ঘন যে করে বিধি পার্থিব জীবনের আশ—
মুখ্যভাবে যে জন করে তার স্থিতিস্থান দোজখ পরে।
কিন্তু প্রভুর সম্মুখে তার দাঁড়াবার যে ভয় রাখে,
নীচ যত প্রবৃত্তি হতে মুক্ত রাখে আত্মাকে,
ফলে—(হবে) নিশ্চয় ঐ বেহেশত তাহার স্থিতিস্থান!
জিজ্ঞাসিছে ওরা হবে কখন তাহার অধিষ্ঠান,
সেই মুহূর্ত আসবে কবে? তুমি আলোচনায় সেই
(ব্যস্ত) আছ? তার নিরূপণ তোমার প্রভুর নিকটেই।
—যে সব লোকে ভয় রাখে সেই মুহূর্তের
তুমি কেবল করতে পারো সাবধান সে তাহাদের

(করবে মনে সে দিন তারা) দেখবে যখন সেই সে খন,
রয়নি তারা এক সাঁঝ বা এক প্রভাতের অধিকক্ষণ।

নাজেয়াত—ধনুকধারিগণ।

সুরা নাবা

শুরু করি লয়ে নাম খোদার
করুণাময় ও কৃপা-আধার।

পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে তারা কোন বিষয়?
সেই সে মহান খবর লয়ে যাতে সে ভিন্নমত হয়?
না, না, তারা জানবে ত্বরায়, জানবে, কই আবার
করিনি কি শয্যারূপে নির্মাণ আমি এই ধরার?
কীলকস্বরূপ করিনি কি স্থাপিত ঐ সব পাহাড়?
জোড়ায় জোড়ায় তোমাদের সৃষ্টি করেছি আবার।
বিরাম লাগি দিয়াছি ঘুম, রাত তোমাদের আবরণ,
করিয়াছি জীবিকার তরে দিবসের সৃজন।
নির্মিয়াছি দৃঢ় সপ্ত (আকাশ) উর্ধ্বে তোমাদের,
করিয়াছি প্রস্তুত এক প্রদীপ্ত সে প্রদীপ ফের,
বর্ষণ করেছি সলিল মেঘ হতে মুষলধারায়,
কারণ আমি জন্মাব যে উদ্ভিদ ও শস্য তায়,
এবং গহন কাননরাজি। আছে আছে সুনিশ্চয়,
মীমাংসা সে অবধারিত যেদিন সে ভেরী প্রলয়
উঠবে বেজে; শুনে তাহা তোমরা সবে দলে দল
সমাগত হবে; এবং খোলা হবে গগন-তল,
তাহার ফলে হয়ে, যাহে সেদিন তাহা বহুদ্বার,
সঞ্চালিত করা হবে পাহাড় সবে; ফলে তার
মরীচি-বৎ হবে তারা। দোজখ আছে অপেক্ষায়,
সুনিশ্চয়; অবাধ্য যারা তাদের বাসস্থান তাহায়।
সেইখানেতে করবে তারা বহু, 'হোক্‌বা' অবস্থান!
পাবে নাকো সেখানে তারা স্নিগ্ধ স্বাদ এবং পান
করতে নাহি পাবে কিছু, যেমন কর্ম তেমনি ফল,
পাবে সলিল উষ্ণ ভীষণ কিংবা দারুণ সুশীতল।

হিসাব নিকাশ আশা তারা করত নাকো সুনিশ্চয়,
মিথ্যার আরোপ করেছিল নিদর্শন সে সমুদয়।
দেখতে আমার ওরা সবে হঠকারিতা করেই
অথচ রেখেছি গুনে গুনে প্রতি বস্তুকেই
সুতরাং এবার মজা দেখো ! এখন কেবল যাতনাই
বাড়িয়ে দিতে থাকব আমি, তোমাদিগের
—(রেহাই নাই) !
সংযমী লোক সবার তরেই সফলতা সুনিশ্চয়,
প্রাচীর ঘেরা কাননরাজি এবং আঙ্গুর (সেথায় রয়)।
সমান বয়েস তরুণীদল, পানপাত্র পরের পর
আসবে সেথা পূর্ণ এবং পবিত্র (অমৃতভর)।
শুনতে নাহি পাবে তারা মিথ্যা প্রলাপ সেই সে স্থান
বিনিময়ে তোমার প্রভুর থেকে তাই যথেষ্ট দান।
ভূলোক ও দ্যুলোকের যিনি সকল-কিছুর অধীশ্বর,
করুণাময় যিনি তাহার কেহই সেদিন তাঁহার পর
হবে নাকো অধিকারী সম্বোধন করিতে তার।
জিবরাইল আর ফেরেশতারা দাঁড়াবে সব দিয়ে সা'র
সেদিন তারা কইতে নারবে কোনো কথা ; কিন্তু যার
মিলবে আদেশ কৃপা-নিধান খোদার কাছে বলবে সে
সংগত সে কথা। উহাই নিশ্চিত দিন সত্য যে সে।
সুতরাং যার ইচ্ছা হয়
আপন প্রভুর কাছে এসে গ্রহণ করুক সে আশ্রয়।
অনাগত শাস্তি সে কি, তার বিষয়
সাবধান করেছি আমি তোমাদের সুনিশ্চয়।
দেখতে পাবে সেদিন মানুষ পাঠাল দুই হস্ত তার
কোন সম্বল আগের থেকে ! বলতে থাকবে কাফের
—আর (ভাগ্যহত আমি হায়)
হতাম যদি মাটি—(ছিল শান্তি তায়) !

নাবা—খবর। হোকবা—বহুযুগ।

তাম্মাত

শানে-নজুল

সুরা ফাতেহা [১]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ, ১২৩টি অক্ষর ও ১টি রুকু। ইহার অপর নাম 'সাবাউল মোসানী'। 'সাবা' অর্থ সাত ; 'মোসানী' অর্থ পুনপুন।

ফাতেহা—উদঘাটিকা। এই 'সুরা' দিয়াই পবিত্র কোর-আন শরীফের আরম্ভ। এই জন্য এই সুরার নাম 'ফাতেহা'। ইহা কোর-আনের শেষ খণ্ড আমপারায় নাই, ইহা কোর-আন শরীফের প্রথম খণ্ডের 'সুরা'। নামাজ, বন্দেগি, প্রার্থনা প্রভৃতি সকল পবিত্র কাজেই সুরা ফাতেহার প্রয়োজন হয় বলিয়া আমপারার সঙ্গে ইহার অনুবাদ দেওয়া হইল।

শানে-নজুল—(অবতীর্ণ হইবার কারণ)—একদা হজরত মোহাম্মদ (দ.) মক্কার প্রান্তর অতিক্রম করিবার সময় দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, মোহাম্মদ! আমি স্বর্গীয় দূত জেব্রাইল, আপনি পয়গম্বর, আমি শপথ করিতেছি—আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো উপাস্য নাই, মোহাম্মদ (দ.) আল্লাহর রসুল (তত্ত্ববাহক)। আপনি বলুন, আলহামদোলিল্লাহ—সকল প্রশংসাই বিশ্বপতি আল্লার, ইত্যাদি।

—(তফসীরে আজিজী ও তফসীরে মাজহারী)

সুরা নাস [২]

মদীনা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৬টি আয়াত, ২০টি শব্দ, ৮১টি অক্ষর এবং ১টি রুকু আছে। 'নাস' অর্থ মানুষ। (কোর-আন শরীফের মোট ১১৪টি সুরার মধ্যে এইটিই শেষ সুরা।)

সুরা ফলক [৩]

মদীনা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৩টি শব্দ, ৭৩টি অক্ষর ও ১টি রুকু। 'ফলক'—উষা, প্রাতঃকাল। ইহা কোর-আনের ধারাবাহিক ১১৩ নং সুরা।

শানে-নজুল—মদীনা শরীফের অধিবাসী লবিদ নামক একজন ইহুদির কয়েকটি কন্যা ছিল। তাহারা হজরত নবী করিমের মাথার কয়েকটি চুল ও চিরুনির কয়েকটি দাঁতের

উপর জাদুমন্ত্র পাঠ করিয়া এগারোটি গ্রন্থি দিয়াছিল এবং তাহা এক একটি খোর্মা মুকুলের মধ্যে রাখিয়া 'যোরআন' নামক কূপের তলদেশস্থ প্রস্তরের নিচে স্থাপন করিয়াছিল। এই জাদুর দরুন হজরতের শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল যে, তিনি যে কাজ করেন নাই তাহাও করিয়াছেন বলিয়া কখনো কখনো তাঁহার ধারণা হইত। হজরত ছয় মাস কাল যাবৎ এরূপ ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে জানিতে পারিলেন তাঁহার ঐ পীড়ার কারণ কি। প্রাতে হজরত আলী, আম্মার ও জোবায়েরকে 'যোরআন' কূপের দিকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উক্ত কূপের তলদেশ হইতে ঐসব দ্রব্য তুলিয়া হজরতের নিকট নিয়া হাজির করেন। তখন জিব্রাইল 'ফলক' ও 'নাস' এই দুই সুরা সহ অবতরণ করেন। এই দুই সুরায় এগারোটি আয়াত আছে। তিনি এক এক করিয়া ক্রমান্বয়ে এগারোটি আয়াত পাঠ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া উহার এগারোটি গ্রন্থি খুলিয়া গেল। অতঃপর হজরত সম্পূর্ণরূপে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

—(এমাম এবনে কছির, জালালায়ন, কবীর)

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাদুমন্ত্র দ্বারা মানুষের শারীরিক ক্ষতি হওয়া অসমীচীন নয় ; কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জাদুমন্ত্র-প্রভাবে স্বর্গীয় আদেশ প্রচারের কালে বিকারগ্রস্ত হইয়াছিলেন এরূপ ধারণা করা বাতুলতা মাত্র।

—(কবীর, হাক্কানী)

সুরা ইখলাস [৪]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ, ৪৯টি অক্ষর ও ১টি রুকু আছে।

শানে নজুল—মক্কার অধিবাসী কতিপয় কাফের হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আল্লাহ কি উপাদানে গঠিত? তিনি কি আহার করেন? তাঁহার জনক কে? ইত্যাদি ; তদুত্তরে এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাবা বলেন—'সামাদ' অর্থ যিনি পান-আহার করেন না। এই শব্দের—অভাবরহিত, শ্রেষ্ঠতম, অনাদি, নিষ্কাম ও অনন্ত ইত্যাদি বহু অর্থ আছে। আল্লাহ কাহারো মুখাপেক্ষী বা সাহায্যপ্রার্থী নন, সকলেই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী ; তিনি

বে-নেয়াজ। এই সুরায় অংশিবাদী ও পৌত্তলিকদের মতবাদকে খণ্ডন করা হইয়াছে।

—(কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)

সুরা লহব [৫]

মক্কায় অবতীর্ণ ; ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৪টি শব্দ, ৮১টি অক্ষর।

শানে-নজুল—বোখারি ও মোসলেম প্রভৃতি টীকাকারদের মতে খোদাতালা হজরতের আত্মীয়-স্বজনদের সম্বন্ধে শাস্তির ভীতি প্রদর্শনসংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ করিলে তিনি সাফা পর্বতের উপর আরোহণ করিয়া আরবের তদানীন্তন নিয়মানুসারে উচ্চৈস্বরে 'সাবধান' 'সাবধান' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে কোরায়েশ বংশের অনেক লোক তথায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করে, কি হইয়াছে? হজরত তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি বলি যে, একদল শত্রু তোমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য পর্বতের অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছে, তবে তোমরা আমার এই কাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? তদুত্তরে তাহারা বলিল, নিশ্চয় বিশ্বাস স্থাপন করিব। আমরা বেশ পরীক্ষা করিয়াছি, আপনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তৎপর হজরত বলিলেন,—হে কোরেশগণ! তোমাদের সম্মুখে জ্বলন্ত দোজখের মহাশাস্তি রহিয়াছে; যদি তোমরা আমার ও খোদার বাণীর উপর আস্থা স্থাপন না করো, তবে তোমাদিগকে ঐ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তোমরা স্ব স্ব আত্মাকে উক্ত শাস্তি হইতে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আবু লহব (হজরতের পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তাহার স্ত্রী আবু সুফিয়ানের ভগ্নী উম্মে জামিলা) রাগান্বিত হইয়া বলিল 'তাব্বান লাকা'—তোর ধ্বংস হউক। এ ঘটনার পর এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

—(বোখারী)

সুরা নসর [৬]

এই সুরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয় ; ইহাতে ৩টি আয়াত, ১৯টি শব্দ ও ৮১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হিজরি ষষ্ঠ সালে হজরত ছাহাবাগণসহ 'ওমরা' সম্পন্ন করার জন্য হোদায়বিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কোরেশগণ তাঁহাদিগকে মক্কা শরীফে প্রবেশ করিতে

বাধা প্রদান করে। সেই সময় কোরেশগণের সহিত হজরতের এই মর্মে এক সন্ধি হয় যে, একদল অপর দলের প্রতি কোনো প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না। বনুবকর সম্প্রদায় কোরেশদের ও খোজা সম্প্রদায় হজরতের পক্ষভুক্ত হইল। কিছুকাল পর বনুবকরেরা কোরেশদের সহায়তায় উক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করত খোজাদলকে আক্রমণ করে। খোজারা হেরেম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা সত্ত্বেও বনুবকরেরা তাহাদিগকে প্রহার করে। জনৈক খোজানেতা ও তাহাদের দলের কয়েকজন লোক মদীনা শরীফে হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। হজরত ছাহাবাগণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে আদেশ প্রদান করেন। পূর্বের অঙ্গীকার দৃঢ় ও শর্তের সময় বৃদ্ধি করার মানসে কোরেশগণ আবু সুফিয়ানকে মদীনা শরীফে প্রেরণ করেন। হজরত আলী, জোবায়ের প্রভৃতি ছাহাবার প্রেরিত পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্র কাড়িয়া লন। দশম হিজরিতে দশ হাজার ছাহাবা-সহ মক্কা অভিমুখে হজরত যাত্রা করেন। আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ, হজরত আব্বাসের প্রার্থনায় তাহার মুক্তি, বহু সৈন্যের ভীতি, মক্কা বিজয়, অধিবাসীগণকে ক্ষমা, ১৫ দিবস তথায় অবস্থান ইত্যাদির আভাস ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে।

সুরা কাফেরুন [৭]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ ; ইহাতে ৬টি আয়াত, ২৭টি শব্দ ও ৯৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ওমাইয়া, হারেছ, আ'স, অলিদ প্রভৃতি কোরেশগণ হজরত তাহাদের ধর্মমতের অনুসরণ করিলে, তাহারাও হজরতের ধর্মমতের অনুসরণ করিবেন বলায় তিনি বলিলেন, আমি আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি কখনো তাঁহার অংশীস্থাপন করিতে পারিব না। তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে না অথচ হজরতের সহিত মিলিত হইতে চায় ; তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা কাওসার [৮]

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয় ; ইহাতে ৩টি আয়াত, ১০টি শব্দ ও ৩৭টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—এই সুরাটি আবু জহল, আবু লহব, আ'স ও আকাবার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে, হজরতের পুত্র তাহের দেহত্যাগ করার পর আ'স নামীয়

জনৈক ধর্মদ্রোহী হজরতের সহিত আলাপ করার পর নিজের দলের লোকদের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, আমি অবতার নিঃসন্তান বা আঁটকুড়ের সহিত আলাপ করিয়াছি। উহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার এন্তেকালের পর হয়তো তাঁহার নাম লোপ পাইবে। তাঁহার সান্ত্বনার জন্য এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা মাউন [৯]

মক্কা শরীফে এই সুরা অবতীর্ণ হয় ; ইহাতে ৭টি আয়াত, ২৫টি শব্দ ও ১১৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—আবু জহল কোনো মুমূর্ষু ব্যক্তির সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর নিজেই বালকের পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকে এবং বালকটিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। উক্ত বালক ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র অবস্থায় হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া আবু জহলের অসদ্ব্যবহার ও অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করে। হজরত আবু জহলের নিকট যাইয়া উহার প্রতিকারার্থে তাহাকে কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন করেন। আবু জহল কেয়ামতের প্রতি অসত্যারোপ করিতে থাকায় হজরত দুঃখিত মনে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

আবু সুফিয়ান সম্মান লাভের ইচ্ছায় প্রতি সপ্তাহে দুইটি করিয়া উষ্ট্র জবেহ করিয়া সম্ভ্রান্ত কোরেশদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত। একদা জনৈক পিতৃহীন বালক আবু সুফিয়ানের বাড়িতে নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইয়া কিছু মাংস ভিক্ষা চাহিয়াছিল। উহাতে সে যষ্টির আঘাত করিয়া উক্ত বালককে বিতাড়িত করে ; সেইজন্য এই সুরা নাজেল হয়।

—(এমাম রাজী)

কেহ কেহ বলেন—কেয়ামত অমান্যকারী পাপী আস কিংবা ধনশালী অবাধ্য ও অহঙ্কারী অলীদের সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

শেষার্ধ আবদুল্লা-বেনে-ওবাইয়া নামক জনৈক কপটাচারী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া 'খাজেনে' উল্লিখিত আছে।

পরন্তু ধার্মিক বলিয়া পরিচিত যে সকল ব্যক্তির ব্যবহারে অধর্ম প্রকাশ পায় তাহাদের লোক-দেখানো কপটতার উদ্দেশ্যেই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা কোরায়শ [১০]

ইহা মক্কায় নাজেল হইয়াছে। এই সুরাতে ৪টি আয়াত, ১৭টি শব্দ ও ৭৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—করশ শব্দ হইতে কোরায়শ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার আভিধানিক অর্থ সংগ্রহ করা বা উপজীবিকা সংগ্রহ করা। কোরায়েশগণ ব্যবসায় দ্বারা অর্থ বা উপজীবিকা সংগ্রহ করিতেন—তজ্জন্য তাঁহারা এই নামে অভিহিত হইতেন।

এবনে আব্বাসের মতে, কোরায়েশ নামক এক প্রকার জলজন্তু সমুদ্রে বাস করে। উহারা সামুদ্রিক জন্তুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উহারা যে কোনো সামুদ্রিক জন্তুর নিকট উপস্থিত হয় তাহাকেই গ্রাস করে; কিন্তু অন্য কোনো জন্তু উহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। আরব দেশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী সম্প্রদায় কেলাবের পুত্র কোছাইয়ের বংশধরেরা এই নামে অভিহিত। তাহারা বাণিজ্যার্থ শীতকালে ইমন প্রদেশের দিকে ও গ্রীষ্মকালে শাম (সিরিয়া) দেশের দিকে যাইত। কাবাগৃহের রক্ষক ও অধিপতি বলিয়া উভয় দেশের নরপতিগণ তাহাদিগকে প্রচুর সম্মান করিত; আর তাহারাও বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি আবশ্যকীয় বস্তুগুলি স্বদেশে আনয়ন করিত ও বাণিজ্যে বেশ লাভবান হইত। কানানার পুত্র নাজারকে কোরায়েশ নামে অভিহিত করা হইত। তৎপর তাহার বংশধরেরা উক্ত নামে অভিহিত হইতে থাকে। হজরত ও তাঁহার ৪ জন খলিফা এই বংশসম্ভূত।

আবরাহার দলের উপর জয়ী হওয়ায় আবেসিনিয়াবাসীদের সম্বন্ধে এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

সুরা ফীল [১১]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৫টি আয়াত, ২৪টি শব্দ ও ৯৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ইমন প্রদেশের শাসনকর্তা আবরাহা ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া ইমনের 'ছানয়া' নামক স্থানে রত্নরাজি খচিত 'কলিসা' নামে একটি গির্জা প্রস্তুত করিয়া তথায় উপাসনার নিমিত্ত লোকদিগকে আহ্বান করেন। ধার্মিক লোকেরা তাঁহার আদেশ মানিতে রাজি না হওয়ায় তিনি কাবা ধ্বংসের নিমিত্ত বহু সৈন্যসামন্ত ও ১৩টি হাতি ('মামুদ'সহ) প্রেরণ করেন। হজরতের পিতামহ আবদুল মোতালেব 'মোগাম্মছ' নামক স্থানে হান্নাতা নামক ব্যক্তির সহিত যাইয়া আবরাহার

নিকট হাজির হন ও যথেষ্ট সম্মান পান এবং তাঁহার লুণ্ঠিত দুই শত উষ্ট্র ফেরত পাইবার দাবি জানান। আবরাহা কাবা ধ্বংসের বাসনা জ্ঞাপন করায় তিনি বলেন—আমি উটের মালিক, উট ফেরৎ চাই—কাবাগৃহের মালিক স্বয়ং আল্লাহ্, কাজেই তিনি উহা রক্ষা করিবেন। আরবের অপর যে সকল নেতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারা মক্কায় ধনসম্পদ বা চতুষ্পদ জন্তুসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চাওয়া সত্ত্বেও আবরাহা কাবা ধ্বংসের সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, আবদুল মোতালেবের উটগুলি ফেরৎ দিতে আদেশ দিলেন।

আবরাহা যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তখন কাবার মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত আল্লাহতা'লা দলে দলে পাখি প্রেরণ করিলেন। উহারা উপর হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করত আবরাহার সমস্ত হস্তী ও সৈন্য বিনাশ করিয়া দিল। এই ঘটনার কিছুকাল পর হজরতের জন্ম হয়।

কোরেশগণের উপর যে আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই এই সুরায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া আল্লার এবাদত করা কোরায়েশগণের কর্তব্য, এই উদ্দেশ্যে এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা হুমাজাত [১২]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৯টি আয়াত, ৩৩টি শব্দ ও ২৩৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—ধর্মদ্রোহী আখনাস, অলিদ, ওবাই, ওমাইয়া, জমি ও আ'স সাক্ষাতে হজরতকে ও তাঁহার সহচরগণকে বিদ্রূপ করিত এবং অসাক্ষাতে তাঁহাদের অপবাদ প্রচার করিত। এইজন্য এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা আসর [১৩]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩টি আয়াত, ১৪টি শব্দ ও ৭৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত আবুবকর (রা.) তাঁহার পূর্ববন্ধু কালদার সঙ্গে বসিয়া আহার করিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কালদা বলিল—আপনি দক্ষতা সহকারে বাণিজ্য করিয়া লাভবান হইয়া আসিতেছেন—বর্তমানে পৈতৃক ধর্ম (প্রতিমা-পূজা) পরিত্যাগে মহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। তদুত্তরে আবুবকর (রা.) বলিলেন—যে সত্য ধর্ম অবলম্বন ও সৎকার্য সম্পাদন

করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। সেই সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়।

এবনে আব্বাসের মতে, ইহা অলিদ, আ'স কিংবা আসওয়াদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

মোকাতেলের মতে, আবু লাহাব সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল।

সুরা তাকাসুর [১৪]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৮টি আয়াত, ২৮টি শব্দ ও ১২৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কোরেশকুলের এক শাখার নাম বনি-আব্দ-বেনে মান্নাফ, অপর শাখার নাম বনি-সাহম। প্রত্যেক শ্রেণী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বলিতে লাগিল—আমরা অর্থে, ঐশ্বর্যে, সম্ভ্রমে ও লোকসংখ্যায় শ্রেষ্ঠতর। এমনকি, প্রত্যেক দল স্বীয় গৌরব বর্ধনের নিমিত্ত আপন দলভুক্ত লোকদিগকে গণনা করিতে আরম্ভ করিল। এই গণনায় আব্দ-মান্নাফ বংশের লোক সংখ্যায় অধিক হইল। পরে জীবিত ও মৃত উভয় শ্রেণীর লোক গণনা করায় বনি-সাহম দলের লোকসংখ্যা অধিক হইল। লোকসংখ্যা নিরূপণের নিমিত্ত তাহারা গোরস্থানে গিয়াছিল। সেই সময় এই সুরা নাজিল হয়।

মতান্তরে : ইহুদিগণের নামে সংখ্যাধিক্য লইয়া কলহের সূত্রপাত হওয়ায় মদিনাবাসী বনি-হারেস ও বনি-হারেসা এই দুই দল পরস্পর ধনৈশ্বর্যের অহঙ্কার করায় এই সুরা নাজেল হয়।

—(একসির)

সুরা ক্বারেয়াত [১৫]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৩৫টি শব্দ ও ১৬০টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের ভীতি প্রদর্শন ও ইসলামের বিজয়ের ইঙ্গিত করার জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম কাতাদা বলেন—একদা ইহুদিগণ বলিয়াছিল যে, আমরা বিপক্ষ দল অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ; সেই সময়ে এই সুরা নাজেল হয়।

এমাম এবনে কসিরের মতে, মদিনাবাসী বনি-হারেস ও বনি-হারেসা এই দুই দল ধনসম্পদের অহঙ্কার করিয়াছিল, তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আ'দিয়াত [১৬] এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১৭০টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত তাঁহার সহচর মোনজের-বেনে-আমরকে একদল অশ্বারোহীসহ 'বনি-কানানা' সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিতে পাঠান এবং ফিরিয়া আসিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। পথের এক স্থান জলপ্লাবিত থাকায় তাঁহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয়। তখন কাফেরগণ উক্ত সৈন্যদল বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ প্রচার করায় মুসলমানগণ দুঃখিত হয়। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদানের নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা জিলজাল [১৭] এই সুরায় ৮টি আয়াত, ৩৭টি শব্দ ও ১৫৮টি অক্ষর আছে। হাক্কানী, হোসেনী, শাহ অলিউল্লাহ, শাহ্ রফিউদ্দিন, শাহ্ আবদুল আজিজ প্রভৃতির মতে, এই সুরা মদিনা শরীফে নাজেল হইয়াছে।

কবীর বলেন—এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে (এবনে আব্বাস, কাতাদা)। কাশ্‌শাফ, বায়জাবী ও জালালাইন বলেন—এই সুরার অবতরণ-স্থান সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

—(বোখারি শরীফ, Part 1, Vol. 1.)

শানে-নজুল—একদা হজরতের সঙ্গে আবুবকর (রা.) যখন কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সময় ৭/৮ আয়াত নাজেল হয়। তখন, আবুবকর (রা.) আহার গ্রহণ ত্যাগ করিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি এক বিন্দু কুকর্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইব? তদুত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, সংসারে তুমি যে কোনো সময়ে বিপদাপন্ন হও, উহা তোমার বিন্দু বিন্দু অসৎ কর্মের প্রতিফল ; আর তোমার বিন্দু বিন্দু পুণ্যকে আল্লা তোমার জন্য সম্বলস্বরূপ রক্ষা করেন, পরকালে, ঐ সকলের প্রতিদান আল্লা তোমাকে দিবেন। সামান্য সামান্য সৎকার্য আর সামান্য সামান্য পাপ-কার্য একত্রিত হইয়া পর্বত-তুল্য হইয়া যায় ; অকিঞ্চিৎকর কার্যও বৃথা যায় না—এই শিক্ষা প্রচারার্থ উক্ত আয়াতদ্বয় নাজেল হয়।

সুরা বাইয়েনাহ [১৮] এই সুরায় ৮টি আয়াত, ৯৫টি শব্দ ও ৪১৩টি অক্ষর আছে। কবীর, হাক্কানী, শাহ অলিউল্লাহ্ ও শাহ্ রফিউদ্দীন বলেন—এই সুরা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনী বলেন, এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—মদিনার ইহুদিগণ ও মক্কার অংশিবাদীগণ তৌরাতের প্রতিশ্রুত শেষ পয়গম্বরের প্রতীক্ষায় ছিল। শেষ পয়গম্বর আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাপ-কার্য হইতে বিরত হয় নাই—তজ্জন্য এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা কদর [১৯]

এই সুরায় ৫টি আয়াত, ৩০টি শব্দ ও ১১৫টি অক্ষর আছে। ইহা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

কাশ্‌শাফ, বায়জাবী, জালালাইন ও হোসেনীর মতে, এই সুরা মদিনা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে।

শানে-নজুল—কোনো কথা-প্রসঙ্গে একদা হজরত উল্লেখ করেন যে, ইস্রায়েল বংশীয় হজরত সমউন সহস্র মাস কাল দিবস রোজা রাখিতেন ও জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) করিতেন আর রাত্রি জাগিয়া নামাজ পড়িতেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার আসহাবগণ বলিল—সাধারণত আমরা ৬০/৭০ বৎসর বাঁচিয়া থাকি ; তন্মধ্যে কতকাংশ শৈশবাবস্থায়, কতকাংশ নিদ্রিতাবস্থায়, কতকাংশ পীড়িত ও শৈথিল্যাবস্থায় এবং কতকাংশ জীবিকা সংগ্রহ করিতে অতিবাহিত হয় ; অবশিষ্টাংশে আমরা কতটুকু সৎকার্য করিতে সক্ষম হইব? উহাতে হজরত দুঃখিত হন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আলক [২০]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ২৯০টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মক্কার অদূরে হেরা গিরি-গহ্বরে হজরত এবাদতে মশগুল হইতেন। জিব্রাইল হজরতের নিকট সর্বপ্রথম তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'আপনি পাঠ করুন।' হজরত বলিলেন—'আমি নিরক্ষর এবং পাঠ করিতে সমর্থ নহি।' এইরূপ তিন প্রশ্নোত্তরের পর জিব্রাইল বলিলেন—'আপনি সেই মহান খোদার নামে পাঠ করুন' ইত্যাদি (কবীর, কাশ্‌শাফ, বায়জাবী)।

প্রথম পাঁচ আয়াত তখন নাজেল হয়। প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সুরা ফাতেহা ও তৎপর সুরা মোদ্দাস্‌সের অবতীর্ণ হয়। হজরত সেজদা করিতেছেন দেখিলে আবুজহল তাঁহার গ্রীবায় পদাঘাত ও তাঁহার মুখমণ্ডল মৃত্তিকায় প্রোথিত

করিবে বলিয়া প্রতিমার শপথ করিয়াছিল। হজরতের নামাজ পড়িবার সময় কাছে উপস্থিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা অনুরূপ কাজ করিতে সক্ষম হয় না। তখন ৬–১৪ আয়াত নাজেল হয়।

সুরা তীন [২১]

এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হইয়াছে। ইহাতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি শব্দ ও ১৬৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—১। তীন—আঞ্জির, জায়তুন—তৈল বৃক্ষ বিশেষ উভয় নামে পরিচিত পর্বতে হজরত ঈশার জন্ম ও নবুয়ত-প্রাপ্তি হয়।

২। সিনিনা—সিনাই পাহাড় ; এস্থানে হজরত মুসা 'তওরাত' গ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

৩। বালাদুল আমিন—'শান্তিময় নগর'—এই বাক্যাংশ দ্বারা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) জন্মভূমি মক্কা নগরীকে বুঝায়।

উক্ত তিনটি পাক স্থানের নামে উপরোক্ত নবীগণের স্মরণার্থ আল্লাহ্‌তায়ালা শপথ করিয়া মানবগণকে এই সাবধান-বাণী জানাইতেছেন যে, তিনি আদেশ-প্রদাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (আদেশ-প্রদাতা)।

সুরা ইনশেরাহ [২২]

এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ৮টি আয়াত, ২৭টি শব্দ ও ১০৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—খাদিজা বিবির মৃত্যুর পর হজরত সাতিশয় মর্মাহত ও চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে উক্ত শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এই সুরা নাজেল হয়। এবাদত-বন্দেগি ও কোর-আনে তোমাকে উল্লেখ করিয়া এবং তোমার গুরুতর দায়িত্ব পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া তোমাকে মহিমান্বিত করি নাই কি? ইত্যাদি শানে-নজুলের মর্ম।

—(তফসীরে কবীর)

সুরা দ্বোহা [২৩]

এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১১টি আয়াত, ৪০টি শব্দ ও ১৬৬টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরতের নিকট কোনো কারণে কয়েকদিন (কাহারো মতে ১০, কাহারো মতে ১৫, কাহারো মতে ৪০ দিন) অহি নাজেল না হওয়ায় কাফেরেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছিল—মোহাম্মদকে (দ.) তাঁর আল্লা পরিত্যাগ

করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হজরত দুঃখে মর্মাহত হন, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা লায়ল [২৪]

এই সুরা মক্কাতে নাজেল হয়। ইহাতে ২১টি আয়াত, ৭১টি শব্দ ও ৩১৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—আবুবকর (রা.) ও দ্বিতীয় খালাফের পুত্র ওমাইয়া মক্কায় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত সমাজ-নেতা ছিলেন। ওমাইয়া ১২টি কিঙ্কর দ্বারা নানা উপায়ে বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। পরকালের জন্য কেন তিনি দান করেন না? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন—প্রয়াসী বিপুল অর্থ সম্পদ থাকিতে কল্পিত বেহেশতের সম্পদ লাভের আশায় আমি নাই। ইনিই হজরত বেলালের মনিব ছিলেন। ওমাইয়ার গৃহে রাত্রে ক্রন্দনের শব্দ শ্রবণ করিয়া হজরত আবুবকর স্বীয় ক্রীতদাস নাস্তাশ ও ৪০টি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বেলালকে ক্রয় করিয়া হজরতের সামনে নিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করেন।

অতএব, আবুবকর ও ওমাইয়া সম্বন্ধে এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা শামস [২৫]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১৫টি আয়াত, ৫৬টি শব্দ ও ২৫৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কোর-আন শরীফে সাধারণত আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের যুক্তির সাহায্যে কোনো একটা সত্য প্রতিষ্ঠা ও সপ্রমাণ করার বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সুরায় সূর্য, চন্দ্র ও দিবারাত্রি প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা উহাদের তারতম্য বুঝানো হইয়াছে ; আর কোন্ কার্য দ্বারা মানুষ আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে এবং কোন্ কার্য করিলে মানুষের আত্মা কলুষিত ও জীবন ব্যর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 'সমুদ' জাতির এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া—'খোদাতায়ালা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন, যাহাকে ইচ্ছা গোমরাহ্ করেন'—এই উক্তি উপরোক্ত সুরা দ্বারা খণ্ডন করা হইয়াছে।

সুরা বালাদ [২৬]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ২০টি আয়াত, ৮২টি শব্দ ও ৩৪৭টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কালদা নামক বলিষ্ঠ কাফেরকে হজরত মোহাম্মদ (দ.) ইসলাম গ্রহণ করিতে বলায় সে অবজ্ঞাভরে বলিয়াছিল যে, দোজখের ১৯ জন ফেরেশতাকে সে একা বাম হস্তে অবরোধ করিতে পারিবে ; বেহেশতের বাগিচা, নহর ও মণিকাঞ্চনের মূল্য তাহার বিবাহাদি উৎসবে ব্যয়িত অর্থের তুল্য হইতে পারে না। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা ফজর [২৭]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৩০টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ ও ৫৮৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—এক সময় কাফেররা বলিতে লাগিল যে, মানুষের ভালোমন্দ কার্যের প্রতিফল প্রদান করা আল্লার অভিপ্রেত নহে। যদি তিনি পাপীর প্রতি অসন্তুষ্ট ও পুণ্যবানের প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন তবে কেয়ামতের প্রতীক্ষা না করিয়া ইহ-জগতেই কেন সৎলোকদিগকে সম্পদশালী ও অসৎ লোকদিগকে বিপদগ্রস্ত করেন না? পরলোক মিথ্যা, ইত্যাদি। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা গ্বাশিয়া [২৮]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৬টি আয়াত, ৯৩টি শব্দ ও ৩৮৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মানুষ পরজীবনে কর্মফল ভোগ করিবে, আরবেরা ইহা বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত, মানুষ একবার মরিয়া মাটি হইয়া গেলে পুনর্জীবন লাভ করিবে কি করিয়া? এই সুরায় মেঘমালার দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লার কুদ্‌রতে সব কিছু সম্ভব, অনন্ত শক্তিময় আল্লার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করিয়া এই জীবনের কর্মফল ভোগ করাইবেন। মানুষ এই জীবনে দুষ্কর্ম করিলে পরজীবনে তাহার সাজা পাইবে, আর এই জীবনে সৎকর্ম করিলে পরজীবনে তাহার পুরস্কার পাইবে। মানুষের কোনো কর্মই বৃথা হইবে না, ইহা বুঝাইবার জন্যই এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আ'লা [২৯]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টি আয়াত, ৭২টি শব্দ ও ২৯৯টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—যখন হজরতের প্রতি সুদীর্ঘ সুরাসমূহ নাজেল হইতে থাকে এবং তিনি অসংখ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে

থাকেন, তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উপস্থিত হয় যে, আমি কোনো শিক্ষকের নিকট লেখাপড়া শিখি নাই, এমতাবস্থায় এত অধিক সংখ্যক শব্দ ও সূক্ষ্ম মর্ম আয়ত্ত করা ও স্মরণ রাখা সম্ভব হইবে না, হয়তো ইহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ এই সুরা অবতীর্ণ হয়—'খোদাই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনি উহা ভুলিবার কল্পনাও করিবেন না।'

সুরা তারেক [৩০]

এই সুরা মক্কা শরীফে নাজেল হয়। ইহাতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি শব্দ ও ২৫৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা রাত্রিতে হজরতের গৃহে তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেব উপস্থিত হইলে পর, তাঁহার সামনে আহারের নিমিত্ত রুটি ও দুগ্ধ হাজির করা হয়। তাঁহারা উভয়ে যখন খাদ্য গ্রহণে রত তখন একটি উল্কাপিণ্ডের জ্যোতিতে ঐ গৃহ উদ্ভাসিত হইয়া ঐ জ্যোতিতে আবু তালেবের চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হইয়া গেল। ব্যস্ততা-সহকারে ভোজন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহা কি? হজরত বলিলেন—শয়তানেরা যখন আসমানের গুপ্ত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত উড্ডীয়মান হয়, তখন ফেরেশতারা উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করে। আবু তালেব বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা বুরুজ [৩১]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি শব্দ ও ৪৭৫টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—মক্কার পৌত্তলিকেরা মুসলমানগণকে ইসলাম গ্রহণ করার দরুন নানা প্রকার উৎপীড়ন করিত। হজরতের নিকট মুসলমানগণ অভিযোগ করায় তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এক সময় তাহাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে খোদা তাহাদিগকে সক্ষম করিবেন। এ-কথা শ্রবণ করিয়া কাফেররা বলিতে লাগিল—এরূপ দুর্বল, অপমানিত ও অর্থহীন লোকেরা কিরূপে প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে? খোদার ইচ্ছাতেই আমরা সম্মানিত আর তাহারা হেয় ও লাঞ্ছিত। কাফেরদের উক্ত কথার প্রত্যুত্তরস্বরূপ ঐ সময় এই সুরা অবতীর্ণ হয়। অগ্নিকুণ্ড

স্থাপয়িতাদের পরিণাম বর্ণনা করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীদিগকে ইহাতে সান্ত্বনা প্রদান করা হইয়াছে।

—(আজিজী)

সুরা ইনশিকাক [৩২] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৫টি আয়াত, ১০৮টি শব্দ ও ৪৪৮টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের সময় মানুষের যে ভীষণ অবস্থা হইবে তাহার বর্ণনা ও পুনর্জীবন লাভের কথা এই সুরায় প্রকটিত হইয়াছে। কেয়ামত ও পুনর্জীবন লাভের কথা ভাবিয়া মানুষ যাহাতে সৎকর্ম সম্পাদন করে এই উদ্দেশ্যেই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা তাৎফীফ [৩৩] এই সুরা মক্কায় কি মদীনায় নাজেল হয় এ-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৩৬টি আয়াত, ১৭২টি শব্দ ও ৭৫৮টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত মদিনায় পদার্পণ করিয়া দেখিলেন যে, উক্ত স্থানের অধিবাসীগণ পরিমাণ ও ওজনে কম-বেশি করিয়া থাকে, তখন এই সুরা নাজেল হয়।

মক্কায় এই সুরা প্রথম নাজেল হইয়াছিল। হজরত মদিনায় যাওয়ার পর সেখানে ইহা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

সুরা ইনফিতার [৩৪] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ১৯টি আয়াত, ৮০টি শব্দ ও ৩৩৪টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামতের ভীষণ অবস্থার বর্ণনা ও মানুষকে যে তাহার কর্মফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে তাহা এই সুরায় প্রতিপাদ্য বিষয়। পরজীবনে সুফল পাইবার জন্য মানুষ যেন সৎকর্ম করে আর কুকর্মের ফল পরজীবনে যন্ত্রণাদায়ক হইবে ভাবিয়া যেন (এ জীবনে) কুকর্ম হইতে বিরত থাকে—এই উদ্দেশ্যেই এই সুরা নাজেল হইয়াছে।

সুরা তকভীর [৩৫] এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি শব্দ ও ৪৩৬টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—কেয়ামত, পরকাল ও কর্মফল ভোগের কথা যখন হজরত মোহাম্মদ (দ.) বলিতেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁহাকে পাগল বলিত। কেয়ামতের ভীষণ ধ্বংসলীলা ও

আল্লার শক্তির বর্ণনা দ্বারা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া সৎকর্ম করিবার তাকিদ দিবার নিমিত্ত এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা আবাস [৩৬]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৩২টি আয়াত, ১৩৩টি শব্দ ও ৫৫৩টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—একদা হজরত কোরেশ সম্প্রদায়ের ওৎবা, আবু জাহেল, আব্বাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ইসলামের দিকে এই আশায় আহ্বান করিতেছিলেন যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। সেই সময় আবদুল্লাহ-এবনে-ওম্মে মকতুম নামক জনৈক অন্ধ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে কোরান শিক্ষা দিবার জন্য হজরতকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে বলে। সে হজরতের কথোপকথনে বাধা প্রদান করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া হজরত মুখ বিমর্ষ করিয়াছিলেন। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

সুরা নাজেয়াত [৩৭]

এই সুরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪৬টি আয়াত, ১৮১টি শব্দ ৮৯১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—অনন্ত শক্তিময় আল্লার শক্তির কথা আর পরকাল ও পুনর্জীবন প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা মানুষকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে,—মানুষ যেন নিজের মনকে নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সুখ-লালসার নিমিত্ত যেন পরকালের অনন্ত জীবনের অনন্ত সুখের পথ বিনষ্ট না করে। পরকালের প্রতি লক্ষ্য রাখার ইঙ্গিত দিবার জন্যই এই সুরা অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুরা নাবা [৩৮]

এই সুরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে ৪০টি আয়াত, ১৭৪টি শব্দ ও ৮০১টি অক্ষর আছে।

শানে-নজুল—হজরত প্রথম যে সময় লোকদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিয়া কোরান শুনাইতেন ও কেয়ামতের ভীতিপ্রদ সংবাদ বর্ণনা করিতেন সেই সময়ে বিধর্মীরা তাঁহার প্রেরিতত্ব, কোরান ও কেয়ামত সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিত, আর একে অপরের নিকট ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। তখন এই সুরা নাজেল হয়।

বন-গীতি

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলা-বিদ
আমার গানের ওস্তাদ
জমীরউদ্দিন খান সাহেবের
দস্ত মোবারকে—

তুমি বাদশাহ গানের তখ্‌ত্‌ নশীন,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজনু প্রেম-রঙিন।
কণ্ঠে তোমার স্রোতস্বতীর উছল—গীতি,
বিহগ-কাকলি, গন্ধর্ব্ব-লোকের স্মৃতি।
সাগরে জোয়ার সম তব তান শান্ত উদার,
হৃদয়ের বেলাভূমে নিশিদিন ধ্বনি শুনি তার।
খেলায় তোমার সুরগুলি পোষা পাখির মতো
মুক্ত-পক্ষ চঞ্চল-গতি লীলা-রত।
বীণার বেদনা বেণুর আকুতি তোমার সুরে,
ব্যথা-হত ভোলে ব্যথা তার, সুখী ব্যথায় ঝুরে।
সুর-শা'জাদির প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর 'বন-গীতি' নজরানা দিয়া দস্ত চুমি।

কলিকাতা
১লা আশ্বিন
১৩৩৯

নজরুল ইসলাম

১

তিলক-কামোদ—রূপক

ভালোবাসার ছলে আমায়
তোমার নামে গান গাওয়ালে।
চাঁদের মতন সুদূর থেকে
সাগরে মোর দোল খাওয়ালে॥

কাননে মোর ফুল ফুটিয়ে
উড়ে গেলে গানের পাখি,
যুগে যুগে আমায় তুমি
এমনি করে পথ চাওয়ালে॥

আঁকি তোমার কতই ছবি,
তোমায় কতই নামে ডাকি,
পালিয়ে বেড়াও, তাই তো তোমায়
রেখার সুরে ধরে রাখি।

মানসী মোর! কোথায় কবে
আমার ঘরের বধূ হবে,
লোক হতে গো লোকান্তরে
সেই আশে তরী বাওয়ালে॥

২

তিলং-খাম্বাজ মিশ্র—তাল ফেরতা

কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল।
টগর যূথি বেলা মালতী
চাঁপা গোলাব বকুল।
নার্গিস ইরানি গুল॥

আমার যৌবন-বাগানে
হাওয়া লেগেছে ফুল জাগানে,
চলে যেতে ঢলে পড়ি,
খুলে পড়ে এলো চুল॥
তনু মন আকুল, আঁখি ঢুলু ঢুল॥

ফুটেছে এত ফুল, ফুল-মালী কই,
গাঁথিবে মালা কবে, সেই আশে রই,
সে মালা দিব কারে, ভেবে সারা হই,
সহিতে পারি না এ ফুল-ঝামেলা
চামেলা পারুল॥

৩

কানাড়া মিশ্র—কাওয়ালি

পেয়ে আমি হারিয়েছি গো
আমার বুকের হারামণি।
গানের প্রদীপ জ্বেলে তারেই
খুঁজে ফিরি দিন-রজনী॥
সে ছিল গো মধ্যমণি
আমার মনের মণি-মালায়,
রেখেছিলাম লুকিয়ে তায়
মানিক যেমন রাখে ফণী॥
স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে সে মোর
এসেছিল দগ্ধ বুকে,
অসীম আঁধার হাতড়ে ফিরি
খুঁজি তারি রূপ লাবণী॥
হারিয়ে যে যায় হায় কেন সে
যায় হারিয়ে চিরতরে,
মিলন-বেলাভূমে বাজে
বিরহেরই রোদন-ধ্বনি॥

৪

কাজরী-কার্ফা

সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া।
নামিল মেঘলা মোর বাদরিয়া॥
চল কদম তমাল তলে গাহি কাজরিয়া
চল লো গোরী শ্যামলিয়া॥

বাদল-পরিরা নাচে গগন-আঙিনায়,
ঝমাঝম বৃষ্টি-নূপুর পায়
শোনো ঝমাঝম বৃষ্টি নূপুর পায়।
এ হিয়া মেঘ হেরিয়া ওঠে মাতিয়া॥

মেঘ-বেণীতে বেঁধে বিজলী-জরিন ফিতা
গাহিব দুলে দুলে শাওন-গীতি কবিতা,
শুনিব বঁধুর বাঁশি বন-হরিণী চকিতা,
দয়িত-বুকে হব বাদল-রাতে দয়িতা।
পর মেঘ-নীল শাড়ি ধানী-রঙের চুনরিয়া,
কাজলে মাজি লহ আঁখিয়া॥

৫

কাফি—ঝাঁপতাল

যায় ঢুলে ঢুলে এলোচুলে
কে বিষাদিনী।
তার চোখে চেয়ে ম্লান হয়ে
যায় গো চাঁদিনী॥

তার সোনার অঙ্গ অনাদরে
হয়েছে কালি,
হায় ধুলায় লুটায় নবীন যৌবন
ফুলের ডালি,
কোন মদির আঁখির খেয়েছে তীর
বন-হরিণী॥

তার চটুল চরণ নাচত যেন
নোটন-কপোতী,
মরুর বুকে ফুল ফোটাত
তার দোদুল গতি,
আজ ধীরে সে যায় যেন শীতের
মৃদুল তটিনী॥

৬

পিলু—দাদরা

যমুনা-সিনানে চলে
তন্বী মরাল-গামিনী।
লুটায়ে লুটায়ে পড়ে
পায়ে বকুল কামিনী॥

মধু বায়ে অঞ্চল
দোলে অতি চঞ্চল,
কালো কেশে আলো মেখে
খেলিছে মেঘ দামিনী॥

তাহারি পরশ চাহি
তটিনী চলেছে বাহি,
তনুর তীর্থে তারি
আসে দিবা ও যামিনী॥

৭

গ্রাম্য সঙ্গীত

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা,
পাখি সে নয় নাচে কালো আঁখি।

আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখি লো,
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকি॥

সেদিন তুলতে গেলাম
দুপুর বেলা
কলমি শাক ঢোলা ঢোলা
হল না আর সখি লো শাক তোলা
আমার মনে পড়িল সখি,
ঢলঢল তার চটুল আঁখি,
ব্যথায় ভরে উঠলো বুকের তলা।

ঘরে ফেরার পথে দেখি,
নীল শালুক সুঁদি ওকি ফুটে আছে
ঝিলের গহীন জলে।
আমার অমনি পড়িল মনে
সেই ডাগর আঁখি লো,
ঝিলের জলে চোখের জলে
হলো মাখামাখি॥

৮

গজল-গান

আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন
দীল্ ওঁহি মেরা ফঁস্ গয়ি।
বিনোদ বেণীর জরিন ফিতায়
আন্ধা এশ্‌ক মেরা কস্ গয়ি॥

তোমার কেশের গন্ধে কখন
লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন
বেহুশ হো কর্ গির পড়ি হাথ্‌মে
বাজু বন্দ্‌মে বস্ গয়ি॥

কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিঁধিয়া
আঁখ ফেরা দিয়া চোরা কর্ নিদিয়া,
দেহের দেউরিতে বেড়াতে আসিয়া
আউর নেহিঁ উয়ো ওয়াপস্ গয়ি॥

৯

বাউল–লোফা

পথ–ভোলা কোন রাখাল ছেলে।
সে একলা বাটে শূন্য মাঠে
খেলে বেড়ায় বাঁশি ফেলে॥

কভু সাঁঝ গগনে উদাস মনে
চাহিয়া হেরে গো কারে,
হেরে তারার উদয়, কভু চেয়ে রয়
সুদূর বন–কিনারে।
হেরে সাঁঝের পাখি ফিরে গো যখন
নীড়ের পানে পাখা মেলে॥

তার ধেনু ফিরে যায় গ্রামের পানে
আনমনে সে বসিয়া থাকে,
ঐ সন্ধ্যাতারার দীপ যে জ্বালায়
সে যেন কোথায় দেখছে তাকে।
তার নূপুর লুটায় পথের ধুলায়
সে ফিরে নাহি চায় কাহারে খোঁজে,
দূর চাঁদের ভেলায় মেঘ–পরি যায়
সে যেন তাহার ইশারা বোঝে।
সে চির–উদাসী পথে ফেরে হায়
সকল সুখে আগুন জ্বেলে॥

১০

পিলু-বারোঁয়া—আদ্ধা কাওয়ালি

কোকিল, সাধিলি কি বাদ।
নিশি অবসান হল
না মিটিতে সাধা॥

মিলনের মোহ কেন,
ডাকিয়া ভাঙিলি হেন,
তুই রে সতিনী যেন
চন্দ্রাবলীর ফাঁদ॥

সারা নিশি অভিমানে
চাহিনি শ্যামের পানে,
জেগে দেখি কুহু-তানে—
নাহি শ্যাম চাঁদ॥

ননদিনী কুটিলা কি
পাঠায়েছে তোরে পাখি,
সুখের বাসরে ডাকি
আনিলি বিষাদ॥

১১

গজল

পিলু খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা

পানসে জোছনাতে কে চল গো পানসী বেয়ে।
ঢেউ এর তালে তালে বাঁশিতে গজল গেয়ে॥
মেঘের ফাঁকে ফোটে বাঁকা শশীর চিকন হাসি,
উজান বেয়ে চল তুমি কি তার চোখে চেয়ে॥

ও-পারে লুকায়ে আঁধার গভীর ঘন বন-ছায়,
আকাশে হেলান দিয়ে আলসে পাহাড় ঘুমায়।

ঘুমায়ে দূরে সে কোন গ্রাম বাসরে পল্লি-বধূর প্রায় ;
ও-পারে ধু ধু বালুচর যেন নদীর আঁচল লুটায় !
ছাড়ি এ সুখ-বাস চলেছ কোথায় গো নেয়ে॥

নদীর দুতীরে টানে বেতস-লতা উত্তরীয়,
চমকি উঠি চখী ডাকে মুহু মুহু 'কিও !'
চকোরী চাঁদে ভুলি চাহে তব মুখ পানে,
কেঁদে পাপিয়া শুধায়, 'পিউ কাঁহা, কাঁহা পিও।'
তুমি যাও আপন-বিভোল স্বপনে নয়ন ছেয়ে॥

১২

মাঢ়—কার্ফা

ঝলমল জরিন বেণী
দুলায়ে প্রিয়া কি এলে।
সজল শাওন-মেঘে
কাজল নয়ন মেলে॥
কেয়া ফুলের পরিমল
ঝুরে মরে তোমার পথে,
হেরি দীঘল তব তনু
তাল পিয়াল তরু পড়ে হেলে॥
পরিবে বলিয়া খোঁপায়
ঝুরিছে বকুল চাঁপা,
তোমারে খুঁজিছে আকাশ
চাঁদের প্রদীপ জ্বেলে॥
তোমারি লাবণী প্রিয়া
ঝরিছে শ্যামল মেঘে,
ফুটালে ফুল মরুভূমে
চঞ্চল চরণ ফেলে॥

১৩

গজল

জংলা—কার্ফা

কোন বন হতে করেছ চুরি হরিণ-আঁখি (গো ঐ)
যেন আননে বেঁধেছ বাসা কানন-পাখি (ভীরু)॥

চুরি করা ঐ নয়ন কি তাই ভয় এত চোখে।
নীল সাগর বলে, 'ডাগর ও চোখ আমারি নাকি'॥

চিরকালের বিজয়িনী ও উজল নয়নে,
(তুমি) দু ধারী তলোয়ার রেখেছ জহর মাখি॥

পুড়িল মদন তোমারি ঐ চোখের দাহে,
সে গেছে তোমার ঐ চোখে তার ফুল-বাণ রাখি॥

১৪

গজল

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

নিশীথ হয়ে আসে ভোর
বিদায় দেহ প্রিয় মোর।
রজনীগন্ধার বনে হের
গুঞ্জরিছে ভ্রমর॥
হের ঐ তন্দ্রা-ঢুল ঢুল
জড়ায়ে হাতে এলো চুল,
বধূ যায় সিনান-ঘাটে
পথে লুটায় বসন আকুল॥
খোল খোল বাহুর মালা,
মোছ মোছ প্রিয়া আঁখি।
শোন কুঞ্জ-দ্বারে তব কুহু
মুহু মুহু ওঠে ডাকি॥

হের লো, শিয়রে তব
প্রদীপ হয়ে এল ম্লান,
দাঁড়াল রাঙা উষা ঐ
রঙের সাগরে করি স্নান
আকাশ-অলিন্দে কাঁদে
পাণ্ডুর-কপোল শশী,
শুকতারা নিবু-নিবু ঐ
মলয়া ওঠে উছসি
কাঁদে রাতের আঁধার
মোর বুকে মুখ রাখি ৷৷

১৫

পিলু-খাম্বাজ—কার্ফা

কেমনে কহি প্রিয়
কি ব্যথা প্রাণে বাজে।
কহিতে গিয়ে কেন
ফিরিয়া আসি লাজে ৷৷

শরমে মরমে মরে
গেল বন-ফুল ঝরে
ভীরু মোর ভালবাসা
শুকাল মনের মাঝে।

আগুন লুকায়ে বুকে
জ্বলিয়া মরি যে দুখে,
ভুলিয়া রয়েছ সুখে,
তুমি ত আপন কাজে।

আজিকে ঝরার আগে
নিলাজ অনুরাগে
ধরিতে যে সাধ জাগে
হৃদয়ে হৃদয়-রাজে ৷৷

১৬

স্বদেশী গান

নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম
চির-মনোরম চির-মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর॥

শিয়রে গিরি-রাজ হিমালয় প্রহরী
আশিস-মেঘবারি সদা তার পড়ে ঝরি,
যেন উমার চেয়ে এ আদরিণী মেয়ে,
ওড়ে আকাশ ছেয়ে মেঘ চিকুর॥

গ্রীষ্মে নাচে বামা কাল-বোশেখী ঝড়ে,
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙে-পড়ে,
শরতে হেসে চলে শেফালিকা-তলে
গাহিয়া আগমনী- গীতি বিধুর॥

হরিত অঞ্চল হেমন্তে দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির-ভেজা পায়ে,
শীতের অলস বেলা পাতা ঝরার খেলা
ফাগুনে পরে সাজ ফুল-বধূর॥

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে,
যে রস যে সুধা নাহি ভূমণ্ডলে,
এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাব এই বুকে স্বপ্নাতুর॥

১৭

গারা মিশ্র-দাদ্‌রা

প্রিয় যাই যাই বলো না,
না না না।
আর করো না ছলনা,
না না না॥

আজো মুকুলিকা মোর হিয়া মাঝে
না-বলা কত কথা বাজে,
অভিমানে লাজে বলা যে হলা না॥

কেন শরমে বাঁধিল কে জানে,
আঁখি তুলিতে নারিনু আঁখি-পানে।
প্রথম প্রণয়-ভীরু কিশোরী
যত অনুরাগ তত লাজে মরি,
এত আশা সাধ চরণে দলো না॥

১৮

স্বদেশী গান

ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী
মুক্ত আলোকে জাগো!
কবে সে ঘুমালি মরণ-ঘুমে মা
আর জাগিলি না গো॥

চরণে কাঁদে মা তেমনি জলধি,
বক্ষ আঁকড়ি কাঁদে নদ নদী,
ত্রিশ কোটি সন্তান নিরবধি
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥

শূন্য দেউল বন্ধ আরতি,
কাঁদিছে পূজারী, নাহি মা মুরতি,
পূজার কুসুম চন্দন যায়
আঁখি-জলে—ভাসিয়া মা গো॥

যে তিতিক্ষা যে শিক্ষা লয়ে,
অতীতে ছিলি মা রাজরানী হয়ে,
লয়ে সে মহিমা পুন নির্ভয়ে
বিশ্ব-বুকে দাঁড়া গো॥

বিশ্বের এই খল কোলাহলে
তুই আয় কল্যাণ-দীপ জ্বেলে,
বিরোধের শেষে তুই শান্তি মা
মৃত্যুশেষে সুধা গো॥

১৯

বেহাগ—খাম্বাজ

রুমু ঝুম ঝুম্
রুমু ঝুমু বাজে নূপুর।
আলে তালে দোদুল দোলে
নাচের নেশায় চুর॥

চঞ্চল বায়ে আঁচল উড়ায়ে
চপল পায়ে, ও কে যায়
নটিনী কল-তটিনীর প্রায়,
চিনি বিদেশিনী চিনি গো তায়,
শুনি ছন্দ তারি ঐ হিয়া ভরপুর॥

নাচন শিখালে ময়ূর মরালে,
মরীচি-মায়া মরুতে ছড়ালে,
বন-মৃগের মন হেসে ভুলালে,
ডাগর আঁখির নাচে সাগর দুলালে;
গিরি-দরী বনে গো
দোল লাগে নাচনের
শুনে তার সুর॥

২০

গ্রাম্য সঙ্গীত

পদ্মদীঘির ধারে ঐ
সখি লো কমল-দীঘির ধারে।
আমি জল নিতে যাই
সকাল সাঁঝে সই,

সখি, ছল করে সে মাছ ধরে
আর চায় সে বারে বারে॥

মাছ ধরে সে, বড়শী আমার
বুকে এসে বেঁধে,
ওলো সই বুকে এসে বেঁধে,
আর চোখের জলে কলসি আমার সই
আমি ভরাই কেঁদে কেঁদে
সই দেখি যত তারে॥

ছিপ নিয়ে যায় মাছ জলে তার
তাকায় না তার পানে,
মন ধরে না—মীন ধরে সে
সখি লো সেই জানে।
মন-ভিখারি মীন-শিকারী
মুখের পানে চায়,
সখি লো চোখের পানে চায়,
আমি বড়শী-বেঁধা মাছের মত গো
সখি, ছুটিয়া মরি হায় অকূল পাথারে॥

২১

গজল

যোগিয়া মিশ্র—কার্ফা

দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর।
এত দিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর॥

জীবনে যারে চাহনি
ঘুমাইতে দাও তাহারে,
মরণ-পারে ভেঙো না
ভেঙো না তাহার ঘুম-ঘোর॥

দিতে এসে ফুল কেঁদো না প্রিয়
মোর সমাধি-পাশে,
ঝরিল যে ফুল অনাদরে হায়—
নয়ন-জলে বাঁচিবে না সে।
সমাধি-পাষাণ নহে গো
তোমার সমান কঠোর॥

কত আশা সাধ মিশে যায় মাটির সনে,
মুকুলে ঝরে কত ফুল কীটের দহনে।
কেন অ-সময়ে আসিলে,
ফিরে যাও, মোছ আঁখি-লোর॥

২২

বেহাগ মান্দ—কার্ফা

কে এলে মোর চির-চেনা
অতিথি দ্বারে মম।
ফুলের বুকে মধুর মত
পরাগে সুবাস সম॥

বর্ষা-শেষে চাঁদের মতন
উদয় তোমার নীরব গোপন,
জ্যোৎস্না-ধারায় নিখিল ভুবন
ছাইয়া অনুপম॥

হৃদয় বলে, চিনি চিনি
আঁখি বলে, দেখিনি তায়,
মন বলে, প্রিয়তম॥

২৩

ভজন

ভীম পলশ্রী—কার্ফা

দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার
ঘনশ্যাম তোমারি নয়নে॥

আমি হেরি যে নিখিল বিশ্বরূপ—
সম্ভার তোমারি নয়নে॥

তুমি পলকে ধর নাথ সংহার-বেশ,
হও পলকে করুণা-নিদান পরমেশ,
নাথ ভস্ম যেন বিষ অমৃতের ভাণ্ডার
তোমার দুই নয়নে॥

ওগো মহা-শিশু, তব খেলা ঘরে
এ কি বিরাট সৃষ্টি বিহার করে,
সংসার চক্ষে তুমিই হে নাথ,
সংসার তোমারি নয়নে॥

তুমি নিমেষে রচি নব বিশ্বছবি
ফেল নিমেষে মুছিয়া হে মহা কবি,
করে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভুবন-সঞ্চার
তোমারি নয়নে॥

তুমি ব্যাপক বিশ্ব চরাচরে
জড় জীবজন্তু নারী নরে,
কর কমল-লোচন, তোমার রূপ বিস্তার হে
আমার নয়নে॥

২৪

পিলু—কার্ফা

এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে।
মেলিয়া পাখা নীল গগনে॥

একা কিশোরী লাজ বিসরি
তোমারে স্মরি সঙ্গোপনে,
এস গোধূলির রাঙা লগনে॥

পাতার আসন শাখায় পাতা,
বালিকা কলির মালিকা গাঁথা,
দিনু গন্ধ-লিপি ভোর পবনে॥

২৫

ভজন

মেঘ—তেতালা

হে বিধাতা !
দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে,
কাঁদায়ে জননী-প্রায় কোলে কর পুনরায়
শান্তি-দাতা,
হে বিধাতা।।

ভুলিয়া যাই হে যবে সুখ-দিনে তোমারে
স্মরণ করায়ে দাও আঘাতের মাঝারে,
দুঃখের মাঝে তাই হে প্রভু তোমারে পাই
দুঃখ-ত্রাতা,
হে বিধাতা।।

দারা-সুত-পরিজন-রূপে প্রভু অনুখন,
তোমার আমার মাঝে আড়াল করে সৃজন ;
তুমি যবে চাহ মোরে লও হে তাদের হরে
ছিঁড়ে দিয়ে মায়া-ডোরে ক্রোড়ে ধর আপন।
ভক্ত সে প্রহ্লাদ ডাকে যবে নারায়ণ
নির্মম হয়ে তার পিতারও হর জীবন,
সব যবে ছেড়ে যায় দেখি তব বুকে হায়
আসন পাতা।
হে বিধাতা।।

২৬

ভীম পলশ্রী মিশ্র—দাদরা

পাষাণের ভাঙালে ঘুম
কে তুমি সোনার ছোঁওয়ায়।
গলিয়া সুরের তুষার
গীতি-নির্ঝর বয়ে যায়।।

উদাসীন বিবাগী মন
যাচে আজ বাহুর বাঁধন,

কত জনমের কাঁদন
ও-পায়ে লুটাতে চায়॥

তোমার চরণ-ছন্দে মোর
মুঞ্জরিল গানের মুকুল,
তোমার বেণীর বন্ধে গো
মরিতে চায় সুরের বকুল।
চমকে ওঠে মোর গগন
ঐ হরিণ-চোখের চাওয়ায়॥

২৭

হাম্বীর—তেতালা

বলো না বলো না ওলো সই
আর সে কথা।
ভোমরা চপল-মতি
ফিরে সে যথা তথা॥

তরু কি লতার কাছে
এসে কভু প্রেম যাচে,
তরু বিনা নাহি বাঁচে
অসহায় লতা॥

ভুলিতে যার নাই তুলনা,
সখি তার কথা তুলো না,
প্রাণহীন পাষাণে গড়া
সে যে দেবতা॥

২৮

ইমনকল্যাণ—কাওয়ালি

মরম-কথা গেল সই মরমে মরে।
শরম বারণ যেন করিল চরণ ধরে॥

ছল করে কতো শত
সে মম রুধিত পথ,
লাজ ভয়ে পলায়েছি
সে ফিরেছে ব্যথাহত,
অনাদরে প্রেম-কুসুম গিয়াছে মরে॥

কতো যুগ মোর আশে বসে ছিল পথ-পাশে,
কতো কথা কতো গান জানায়েছে ভালোবেসে
শেষে অভিমানে নিরাশে গিয়াছে সরে॥

২৯

ঝিঁঝিট—একতালা

এস হৃদি-রাস-মন্দিরে এসো
হে রাস-বিহারী কালা।
মম নয়নের পাতে রাখিয়াছি গেঁথে
অশ্রু-যূথির মালা॥

আমার কাঁদন-যমুনার নদী
ভারি-টানে শুধু বহে নিরবধি,
তারে বাঁশরির তানে বহাও উজানে
ভোলাও বিরহ-জ্বালা॥

আমি ত্যাজিয়াছি কবে লাজ মান কুল
বহি কলঙ্ক এসেছি গোকুল,
আমি ভুলিয়াছি ঘর শ্যাম নটবর
করো মোরে ব্রজ বালা॥

৩০

পাহাড়ী—তেতালা

যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলী সখি বাজিল।
মাধব নিকুঞ্জ-চারী শ্যাম বুঝি আসে—
কদম্ব তমাল নব-পল্লবে সাজিল॥

ময়ূর তমাল-তলে পেখম খোলে,
ব্যাকুলা গোপ-বালা শুনিয়া সে তান,
যুগ যুগ ধরি যেন শ্যাম
বাঁশরি বাজায় গো,
বাঁশিতে শ্যাম মোরে যাচিল ॥

৩১

বাগেশ্রী-সিন্ধু—কাহারবা

কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু
হে ফুল-দেবতা লহ প্রণাম।
বিটপী লতায় চিকন পাতা,
ছিটাও হাসি কিশোর শ্যাম ॥

পূজার থালা এ অর্ঘ্য-ডালা
এনেছি দিতে তোমার পায়,
দেহ শুভ বর কুসুম-সুন্দর
হউক নিখিল নয়নাভিরাম ॥

এ বিশ্ব বিপুল কুসুম-দেউল
হউক তোমার ফুল-কিশোর !
মুরলী করে এসো গোলক-বিহারী
হউক ভূলোক আনন্দ-ধাম ॥

৩২

ভজন

পাহাড়ী—কার্ফা

কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান
সে যে রে তোরি মাঝারে রয়।
চেয়ে দেখ সে তোরি মাঝারে রয়।

সাজিয়া যোগী ও দরবেশ
খুঁজিস যারে পাহাড়-জঙ্গলময়
সে যে রে তোরি মাঝে রয়॥

আঁখি খোল ইচ্ছা-অন্ধের দল
নিজেরে দেখ রে আয়নাতে,
দেখিবি তোরই এই দেহে,
নিরাকার তাঁহার পরিচয়॥

ভাবিস তুই ক্ষুদ্র কলেবর
ইহাতেই অসীম নীলাম্বর,
এ দেহের আধারে গোপন
রহে রে বিশ্ব চরাচর,
প্রাণে তোর প্রাণের ঠাকুর
বেহেশতে স্বর্গে কোথাও নয়॥

এই তোর মন্দির মসজিদ
এই তোর কাশী বৃন্দাবন,
আপনার পানে ফিরে চল
কোথা তুই তীর্থে যাবি, মন !
এই তোর মক্কা মদিনা,
জগন্নাথ-ক্ষেত্র এই হৃদয়॥

৩৩

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

মেরো না আমারে আর নয়ন-বাণে
কি জ্বালা ব্যাধের বাণে
বনের হরিণই জানে॥

একে এ পরান দহে
মদির ও-আঁখির মোহে
চাহনির যাদু মাখা তায়।

জ্বলিছে আলেয়া শিখা
নয়ন-জলের মরীচিকা
পিয়াসী পথিক ছোটে হায়
তাহারি টানে।।

তব রূপের সায়রে ও-নয়ন
শাপলা সুঁদির ফুল,
তুলিতে গিয়া ডুবিল
শত সে পথিক বেভুল

সুন্দর ফণীর শিরে
ও যেন যুগল মণি,
যে গেল সে মণির মায়ায়,
তারে দংশিল অমনি।

শত সে হৃদয়-নদী
কেঁদে যায় নিরবধি,
সাগর-ডাগর ও-আঁখির পানে।।

৩৪

বেহাগ খাম্বাজ—দাদরা

হেলে দুলে নীর ভরণে ও কে যায়।
ছল করে কলসি নাচায় (কিশোরী)।।

দুলে দোদুল তনু-লতা, বাহু দোলে,
দুলে অঞ্চল চঞ্চল বায়।
দুলে বেণী, দুলে চাবি আঁচলায়।।

নাচে জল-তরঙ্গে তটিনী রঙ্গে
জলদ দাদরা বাজায়।
মম পরান নূপুর হতে চায় (তার পায়)।।

৩৫

জংলা—দাদরা

বনে মোর ফুটেছে হেনা চামেলি
যুঁথি বেলি।
এসো এসো কুসুম-সুকুমার
শীতের মায়া-কুহেলি অবহেলি॥

পরানে দেয় দোলা দেয় দোলা দেয় দোলা
উতল দখিনা হাওয়া,
কোকিল কুহরে কুহু কহু স্বরে,
মদির স্বপন-ছাওয়া।
হাসে গীত-চঞ্চল জোছনা-উজ্জ্বল
মাধবী রাতে
এসো এসো যৌবন-সাথী
ফুল-কিশোর, চিতচোর, দেবতা মোর!
মম লাজ অবগুণ্ঠন ঠেলি॥

৩৬

চাষানীর গান

ঝুমুর—কার্ফা

ও দুখের বন্ধু রে, ছেড়ে কোথায় গেলি।
ছেড়ে কোথায় গেলি রে বন্ধু, একলা ঘরে ফেলি॥
আমায় গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে,
আমি ভুলতে তবু নারি তোরে রে,
আমি লবণ দিতে পান্তা ভাতে হলুদ দিয়ে ফেলি॥

তোর লাঙল তোর কাস্তে নিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াই মাঠে গিয়ে,
আমার চোখের জলে মাঠ ভেসে যায়
তুই তবু কই এলি॥

তেল মেখে কি গায়ে তোরা
পিরীতি করিস মনোচোরা,

ধরিতে কি না ধরিতে
যাস রে পিছলি॥

৩৭

চাষার গান

বাউল—কার্ফা

আমি ডুরি-ছেঁড়া ঘুড়ির মতন
চলছি উড়ে প্রাণ সই।
ছুটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ঝড়-বাতাসে
পড়ব কোথায় কেমনে কই॥

তোর থেকে লো চলে এসে
আমার বুকের পাঁজরা গেছে খসে,
সেই ভাঙা বুকের খাপরা ভরে
কূল কাঠেরি আগুন বই॥

কাঁদিয়ে তোরে ও প্রেয়সী,
তোরও চেয়ে কাঁদছি বেশি,
আমার পাকা ধানের ক্ষেতে আমি
আপন হাতে দিলাম মই॥

তোর কাঁদনের গাঙের তীরে
আমি নৌকা বেয়ে আসব ফিরে,
তুই ভেজে রাকিস দুখের তাতে
মন-আখাতে প্রেমের খই॥

৩৮

ডুয়েট-গান

পুরুষ॥ তুমি ফুল আমি সুতো গাঁথিব মালা॥
স্ত্রী॥ তাহে মোরেই সহিতে হবে সূচীর জ্বালা॥
পু॥ দুলিবে গলে মোর বুকের পরে,
স্ত্রী॥ ফেলে দিবে বাসি হলে নিশি-ভোরে,
আমি বন-কুসুম ঝরি বনে নিরালা॥

পু॥ তব কুঞ্জ-গলি
আসে দখিন-হাওয়া,
আসে চপল অলি।
স্ত্রী॥ তারা রূপ-পিয়াসী
তারা ছিঁড়ে না কলি।
তারা বনের বাহিরে মোরে নেবেনা কালা॥
পু॥ তবে চলিয়া যাই আমি নিরাশা লয়ে,
স্ত্রী॥ না, না, থাক বুকে শিশির হয়ে,
তব প্রেমে করিব আমি বন উজালা॥

৩৯

ডুয়েট গান

পুরুষ॥ মন নিয়ে আমি লুকোচুরি-খেলা খেলি প্রিয়ে।
স্ত্রী॥ ধরিতে পারি না পেতে তাই প্রেম-ফাঁদ
আমি মেঘ তুমি চাঁদ, ফের গো কাঁদিয়ে॥
পু॥ মন্দ বায় আমি গন্ধ লুটি শুধু
চাইলে আমি সে মধু,
স্ত্রী॥ চাইনে চাইনে, বঁধু।
তাহে নাই সুখ নাই,
আমি পরশ যে চাই।
পু॥ স্বপন-কুমার ফিরি যে আমি
মন ভুলিয়ে॥
উভয়ে॥ চল তবে যাই মোরা স্বপ্নের দেশে
জোছনায় ভেসে
নন্দন-পারিজাত ফুল ফুটিয়ে॥

৪০

ডুয়েট গান

উভয়ে॥ ভালোবাসায় বাঁধব বাসা
আমরা দুটি মানিক-জোড়।
থাকব বাঁধা পাখায় পাখায়
মাখামাখি প্রেম-বিভোর॥

পু॥ আমার বুকে যত মধু
স্ত্রী॥ আমার বুকে ঢালবে বঁধু !
পু॥ আমি কাঁদব যখন দুখে
স্ত্রী॥ আমি মুছাব সে নয়ন-লোর॥
পু॥ আমি যদি কভু মনের ভুলে,
তোমায় প্রিয়া থাকি ভুলে,
স্ত্রী॥ আমি রইব তাতেই
ফুলের মালায় লুকিয়ে
যেমন থাকে ডোর॥

৪১

ভজন

মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে
দূর দ্বারকায় বৃন্দাবনে।
মোর মন হতে চায় ব্রজের রাখাল
খেলতে রাখাল-রাজার সনে॥

রূপ ধরে না বিশ্বে যাহার
দেখতে যায় সাধ কিশোর-রূপ তার,
কেমন মানায় নরের রূপে
অনন্ত সেই নারায়ণে॥

সাজত কেমন শিখী-পাখা
বাজত কেমন নূপুর পায়ে,
থির কেমন থাকত ধরা
নাচত যখন তমাল-ছায়ে।
মা যশোদা বাঁধত যখন
কাঁদত ভগবান কেমনে॥

বাজাত সে বেণু যখন
উঠত না কি বিশ্ব কেঁপে,

ছড়িয়ে যেত সে সুর কোথায়
আকাশ গ্রহ তারা ছেপে।
রাধার সনে ছুটত না কি
পাগল নিখিল বাঁশির স্বনে॥

তারে সাজত কেমন বন-মালায়
বিশ্ব যাহার অর্ঘ্য সাজায় ;
যোগী-ঋষি পায় না ধ্যানে
গোপ-বালা কেমনে পায়।
তেমনি করে কালার প্রেমে
সব খোয়াবো এই জীবনে॥

৪২

ভজন
মান্দ—কার্ফা

চিরদিন কাহারো সমান ন্যাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়॥

অবতার শ্রীরাম যে জানকীর পতি
তারো হল বনবাস রাবণ-করে দুর্গতি।
আগুনেও পুড়িল না ললাটের লেখা হায়॥

স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব, সখা কৃষ্ণ ভগবান,
দুঃশাসন করে তবু দ্রৌপদীর অপমান।
পুত্র তার হল হত যদুপতি যার সহায়॥

মহারাজ শ্রীহরিশ্চন্দ্র রাজ্যদান করে শেষ
শ্মশান-রক্ষী হয়ে লভিল চণ্ডাল বেশ।
বিষ্ণু-বুকে চরণ-চিহ্ন, ললাট-লেখা কে খণ্ডায়॥

৪৩

কীর্তন—মিশ্র

দেখে যা তোরা নদীয়ায়।
গোরার রূপে এল ব্রজের শ্যামরায়॥
মুখে হরি হরি বলে
হেলে দুলে নেচে চলে,
নরনারী প্রেমে গলে
চলে পড়ে রাঙা পায়॥

ব্রজে নুপুর পরি নাচিত এমনি হরি,
কুল ভুলিয়া সবে ছুটিত এমনি করি।
শচী মাতার রূপে কাঁদে মা যশোদা,
বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে কাঁদে কিশোরী রাধা।
নহে নিমাই নিতাই, ও যে কানাই বলাই,
শ্রীদাম-সুদাম এলো জগাই-মাধাই-এ হায়॥

অসি নাই বাঁশি নাই, এবার শূন্য হাতে।
এসেছে ভুবন ভুলাতে।
লীলা-পাগল এল প্রেমে মাতাতে,
ডুবু ডুবু নদীয়া, বিশ্ব ভাসিয়া যায়॥

৪৪

ঝুমুর—খেমটা

কালা এত ভাল কি হে কদম্ব গাছের তলা।
আমি দেখছি কত দেখব কত তোমার ছলা কলা॥

আমি জল নিতে যাই যমুনাতে
তুমি বাজাও বাঁশি হে,
মনের ভুলে কলস ফেলে
তোমার কাছে আসি হে,
শ্যাম দিন-দুপুরে গোকুলপুরে দায় হলো যে চলা॥

আমার চারিদিকেতে ননদ সতীন দুকূল রাখা ভার,
আমি সইব কত আর,
ওরা লুকিয়ে হাসে দেখে মোদের
গোপন লীলার ছলা॥

৪৫

বিভাষ মিশ্র—একতালা

জবাকুসুম-সঙ্কাশ
ঐ উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয়
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

জননীর সম স্নেহ-সজল
নীল গাঢ় গগন-তল,
সুপেয় বারি প্রসূন ফল
তব দান অক্ষয়।
অপহৃত সংশয়
জয় হে জ্যোতির্ময়॥

৪৬

ভৈরবী—কার্ফা

মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোঠ-চারী
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি।
গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি হে,
পাপ-তাপ-দুখ-হারী॥ উ

কালরূপ কভু দৈত্য-নিধনে,
চিকন কালা কভু বিহর বনে,
কভু বাজাও বেণু, খেল ধেনু-সনে,
কভু বামে রাধা প্যারী,
গোপ-নারী মনোহারি,
নিকুঞ্জ-লীলা-বিহারী॥

কুরুক্ষেত্র-রণে পাণ্ডব-মিতা,
কণ্ঠে অভয় বাণী ভগবদ-গীতা,
হে পূর্ণ ভগবান পরম পিতা,
শঙ্খ-চক্র-গদাধারী,
পাপ-তারী, কাণ্ডারী
ত্রিভুবন সৃজনকারী॥

৪৭

আশাবরী—দাদরা

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন।
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন॥

আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে,
শিশু রবি শশী দোলে,
মায়ের একটুখানি রূপের ঝলক,
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন॥

পাগলী মেয়ে এলোকেশী
নিশীথিনীর দুলিয়ে কেশ
নেচে বেড়ায় দিনের চিতায়
লীলার রে তার নাই কো শেষ।

সিন্ধুতে ঐ বিন্দুখানিক
তার ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না
মা আমার তাই দিগ-বসন॥

৪৮

সিন্ধুকাফি—যৎ

শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে
(তাই) মাঠে ঘাটে বেড়াস ধেয়ে।
তুই কোন দুখে এই ভেক নিলি মা
থাকতে নিখিল ছেলে-মেয়ে॥

হেম কৈলাসে তোর আগুন জ্বালি'
গৌরী মেয়ে সাজলি কালি,
তুই অন্নপূর্ণা নাম ভুলিলি
ভূতনাথের সঙ্গ পেয়ে॥

ডুগডুগি ঐ বাজায় মহেশ
ক্ষ্যাপা বেটা গাঁজা খেয়ে,
তাই দেখে তুই চণ্ডী সেজে
ক্ষেপে গেলি হাবা মেয়ে।

রাজার মেয়ের এ কি খেয়াল
মেরে বেড়াস অসুর-শেয়াল,
তুই দানব ধরে বাঁদর নাচাস
কাজ নাই তোর খেয়ে-দেয়ে॥

৪৯

সরস্বতী-বন্দনা

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী।
জয় বিশ্ব-লোক-বিহারিণী॥

সৃজন-আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্র দল কিরণ বিথারি
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি
মানস-মরাল-বাহিনী॥
ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি
ছিন্ন-চরণ শতদলরাজি
কহিছে বিষাদ-কাহিনী॥

উঠ মা আবার কমলাসীনা
করে ধর পুন সে রুদ্র বীণা,
নব সুর তানে বাণী দীনাহীনা
জাগাও অমৃত-ভাষিণী॥

৫০

ভৈরবী-একতালা

রোদনে তোর বোধন বাজে
আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী।
আমরা যে তোর মানব-ছেলে
আমরা তো মা দানব নই॥

তোর মাথায় গেছে রক্ত চড়ে
তাই পা রেখেছিস শিবের 'পরে,
স্বামীকে তুই মা চিনতে নারিস
চিনবি ছেলেয় কেমনে কই॥

তোর বাবা যেমন অটল পাষাণ
তেমনি অটল তোরও কি প্রাণ!

তুই সব খেয়েছিস সকল-খাগী,
এবার শুধু ভিক্ষা মাগি—
তোর আপন ছেলের মাথা খা তুই
মোরাও দুঃখ-মুক্ত হই॥

৫১

বাউল—খেমটা

তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি।
দাও ব্যথা যতই, তোমায় ততই নিবিড় করে ধরি
আমি ভয় করি কি হরি॥

আমি শূন্য করে তোমার ঝুলি
দুঃখ নেব বক্ষে তুলি,
আমি করব দুখের অবসান আজ
সকল দুঃখ বরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

তুমি তুলে দিয়ে সুখের দেয়াল
ছিলে আমার প্রাণের আড়াল,
আজ আড়াল ভেঙে দাঁড়ালে মোর
সকল শূন্য ভরি।
আমি ভয় করি কি হরি॥

৫২

ভীম পলশ্রী—মধ্যমান

ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু
তুমি যোগ শিখাইতে এলে।
কানন-পথে শ্যাম যে প্রেম-বাণী
মধুকর-করে পাঠালে,
হে গুরু, কি যোগ আমি শিখিব তা ফেলে।
তুমি যোগ শিখাইতে এলে॥

৫৩

বাগেশ্রী—একতালা

আর লুকাবি কোথায় মা কালী।
আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ডুবালি॥

আমার সুখের গৃহ শ্মশান করে
বেড়াস মা তায় আগুন জ্বালি,
আমায় দুঃখ দেওয়ার ছলে মা তোর
ভুবন-ভরা রূপ দেখালি॥

আমি পূজা করে পাইনি তোরে
এবার চোখের জলে এলি,
আমার বুকের ব্যথায় আসন পাতা
বস মা সেবা দুখ-দুলালী॥

৫৪

কীর্তন—ভাঙা

ওমা ফিরে এলে কানাই মোদের
এবার ছেড়ে দিসনে তায়।
তোর সাথে সব রাখাল মিলে
বাঁধব সে ননী-চোরায়॥

তারে তুই যখন মা রাখতিস বেঁধে,
ছাড়ায়েছি কেঁদে, কেঁদে,
তখন জানত কে, যে, খুললে বাঁধন
পালিয়ে যাবে মথুরায়॥

এবার আমরা এসে ডাকলে শ্যামে
গোঠে যেতে দিসনে তায়।
ঐ পথে অক্রূর মুনির সাথে
পালিয়ে যাবে শ্যামরায়॥

মোরা কেউ যাব না বনে মা আর
খেলব তোর এই আঙিনায়,
শুধু খেলব লুকোচুরি লো
আগলাতে চোরের রাজায়॥

৫৫

বাউল—কার্ফা

পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশি।
হলো বিশ্ব-রাধা ঐ সুরে উদাসী॥

শুনে ঐ রাখালের বেণু
ছুটে আসে আলোক-ধেনু,
ঐ নীল গগনে রাঙা মেঘে
ওড়ে গোখুর-রেণু,
আসে শ্যাম-পিয়ারী গোপ-ঝিয়ারি
গ্রহ-তারার রাশি॥

সেই বাঁশির অন্বেষণে
যত মন-বধূ ধায় বনে,
তাদের প্রেম-যমুনায় বান ডেকে যায়
কূল খোয়ায় গোপনে।
তারা রাস-দেউলে রসের
বাউল আনন্দ-ব্রজবাসী॥

৫৬

ভজন

('আরে দাতা শোন' সুর)

ও মন চল অকূল পানে
মাতি হরিপ্রেম-গুণগানে।
নদী যেমন ধায় অকূলে
কূল যত তায় টানে॥

তুই কোন পাহাড়ে ঠেকলি এসে
কোন পাথারের জল,
হরির প্রেমে গলে এবার
সেই অসীমে চল,
তুই স্রোতের বেগে দুলবি রে
কূল বাধা যদি হানে॥

কুলু কূল কুলুকুলু হরিগুণ-গান
গাইবি অবিরল,
আর দুই কূলে প্রেম-ফুল ফুটায়ে
করবি রে শ্যামল,
যত তাপিত প্রাণ হবে শীতল
তোর জলে সিনানে॥

এ পারের সব যাত্রী যাবে
তোর বুকে ওপারে,
তোর কূলে শ্যাম বাজিয়ে বাঁশি
আসবে অভিসারে,
তুই শ্যামের ছবি ধরবি বুকে
মাতবি প্রেম-তুফানে॥

৫৭

মান্দ্‌—কার্ফা

এস মুরলীধারী বৃন্দাবন-চারী
গোপাল গিরিধারী শ্যাম।
তেমনি যমুনা বিগলিত-করুণা,
কুলু কুলু কুলু-স্বরে ডাকে অবিরাম॥

কোথায় গোকুল-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ
চাহিয়া পথ-পানে ধরণী সতৃষ্ণ,
ডাকে মা যশোদায় নীলমণি
আয় আয় ডেকে যায় নন্দ শ্রীদাম॥

ডাকে প্রেম-সাধিকা আজো শত রাধিকা
গোপ-কোঙারি,
এস নওল-কিশোর কুল-লাজ-মান-চোর
ব্রজ-বিহারী!
পরি সেই পীতধরা, সেই বাঁকা শিখী-চূড়া
বাজায়ে বেণু
আরবার এস গোঠে, খেল সেই ছায়া-বটে,
চরাও ধেনু।
কদম তমাল-ছায়ে এস নূপুর পায়ে
ললিত বঙ্কিম ঠাম॥

৫৮

খাম্বাজ—কাওয়ালি

নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে
মন-গোকুলে রুনুঝুনু বোলে॥
কূলের বাঁধন টুটে
যমুনা উথলি উঠে,
পুলকে কদম ফোটে,
পেখম খোলে
শিখী পেখম খোলে॥

ব্রজনারী কুল ভুলে
লুটায় সে পদমূলে,
চোখে জল, বুকে
প্রেম-তরঙ্গ দোলে॥

শ্রীমতী রাধার সাথে
বিশ্ব ছুটিছে পথে,
হরি হরি বলে মাতে
ত্রিভুবন ভোলে॥

৫৯

বেহাগ—একতালা

হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ চরণে-শরণ দাও হে।
বিফল জনম কাটিল কাঁদিয়া, শান্তি নাহি কোথাও হে॥

জীবন-প্রভাত কাটিল খেলায়,
দুপুর ফুরাল মোহের মেলায়,
ডাকিব যে নাথ সন্ধ্যা-বেলায়
ডাকিতে পারিনি তাও হে॥

এসেছি দুঃখ-জীর্ণ পথিক মৃত্যু-গহন রাতে
কিছু নাই প্রভু সম্বল, শুধু জল আছে আঁখি-পাতে।
সন্তান তব বিপথগামী
ফিরিয়া এসেছে হে জীবন-স্বামী
পাপী তাপী তবু সন্তান আমি
ধুলা মুছে কোলে নাও হে॥

৬০

কীর্তন—ভাঙা

ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
আর কতকাল রবি মথুরায়।

তোর শ্যামলী ধবলী কাঁদে তৃণ ফেলি,
বারে বারে পথে ফিরে চায়॥

রাখাল-সাথীরে ফেলি কোথা আজ
রাজ্য পেয়েছ, হে রাখাল-রাজ!
তোর ফেলে-যাওয়া বাঁশি
নিয়ে যারে আসি
মোরা আঁখি-জলে ভাসি দেখে তায়॥

তুই শিখী-পাখা ফেলে মুকুট মাথায়
দিয়েছিস নাকি, শুনে হাসি পায়!
তুই পীত-ধড়া ছেড়ে রাজ-বেশে ভাই
সেজেছিস নাকি, মোদের কানাই!
তুই অসি ফেলে নেচে আয় হেসে দুলে,
নূপুর পরিয়া রাঙা পায়।
ফিরে আয় ননী-চোর ব্রজের কিশোর
মা বলে ডাক যশোদায়॥

৬১

গান

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার আসিলে কি এতদিনে?
বাজালে দুপুরে বিদায়-পূরবী আমার জীবন-বীণে!
ভয় নাই রানি, রেখে গেনু শুধু চোখের জলের লেখা,
রাতের এ লেখা শুকাবে প্রভাতে, চলে যাব আমি একা!

*　　　*　　　*

দিনের আলোকে ভুলিও তোমার রাতের দুঃস্বপন,
ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথাহতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা ভুলিতে কতক্ষণ?

৬২

তিলক-কামোদ—আদ্ধা কাওয়ালি

রাখ রাখ রাঙা পায়
হে শ্যামরায় !
ভুলে গৃহ স্বজন সবাই সঁপেছি তোমায়॥
সংসার মরু ঘোর; নাহি তরু ছায়া,
নব নীরদ শ্যাম আনো মেঘ-মায়া,
আনন্দ-নীপবনে নন্দ-দুলাল এস
বহাও উজান হরি অশ্রুর যমুনায়॥

একা জীবন মোর গহন বন ঘোর
এস এ বনে বনমালি গোপ-কিশোর,
কুঞ্জ রচেছি দুখ-শোক-তমাল-ছায়।
প্রেম-প্রীতির গোপী-চন্দন শুকায়ে যায়॥

দারা সুত প্রিয়জন, হরি হে নাহি চাই,
পদ্ম-পলাশ-আঁখি যদি দেখিতে পাই।
রাখাল-রাজা এস, এস হে হৃষিকেশ,
গোকুলে লহ ডাকি, অকূলে ভাসি, হায়॥

৬৩

কীর্তন—মিশ্র

মোরে সেইরূপে দেখা দাও হে হরি।
তুমি ব্রজের বালারে রাই কিশোরীরে
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি॥

হরি বাজায়ো বাঁশরি সেই সাথে,
যে বাঁশি শুনিয়া ধেনু গোঠে যেত
উজান বহিত যমুনাতে।
যে নূপুর শুনে ময়ূর নাচিত
এস হে সেই নূপুর পরি॥

নন্দ-যশোদা কোলে গোপাল
যে রূপে খেলিতে, ক্ষীর ননী খেতে,
এস সেই রূপে ব্রজ-দুলাল।
যে পীত-বসনে কদম-তলায় নাচিতে
এস সে বাস পরি'॥
কংসে বধিলে যে রূপে শ্যাম
কুরুক্ষেত্রে হইলে সারথি
এস সেইরূপে এ ধরাধাম।
যে রূপে গাহিলে গীতা নারায়ণ,
এস সে বিরাট রূপ ধরি॥

৬৪

ভৈরবী—দাদরা

হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি গত নিশি।
নিশি-শেষে চাঁদ—পূর্ণিমা চাঁদ—
গেলে মিশি,
গত নিশি॥

নয়ন মুদি কুমুদী ঐ—
কাঁদে প্রিয় কই,
পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা,
দশ দিশি।
গত নিশি॥

৬৫

ভজন

ভৈরবী—কাওয়ালি

রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন-পতি
তব পদে মতি (রাখ)।

আঁখির আগে যেন সদা জাগে
তব ধ্রুব-জ্যোতি॥

সংসার মরু-মাঝে তুমি মেঘ-মায়া,
বিষাদ-শোক-তাপে তুমি তরু-ছায়া,
সান্ত্বনা-দাতা তুমি দুঃখ-ত্রাতা
অগতির গতি॥

দোলে কালো নিশার কোলে
আলো-উষসী,
তিমির-তলে তব তিলক জ্বলে
ঐ পূর্ণ শশী।
ঝঞ্ঝার মাঝে তব বিষাণ বাজে,
সহসা ঢলি পড়' বনে ফুল-সাজে,
কোমলে কঠোরে হে প্রভু বিরাজে
(তব) মহিমা শকতি॥

৬৬

দুর্গা—দাদরা

প্রণমি তোমায় বন-দেবতা।
শাখে শাখে শুনি তব ফুল-বারতা॥

তোমার ময়ূর তোমার হরিণ
লীলা-সাথী রয় নিশিদিন,
বিলায় ছায়া বাণী-বিহীন
তরু ও লতা॥

গুল্‌-বাগিচা

উৎসর্গ-পত্র

('স্বদেশী মেগাফোন-রেকর্ড কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী)

আমার অন্তরতম বন্ধু

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ

অভিন্নহৃদয়েষু—

বন্ধু! আমারে বাঁধিয়াছ তুমি অশেষ ঋণে,
দুঃসময়ের দুর্যোগ-রাতে দারুণ দিনে।
তোমার করুণা নির্ঝরিণীর স্রোতের সম
নামিয়া এসেছে রৌদ্র-দগ্ধ মরুতে মম।
কে জানে, কোথায় তুমি মোর সাথী বন্ধু ছিলে,
আত্মার আত্মীয়রূপে তাই ধরা কি দিলে?
বিরাট তোমার প্রাণের ছায়ায় জুড়াতে পেয়ে
ঘুমন্ত মোর গানের বিহগ উঠেছে গেয়ে
তেমনি করিয়া, গাহিত যেমন প্রথম প্রাতে ;—
দেবতার ছোঁওয়া পেয়েছি তোমার উষ্ণ হাতে।
তুমি যোগী, আমি বিয়োগ-বিধুর, আজ দু'জনে
যোগ-বিয়োগের মিলন ঘটালে শুভক্ষণে।
বিত্ত তোমার রোধিতে পারেনি চিত্ত-গতি,
পর্বত-বাধা ভেঙে চলে যেন স্রোতস্বতী।
রৌপ্য হয়েছে রূপের কমল পরশে তব,
আড়াল করিতে পারেনি তোমারে তব বিভব।
গানের সওদা করিতে আসিয়া তোমার দেশে,
ওগো অপরূপ সদাগর, প্রাণ দিয়াছি হেসে!
দিয়াছ অনেক, চাহনি কিছুই, করনি হিসাব ;
বে-হিসাবী কথা কহি হর্দম, আমারো স্বভাব।
মিলিয়াছি ভালো বে-হিসাবী দুই বন্ধু মোরা,
গীতালির দেশে মিতালি মোদের স্বপ্নে ভরা। ...
দেবতার ঋণ শুধিতে কি পারে মানুষ কভু?
'গুল-বাগিচা'র পুষ্পাঞ্জলি দিলাম তবু।

কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩৩৯

সখ্য-ধন্য
নজরুল ইসলাম

দু'টি কথা

দুই চারিটি ছাড়া 'গুল-বাগিচা'র সমস্ত গানগুলি 'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানী রেকর্ড করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অনুগ্রহের জন্য আমি অশেষ ঋণে ঋণী।

'গুল-বাগিচা'য় ঠুংরী, গজল, দাদ্‌রা, চৈতী, কাজরী, স্বদেশী, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ইসলামী ধর্ম-সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর গান দেওয়া হইল। আমার সৌভাগ্যবশত ইহার প্রায় সমস্ত গানগুলিই ইতিমধ্যে লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

সুর-শিল্পী শ্রীমান জ্ঞান দত্ত ও শ্রীকামাখ্যা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এই গানগুলি আর্টিস্টদের শিখাইবার সময় যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। ইহারা আমার অনুজ-প্রতিম, আশীর্বাদ করি, ইহাদের সঙ্গীত-সাধনা সফল হউক।

'গ্রেট ইস্টার্ণ লাইব্রেরি'র কর্তৃপক্ষকে ইহার বহির্সৌষ্ঠবের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কবি শ্রীমান খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন 'গুল-বাগিচা'র প্রুফ ও অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব না, তিনি আমার পরম স্নেহভাজন।

আমার অন্যান্য গানের বই-এর মত 'গুল-বাগিচা' ও সমাদর লাভ করিবে—আশা করি। ইতি

বিনীত
নজরুল ইসলাম

গুল্‌-বাগিচা

১

সিন্ধু-কাফি—লাউনী

গুল্‌-বাগিচার বুলবুলি আমি
রঙিন প্রেমের গাই গজল !
অনুরাগের লাল শারাব মোর
চোখে ঝলে ঝলমল ॥

আমার গানের মদির ছোঁওয়ায়
গোলাপ কুঁড়ির ঘুম টুটে যায়,
সে গান শুনে প্রেম-দীওয়ানা
কবির আঁখি ছলছল ॥

লাল শিরাজীর গেলাস হাতে তন্বী সাকি পড়ে ঢুলে,
আমার গানে মিঠা পানির লহর বহে নহর-কূলে।
ফুটে ওঠে আনার-কলি
নাচে ভ্রমর রঙ-পাগল ॥

সে-সুর শুনে দিশাহারা
ঝিমায় গগন ঝিমায় তারা,
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা
বনের চোখে শিশির-জল ॥

২

মিশ্র-পিলু—দাদ্রা

সোনার মেয়ে ! সোনার মেয়ে !
তোমার রূপের মায়ায় আমার

নয়ন ভুবন গেল ছেয়ে॥
ঝরে তোমার রূপের ধারা—
চন্দ্র জাগে তন্দ্রাহারা,
আকাশ-ভরা হাজার তারা
তোমার মুখে আছে চেয়ে॥

কোন গ্রহ-লোক ব্যথায় ভরে
কোন অমরা শূন্য করে
রাখলে চরণ ধরার পরে
রঙ-সাগরের রঙে নেয়ে॥

শিল্পী আঁকে তোমার ছবি,
তোমারি গান গাহে কবি,
নিশীথিনী হারিয়ে রবি
চাঁদ হাতে পায় তোমায় পেয়ে॥

৩

মাঢ়—লাউনী

বকুল চাঁপার বনে কে মোর
চাঁদের স্বপন জাগালে।
অনুরাগের সোনার রঙে
হৃদয়-গগন রাঙালে॥

ঘুমিয়ে ছিলাম কুমুদ-কুঁড়ি
বিজন ঝিলের নীল জলে,
পূর্ণ শশী তুমি আসি
আমার সে ঘুম ভাঙালে॥

হে মায়াবী! তোমার ছোঁওয়ায়
সুন্দর আজ আমার তনু।
তোমার মায়া রচিল মোর
বাদল-মেঘে ইন্দ্রধনু॥

তোমার টানে, হে দরদী,
দোল খেয়ে যায় কাঁদন-নদী,
কূল-হারা মোর ভালবাসা আজকে কূলে লাগালে।।

৪

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

আঁখি-বারি আঁখিতে থাক, থাক ব্যথা হৃদয়ে।
হারানো মোর বুকের প্রিয়া রইবে চোখে জল হয়ে।।
নিশি-শেষে স্বপন-প্রায়
নিলে তুমি চির-বিদায়,
ব্যথাও যদি না থাকে হায়,
বাঁচিব গো কি লয়ে।।

ভালোবাসার অপরাধে
প্রেমিক জনম জনম কাঁদে,
কুসুমে কীট বাসা বাঁধে
শত বাধা প্রণয়ে।।

আজকে শুধু করুণ গীতে
কাঁদিতে দাও দাও কাঁদিতে,
আমার কাঁদন-নদীর স্রোতে
বিরহের বাঁধ যাক ক্ষয়ে।।

৫

মাঢ় মিশ্র—লাউনী

ভুল করে কোন ফুল-বিতানে
গানের পাখি পথ হারালি।
প্রেম-সমাধির বুকে এ-যে
সাজানো ম্লান ফুলের ডালি।।

বাণ-বেঁধা বুক লয়ে কোথায়
উড়ে এলি শান্তি-আশায়,
চোখের জলের নদীর পাশেই
রয় নিরাশার চোরা-বালি॥

জানিসনে তুই ফুলের বনে
কাল-সাপিনী রয় গোপনে,
তৃষ্ণা-কাতর হৃদয়ে তোর
বিষের জ্বালা দিলি ঢালি॥

আলেয়ারই আলোয় ভুলে
এলি এ-কোন মরণ-কূলে,
হৃদয়ের এ শ্মশান-ভূমে
প্রেমের চিতা জ্বলছে খালি॥

৬

বারোয়াঁ মিশ্র—কার্ফা

পথ চলিতে যদি চকিতে
কভু দেখা হয়, পরান-প্রিয় !
চাহিতে যেমন আগের দিনে
তেমনি মদির-চোখে চাহিও॥

যদি গো সেদিন চোখে আসে জল,
লুকাতে সে-জল করিও না ছল,
যে-প্রিয় নামে ডাকিতে মোরে
সে-নাম ধরে বারেক ডাকিও॥

তোমার বঁধু পাশে যদি রয়,
মোর-ও প্রিয় সে, করিও না ভয়,
কহিত তারে, 'আমার প্রিয়ারে
আমারো অধিক ভালোবাসিও॥'

বিরহ-বিধুর মোরে হেরিয়া,
ব্যথা যদি পাও, যাব সরিয়া,
রব না হয়ে পথের কাঁটা,
মাগিব এ বর—মোরে ভুলিও॥

৭

পিলু খাম্বাজ—কার্ফা

কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়
মুখের হাসি চোখের জলে মরে যায়॥

নিশীথে যে কাঁদিল গলা ধরে
নিশি-ভোরে সে কেন হায় সরে যায়॥

আজ যাহার প্রেম করে গো রাজাধিরাজ
কাল কেন সে চির-কাঙাল করে যায়॥

হায়, অভিমান খেলার ছলে
ফেরে না আর যে যায় চলে,
মিলন-মালা মলিন ধুলায় ক'রে যায়॥

৮

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে।
তবু মুখপানে প্রিয় চাহ আঁখি তুলে॥
দেখি সে-দিনের সম
ভুলে-যাওয়া স্মৃতি মম
তব ও-নয়নে আজো ওঠে কি না দুলে॥

আসিয়াছি ভুল ক'রে, জানি ভুলেছ তুমিও,
ক্ষণেকের তরে তবু এ ভুল ভেঙো না প্রিয়,
তীর্থে এসেছি মোর দেবীর দেউলে॥

তোমার মাধবী-রাতে
আসিনি আমি কাঁদাতে,
কাঁদিতে এসেছি একা বিদায়-নদীর কূলে॥

৯

ভীম পলশ্রী—কার্ফা

কত কথা ছিল বলিবার, বলা হলো না।
বুকে পাষাণ সম রহিল তারি বেদনা॥

মনে রহিল মনের পিপাসা,
মিটিল না প্রাণের আশা,
বুকে শুকালো বুকের ভাষা
মুখে এলো না॥

এত চোখের জল এত গান,
এত সোহাগ আদর অভিমান
কখন সে হলো অবসান
বোঝা গেল না॥

ঝরিল কুসুম যদি হায়,
কেন স্মৃতির কাঁটাও নাহি যায়,
বুঝিল না কেহ কারো মন
বিধির ছলনা॥

১০

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

বুকে তোমায় নাই বা পেলাম
রইবে আমার চোখের জলে।
ওগো বঁধু! তোমার আসন
গভীর ব্যথায় হিয়ার তলে॥

আসবে যখন তিমির রাতি
রইবে না কেউ জাগার সাথী,
আসব সে-দিন জ্বালব বাতি,
মুছব নয়ন-জল আঁচলে॥

নাই বা হলাম প্রিয় তোমার,
বন্ধু হতে দোষ কি বঁধু?
মুখের 'মধু'র তৃষ্ণা শেষে
আমি দিব বুকের মধু।
আমি ভালোবাসিনি তো,
ভালোবাসা পাবার ছলে॥

বাহুর পাশে প্রিয়ায় বেঁধে
আমার তরে উঠবে কেঁদে,
সেই তো আমার জয় গো, প্রিয়,
অন্তরে রই, রই না গলে॥

১১

তিলক-কামোদ মিশ্র—দাদরা

বৃথা তুই কাহার পরে করিস অভিমান।
পাষাণ-প্রতিমা সে-যে হৃদয় পাষাণ।

রূপসীর নয়নে জল নয়ন-শোভার তরে,
ও শুধু মেঘের লীলা নভে যে বাদল ঝরে,
চাতকের তরে তাহার কাঁদে না পরান॥
প্রণয়ের স্বপন-মায়া
ধরিতে মিলায় কায়া,
গো-ধূলির রঙের খেলা ক্ষণে অবসান॥

ফোটে ফুল কানন ভরে,
সে কি তোর মালার তরে?
প্রেমে হায় জোর চলে না, নাহি প্রতিদান॥

১২

পিলু—দাদরা

পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে।
'পিউ পিউ পিউ কাঁহা'
পাপিয়া পিয়া বোলে॥

সে পিয়া পিয়া সুরে
বাদল ঝুরে
নদী-তরঙ্গ দোলে।
কূলে কূলে কুলু কুলু
নদী-তরঙ্গ দোলে॥

ফুটিল দল মেলি
কেতকী বেলি,
শিখী পেখম খোলে।
দুলে দুলে দুলে নেচে
শিখী পেখম খোলে॥

পিয়ায় যারা নাহি পেল হেথায়, তাহারা কি
এসেছে ধরায় পুন হইয়া পাপিয়া পাখি।
দেখিয়া ঘরে ঘরে তরুণীর কালো আঁখি
'পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা' আজিও উঠিছে ডাকি।
পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে॥

১৩

বাগেশ্রী—কার্ফা

চোখের নেশার ভালোবাসা সে কি কভু থাকে গো।
জাগিয়া স্বপনের স্মৃতি স্মরণে কে রাখে গো॥

তোমরা ভোলো গো যারে
চির-তরে ভোলো তারে
মেঘ গেলে ছায়া আর থাকে কি আকাশে গো॥

পুতুল লইয়া খেলা
খেলেছ বালিকা-বেলা,
খেলিছ পরান লয়ে আজো সে পুতুল-খেলা,
ভাঙিছ গড়িছ নিতি হৃদয়-দেবতাকে গো॥

চোখের ভালোবাসা গলে
শেষ হয়ে যায় চোখের জলে,
বুকের ছলনা সে কি আঁখি-জলে ঢাকে গো॥

১৪

ভৈরবী-লাউনী

এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন বুলবুলি আজ
গাইতে এলে গান।
বসন্ত গত মোর আজ পুষ্প-বিহীন
লতিকা-বিতান॥

এলে কি দলিতে আজ ধূলি-ঢাকা
ফুল-সমাধি মোর,
নাহি আর চৈতি হাওয়া, বহে আজি
বৈশাখী তুফান॥

সাজায়ে ফুলের বাসর ছিনু তব পথ চেয়ে,
সে-বাসর বাসি হলো, কেঁদে নিশি হলো অবসান॥

বাজে মোর তোরণ-দ্বারে
খেলা-শেষের বিদায়-বাঁশরী,
ফিরে যাও শেষ-অতিথি,
দাও যেতে দাও লয়ে অভিমান॥

১৫

ভজন

কোন কুসুমে তোমায় আমি
পূজিব নাথ বল বল।
তোমার পূজার কুসুম-ডালা
সাজায় নিতি বনতল॥

কোটি তপন চন্দ্র তারা
খোঁজে যারে তন্দ্রাহারা
খুঁজি তারে লয়ে আমার
ক্ষীণ এ-নয়ন ছলছল॥

বিশ্ব-ভুবন দেউল যাহার
কোথায় রচি মন্দির তাঁর,
লও চরণে ব্যথায়-রাঙা
আমার হৃদয়-শতদল॥

১৬

চৈতী—কার্ফা

পরো পরো চৈতালী-সাঁঝে কুসুমী শাড়ি।
আজি তোমার রূপের সাথে চাঁদের আড়ি॥
পরো ললাটে কাঁচপোকার টিপ,
তুমি আলতা পরো পায়ে হৃদি নিঙাড়ি॥

প্রজাপতির ডানা-ঝরা সোনার টোপাতে,
ভাঙা ভুরু জোড়া দিও রাতুল শোভাতে।
বেল-যূথিকার গোড়ে মালা পরো খোঁপাতে,
দিও উত্তরীয় শিউলি-বোঁটার রঙে ছোপাতে।
রাঙা সাঁঝের সতিনী তুমি রূপ-কুমারী॥

১৭

মালবশ্রী-মিশ্র—দাদ্‌রা

ঝুমকো-লতার চিকণ পাতায়
দেখেছি তোমার লাবণী প্রিয়া।
মহুয়া-ফুলের মদির গন্ধে
তোমারই মুখ-মদের অমিয়া॥

শুকতারায় তব নয়নের মায়া,
তমাল-বনে তারি স্নিগ্ধ ঘন ছায়া,
তাল পিয়ালে হেরি দীঘল তনু তব,
ইহুদী দুল দুলে শশী-লেখায় নব,
ডালিম-দানাতে তব গালের লালী,
তোমারি সুরে গাহে পিয়া পাপিয়া॥

১৮

পিলুকাফি মিশ্র—ঠুমরী

বরষ মাস যায়—সে নাহি আসে,
বরষ মাস যায়।

সখি রে সেই চাঁদ ওঠে নভে
ফুলবনে ফুল ফোটে বৃথায়॥
একা সহি মৌন হৃদয়-ব্যথা,
আমার কাঁদন শুনি
সে মোর যদি ব্যথা পায়॥

মরমর ধ্বনি শুনি পল্লবে চমকিয়া উঠি সখি
ভাবি বুঝি বঁধু মোর আসিল।
যে যায় চলিয়া, চলিয়া সে যায় চিরতরে
ফিরে আর আসে না সে হায়॥

১৯

বারোয়াঁ মিশ্র—কার্ফা

আমার বিজন ঘরে হেসে এলো পথিক মুসাফির-বেশে।
সরমে মরিয়া তারে শুধাই, তরুণ পথিক কি তব চাই।
সে কহে,—যা দাও লইব তাই॥

দিনু তারে খোঁপার ফুল,
সে কহে,—এ নহে, করেছ ভুল।
কহিনু,—ভিখারি কি তবে চাও?
সে কহে,—গলার মালাটি দাও॥

বসিতে তারে দিনু আসন,
দাঁড়ায়ে রহে সে করুণ-নয়ন।
কহিনু,—কি চাহ ওগো শ্যামল?
সে কহে,—তোমার আধেক আঁচল॥

কহিনু,—কেন এ আঁখি-পানে
চাহিয়া রয়েছ এক ধ্যানে?
আমার চোখে কি চাও বঁধু?
সে কহে,—অনুরাগের মধু॥

কহিনু,—হে প্রিয়, নাহি যে ঠাঁই,
ভাঙা কুটির, চাঁদে কোথায় বসাই।
কহিল না কথা অভিমানী—
কি হলো শেষে সই নাহি জানি।
হেরিনু প্রভাতে পাশে মম
ঘুমায় আমার প্রিয়তম॥

২০

খাম্বাজ—দাদরা

ভেঙো না ভেঙো না বঁধু তরুণ চামেলি-শাখা।
ফুলের নজরানা এর অজস্র পাতায় ঢাকা॥

কুঞ্জ-দ্বারে থাকি' থাকি' বৃথা এত ডাকাডাকি,
আজিও এ বনের পাখি ঘুমায় হের গুটিয়ে পাখা॥

অসময়ে যে রসময় ভাঙিয়ো না লতার হৃদয়,
তনুতে এলে অনুরাগ হেরিবে না ফাঁকা ফাঁকা॥

আসছে-ফাগুন-মাসে
আসিও ইহার পাশে,
আজ যে-লতা কয় না কথা, সেদিন তায় যাবে না রাখা॥

২১

দেশী টোড়ি মিশ্র—কার্ফা

আসিলে কে গো বিদেশী
দাঁড়ালে মোর আঙিনাতে।
আঁখিতে লয়ে আঁখি-জল
লইয়া ফুল-মালা হাতে॥

জানি না চিনি না তোমায়,
কেমনে ঘরে দিব ঠাঁই,
অমনি আসে তো সবাই
হাতে ফুল, জল নয়ন-পাতে॥

কত-সে প্রেম-পিয়াসী প্রাণ
চাহিছে তোমার হাতের দান,
কাঁদায়ে কত গুলিস্তাঁন
আমারে এলে কাঁদাতে॥

ফুলে আর ভোলে না মোর মন, গলে না নয়ন-জলে,
ভুলিয়া জীবনে একদিন আজিও জ্বলি জ্বালাতে॥

পাষাণের বুকে নদী বয়, যে পাষাণ সে পাষাণই রয়,
ও শুধু প্রতারণা ছল, নয়নে নীর, নিঠুর হৃদয়।
আমারে মালারি মতন দলিবে নিশি-প্রভাতে॥

২২

ইমন মিশ্র—দাদ্‌রা

এসো বঁধু ফিরে এসো, ভোলো ভোলো অভিমান।
দিব ও-চরণে ডারি মোর তনু মন প্রাণ॥

জানি আমি অপরাধী তাই দিবানিশি কাঁদি,
নিমেষের অপরাধের কবে হবে অবসান॥

ফিরে গেল দ্বারে আসি বাসি কিনা ভালোবাসি,
কাঁদে আজ তব দাসী, তুমি তার হৃদে ধ্যান॥

সে-দিন বালিকা-বধূ সরমে মরম-মধু
পিয়াতে পারিনি বঁধু আজ এসে কর পান॥

ফিরিয়া আসিয়া হেথা দিও দুখ দিও ব্যথা,
সহে না এ নীরবতা হে দেবতা পাষাণ॥

২৩

ভীম পলশ্রী—কার্ফা

নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথী
জ্বলি পিলসুজে একা মোমের বাতি॥

পতঙ্গ সুখী—পুড়ে এক নিমেষে,
পুড়িয়া মরি আমি সারা রাতি॥

আসে যে সুখের দিনে বন্ধুরূপে,
অসময়ে যায় সরে চুপে চুপে।
উড়ে গেছে অলি ফুল ঝরেছে বলি
কাঁদি একাকী কণ্টক-শয্যা পাতি॥

কেহ কারো নয় তবু প্রাণ কাঁদে
চকোর চাহে যেন সুদূর চাঁদে,
শুধু বেদনা পাই প্রেম-মোহে মাতি॥

২৪

তিলক কামোদ মিশ্র—কার্ফা

মাধবী-লতার আজি মিলন সখি
শ্যাম সহকার তরুর সাথে।
আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদের জলসা
হের গো তাই আজি চৈতালী রাতে॥

ফুলে ফুলে তার ফুল্ল তনু-লতা,
গাহিয়া ওঠে পাখি, 'বউ গো কও কথা' ;
স্বর্ণলতার শতনরী হার
দুলিছে গলায় রাতুল শোভাতে॥

তারি আমন্ত্রণ-লিপি থরে থরে
শ্যামল পল্লবে কুসুম-আখরে।
তরুলতা দুলে পুলকে নাচি নাচি,
মিলন-মন্ত্র গাহিছে মৌমাছি,
আলপনা আঁকে আলো ও ছায়াতে॥

২৫

কাজরী—দাদ্‌রা

আজি এ বাদল দিনে
কত কথা মনে পড়ে।
হারাইয়া গেছে প্রিয়া
এমনি বাদল-ঝড়ে॥

আমারি এ বুকে থাকি
ঘুমাত সে ভীরু পাখি,
জলদ উঠিলে ডাকি
লুকাত বুকের পরে॥

মোর বুকে মুখ রাখি নিবিড় তিমির কাঁদে
আমার প্রিয়ার মতো বাঁধিয়া বাহুর বাঁধে।

কোথায় কাহার বুকে
আজি সে ঘুমায় সুখে,
প্রদীপ নিভায়ে কাঁদি
একা ঘরে তারি তরে॥

২৬

দেশ—আদ্ধা কাওয়ালি

বাদল বায়ে মোর নিভিয়া গেছে বাতি।
তোমার ঘরে আজ উৎসবের রাতি॥

তোমার আছে হাসি, আমার আঁখি-জল,
তোমার আছে চাঁদ, আমার মেঘ-দল,
তোমার আছে ঘর, ঝড় আমার সাথী॥

শূন্য করি মোর মনের বন-ভূমি
সেজেছ সেই ফুলে রানীর সাজে তুমি।

নব বাসর-ঘরে
যাও সে সাজ পরে,
ঘুমাতে দাও মোরে কাঁটার শেজ পাতি॥

২৭

পিলু কাফি—দাদরা

মেঘের হিন্দোলা দেয় পূব-হাওয়াতে দোলা।
কে দুলিবি এ-দোলায় আয় আয় ওরে কাজ-ভোলা॥

মেঘ-নটীর নূপুর
ঐ বাজে ঝুমুর ঝুমুর,
শীর্ণা-তনু ঝর্না তরঙ্গ-উতরোলা॥

ফুল-পসারিনী ঐ দুলিছে বনানী,
বিনিমূলে বিলায় সে সুরভি ফুল ছানি।
আজ ঘরে ঘরে ফুল-দোল সব বন্ধ দুয়ার খোলা॥

জলদ্‌-মৃদঙ্গ বাজে
গভীর ঘন আওয়াজে,
বাদলা-নিশীথ দুলে ঐ তিমির-কুন্তলা॥

২৮
তিলং—কার্ফা

সাধ জাগে মনে পর-জীবনে
তব কপোলে যেন তিল হই।

ভালোবাসিয়া মোরে দিল দিবে তুমি
(যেন) আমি তোমার মতো বে-দিল্‌ হই॥

মোর-দেওয়া হার নিলে না অকরুণা,
যেন হয়ে সে হার তব বক্ষে রই॥

যাহারে ভালোবেসে তুমি চাহ না মোরে
মরিয়া আসি যেন তাহারি রূপ ধরে,
তুমি হার মানিবে আমি হব জয়ী॥

হৃদি নিঙাড়ি মম আলতা হব পায়ে,
অধরে হব হাসি, রূপ-লাবণী গায়ে,
আমার যাহা কিছু তোমাতে হবে হারা,
তুমি জানিবে না আমা বই॥

২৯
ভৈরবী—কার্ফা

আঁচলে হংস-মিথুন আঁকা
বলাকা-পেড়ে শাড়ি দুলায়ে

চলিছে কিশোরী শ্যামা একা
রুমঝুম বাজে নূপুর মৃদু পায়ে॥

ভয়ে ভয়ে চলে আধো-আঁধারে
বিরহী বন্ধুর দূর অভিসারে,
পথ কাঁদে যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না ওগো
থামো ক্ষণেক এ ঠাঁয়ে॥

৩০

পিলু—কার্ফা

অচেনা সুরে অজানা পথিক
নিতি গেয়ে যায় করুণ গীতি।
শুনিয়া সে গান দুলে ওঠে প্রাণ
জেগে ওঠে কোন হারানো স্মৃতি॥

ঘুরিয়া মরে উদাসী সে সুর
সাঁঝের কূলে বিষাদ-বিধুর,
নীড়ে যেতে হায় পাখি ফিরে চায়,
আবেশে ঝিমায় কুসুম-বীথি॥

৩১

ভীম পলশ্রী-দাদরা

হেরি আজ শূন্য নিখিল,
প্রিয় তোমারি বিহনে ;
কোথা হায় তুমি কোথায়,
উঠিছে কাঁদন পবনে॥

কেন বা এলে তুমি কেন বা বিদায় নিলে,
স্বপনে দিয়ে দেখা মিশালে জাগরণে॥

কান্তা-বিরহে হেথা ক্লান্ত কপোত কাঁদে,
সে কোথায় গেছে উড়ে সাথী তার কোন গগনে॥

আঁধার ঘরে মম কেন জ্বালালে বাতি,
যদি নিভায়ে দেবে ছিল গো তোমার মনে॥

ভাসিয়া চলেছি আজ স্রোতের কুসুম সম
নিরাশার পাথার-জলে তোমারি অন্বেষণে॥

৩২

সারং—কার্ফা

কত কথা ছিল তোমায় বলিতে।
ভুলে যাই হয়না বলা পথ চলিতে॥
ভ্রমর আসে যবে বনের পথে,
না-বলা সেই কথা কয় ফুল-কলিতে॥

পুড়ে মরে পতঙ্গ, দীপ তবু
পারে না বলিতে, থাকে জ্বলিতে॥

সে কথা কইতে গিয়ে গুণীর বীণা
কাঁদে কভু সারং কভু ললিতে॥

যত বলিতে চাই লুকাই তত,
গেল মোর এ-জনম হায় মন ছলিতে॥

৩৩

সিন্ধু মিশ্র-দাদ্‌রা

তুমি বর্ষায়-ঝরা চম্পা,
তুমি যূথিকা অশ্রুমতী।
তুমি কুহেলি-মলিন ঊষা
তুমি বেদনা সরস্বতী॥

কদম-কেশর-কীর্ণা
তুমি পুষ্প-বীথিকা শীর্ণা,
হলে ধরণীতে অবতীর্ণা
ক্ষীণ তারকা স্নিগ্ধ জ্যোতি॥

মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী
তুমি কি অলকনন্দা,
আঁধারের কালো-কুন্তল-ঢাকা
তুমি কি ধূসর সন্ধ্যা?
পাষাণ-দেবতা-চরণে
তুমি মরেছ অমর মরণে,
তুমি অঞ্জলি ঝরা কুসুমের
তুমি ব্যর্থ ব্যথা-আরতি॥

৩৪

মুলতান-কানাড়া মিশ্র—দাদ্‌রা

অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে সঘন তিমির রাতে।
নিদ্রা নাহি তোমায় চাহি আমার নয়ন-পাতে॥

ভেজা মাটির গন্ধ সনে
তোমার স্মৃতি আনে মনে,
বাদলী হাওয়া লুটিয়ে কাঁদে আঁধার আঙিনাতে॥

হঠাৎ বনে আসল ফুলের বন্যা
পল্লবেরই কূলে,
নাগকেশরের সাথে কদম কেয়া
ফুটল দুলে দুলে।

নবীন আমন ধানের ক্ষেতে
হতাশ বায়ু ওঠে মেতে,
মন উড়ে যায় তোমার দেশে
পূব-হাওয়ারই সাথে॥

৩৫

বেহাগ-মিশ্র—দাদ্‌রা

একলা ভাসাই গানের কমল সুরের স্রোতে
খেলার ছলে ওপার পানে এপার হতে॥
আসবে গো এই গাঙের কূলে হয়তো ভুলে
আমার প্রিয়া
খোঁপায় নেবে আমার গানের কমল তুলে
আমার প্রিয়া।
খুঁজতে আমায় আসবে সুরের নদী-পথে॥

নাম-হারা কোন গাঁয়ে থাকে অচেনা সে
না-ই জানিলাম, গান ভেসে যাক তাহার আশে।
নদীর জলে আলতা-রাঙা পা ডুবায়ে
রয় সে মেয়ে,
গানের কমল লাগে গো তার কমল-পায়ে
উজান বেয়ে।
সেদিন অমর হয় মোর গান
যায় অমরায় পুষ্প-রথে॥

৩৬

টোড়ি—একতালা

তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ
ডুবিয়া যাই এখন।
দিনের আলোকে ভুলিও তোমার
রাতের দুঃস্বপন॥

তুমি সুখে থাক, আমি চলে যাই,
তোমারে চাহিয়া ব্যথা যেন পাই,
জনমে জনমে এই শুধু চাই
না-ই যদি পাই মন॥

ভয় নাই প্রিয়, রেখে গেনু শুধু
চোখের জলের লেখা,
জলের লিখন শুকাবে প্রভাতে
আমি চলে যাব একা ॥

ঊর্ধ্বে তোমার প্রহরী দেবতা,
মধ্যে দাঁড়ায়ে তুমি ব্যথা-হতা,
পায়ের তলার দৈত্যের কথা
ভুলিতে কতক্ষণ ॥

৩৭

দেশ মিশ্র—দাদ্‌রা

দুলিবি কে আয় মেঘের দোলায়।
কুসুম দোলে পাতার কোলে
পূবালী হাওয়ায় ॥

অলকা-পরী অলক খুলে
কাজরী নাচে গগন-কূলে,
বলাকা-মালার ঝুলন ঝুলায় ॥

দাদুরী বোলে, ডাহুকী ডাকে,
ময়ূরী নাচে তমাল-শাখে,
ময়ূর দোলে কদম-তলায় ॥

তটিনী দুলে ঢেউ-এর তালে,
নিবিড় আঁধার ঝাউয়ের ডালে,
বেণুর ছায়া ঘনায় মায়া
পরান ভোলায় ॥

৩৮

ভৈরবী-মিশ্র—কার্ফা

কোন দূরে ও কে যায় চলে যায়
সে ফিরে ফিরে চায়
করুণ চোখে।
তার স্মৃতি মেশা হায়, চেনা অচেনায়,
তারে দেখেছি কোথায় যেন সে কোন্ লোকে॥

শুনি স্বপ্নে তারি যেন বাঁশি মন-উদাসী,
তারি বার্তা আসে নব মধু-মাসে
পলাশ অশোকে॥

কৃষ্ণচূড়া তার মালা লুটায়
চৈত্র-শেষে বনের ধুলায়।

কান্না-বিধুর
তার ভৈরবী সুর
প্রভাতী তারায় অশ্রু ঘনায়।
চির-বিরহী চিনি ওকে॥

৩৯

পিলু—কার্ফা

রিমি ঝিম্ রিমি ঝিম্ ঐ নামিল দেয়া।
শুনি শিহরে কদম, বিদরে কেয়া॥

ঝিলে শাপলা কমল
ওই মেলিল দল,
মেঘ-অন্ধ গগন, বন্ধ খেয়া॥

বারি-ধারে কাঁদে চারিধার,
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার;
তেপান্তরে নাচে একা আলেয়া॥

কাঁদে চখাচখি, কাঁদে বনে কেকা,
দীপ নিভায়ে কাঁদি আমি একা,
আজ মনে পড়ে সেই মন দেয়া-নেয়া॥

৪০

পিলু মিশ্র—রূপক

পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে
নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়।
ডাকছে উদার নীল পারাবার
আয় তটিনী আয় নেমে আয়॥

বেলাভূমে আছড়ে পড়ে
কাঁদছে সাগর তোরি তরে,
তরঙ্গেরি নূপুর প'রে
জল-নটিনী আয় নেমে আয়॥

দুই ধারে তোর জল ছিটিয়ে
ফুল ফুটিয়ে আয় নেমে আয়,
শ্যামল তৃণে চঞ্চল অঞ্চল লুটিয়ে
আয় নেমে আয়॥

সজল যে তোর চোখের চাওয়ায়
সাগর-জলে জোয়ার জাগায়—
সেই নয়নের স্বপন দিয়ে
বন-হরিণী আয় নেমে আয়॥

৪১

জৌনপুরী টোড়ি—দাদরা

শেষ হলো মোর এ জীবনে ফুল ফোটাবার পালা,
ওগো মরণ, অর্ঘ্য লহ সেই কুসুমের ডালা॥

কাটলো কীটে ঝরল যে ফুল,
শুকালো যে আশার মুকুল,
তাই দিয়ে হে মরণ তোমার গেঁথেছি আজ মালা॥
সুন্দর এই ধরণীতে কতই ছিল সাধ বাঁচিতে,
হঠাৎ তোমার বাজলো বেণু বিদায়-করুণ ভৈরবীতে।

তোমার আঁধার-শান্ত কোলে
শ্রান্ত তনু পড়ুক ঢলে,
আর সহে না কুসুম-বিহীন কণ্টকের জ্বালা॥

৪২

ধানশ্রী—একতালা

কাঁদিছে তিমির-কুন্তলা সাঁঝ
আমার হৃদয়-গগনে।
এসো প্রিয়া এসো বধূ-বেশে এই
বিদায়-গোধূলি-লগনে।

দিনের চিতার রক্ত-আলোকে
শুভ-দৃষ্টি গো হবে চোখে চোখে,
আমার মরণ-উৎসব-ক্ষণে
শঙ্খ বাজুক সঘনে॥

চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া হের
খুঁজিছে মোদেরে তারাদল,
সজল-বসনা বাদল-পরীর
নয়ন করিছে ছলছল।

মরণে তোমারে পাইব বলিয়া
জীবনে করেছি আরাধনা প্রিয়া,
এসো মায়ালোক-বিহারিণী মোর
কুহেলি-আঁধার স্বপনে॥

৪৩

পিলু—কার্ফা

আসে রজনী, সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে।
ছায়া-আঁচল-ঢাকা কানন-তলে॥

তিমির-দুকূল দুলে গগনে
গোধূলি-ধূসর সাঁঝ-পবনে,
তারার মানিক অলকে ঝলে॥

পূজা-আরতি লয়ে চাঁদের থালায়
আসিল সে অস্ত-তোরণ নিরালায়।

ললাটের টিপ জ্বলে সন্ধ্যা-তারা,
গিরি-দরী বনে ফেরে আপন-হারা,
থামে ধীরে বিরহীর নয়ন-জলে॥

৪৪

ভীমপলশ্রী মিশ্র—দাদ্‌রা

আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে॥
জ্বলে দীপ-শিখা আম-মুকুলে
রাঙা পলাশে অশোকে বকুলে,
আসে সে আলোর টানে বন-তল
মৌ-মাছি প্রজাপতি দলে দল,
পুড়ে মরিতে সে রূপ-শিখাতে,
প্রাণ সঁপিতে বাসন্তিকাতে
পরিমল অঞ্জন মাখিয়া নয়নে।
হের ঝিমায় আকাশ চাঁদের স্বপনে॥

জ্বলে গগনে তারার দীপালি
আজি ধরাতে আকাশে মিতালী।

ধরা চাঁপার গেলাস ভরিয়া
মধু ঊর্ধ্বে তোলে গো ধরিয়া,
পান করিতে সে মধু পরীরা
আসে নেমে কাননে স-শরীরা।
বাজে উৎসব-বাঁশি গগনে পবনে
হের ঝিমায় আকাশ চাঁদের স্বপনে।।

আজি বাতাবি নেবুর কুঞ্জে,
শ্যামা দোয়েল মধুপ গুঞ্জে,
ফেরে আকাশে পক্ষ প্রসারি
ফুল— কিশোর স্বপন-পসারী।
সাড়া জাগে বনে বনে সাজ-সাজ,
ঐ এলো রে এলো রে ঋতুরাজ,
তাই সেজেছে প্রকৃতি কুসুমী বসনে।।

৪৫

ভৈরবী—দাদ্‌রা

দোপাটি লো, লো করবী, নাই সুরভি, রূপ আছে।
রঙের পাগল রূপ-পিয়াসী সেই ভালো আমার কাছে।।

গন্ধ-ফুলের জলসাতে তোর
গুণীর সভায় নেইক আদর,
গুল্ম-বনে দুল হয়ে তুই দুলিস একা ফুল-গাছে।।

লাজুক মেয়ে পল্লী-বধূ জল নিতে যায় একলাটি,
করবী নেয় কবরীতে, বেণীর শেষে দোপাটি।

গন্ধ লয়ে স্নিগ্ধ মিঠে
আলো করে থাকিস ভিটে,
নাই সুবাস সাথে, গায়ে কাঁটা,
সেই গরবে মন নাচে।।

৪৬

সিন্ধু—দাদ্‌রা

বাসন্তী রং শাড়ি পরো
খয়ের রঙের টিপ
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন
জ্বালবে যখন দীপ॥

দুলিয়ে দিও দোলন-খোঁপায়
আমের মুকুল বকুল চাঁপায়,
মেখলা করো কটি-তটে
শিউরে-ওঠা নীপ॥

কর্ণ-মূলে দুল দুলিও দুলাল-চাঁপার কুঁড়ি,
বন-অতসীর কাঁকন পরো, কনক-গাঁদার চুড়ি।

আধখানা চাঁদ গরব ভরে
হাসে হাসুক আকাশ পরে,
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ
ধরার মণি-দীপ॥

৪৭

ভৈরবী—একতালা

এস এস রস-লোক-বিহারী
এস মধুকর-দল।
এস নভোচারী স্বপন-কুমার
এস ধ্যান-নিরমল॥

এস হে মরাল কমল-বিলাসী,
বুলবুল পিক সুর-লোক-বাসী,
এস হে স্রষ্টা এস অ-বিনাশী
এস জ্ঞান-প্রোজ্জ্বল॥

দীওয়ানা প্রেমিক এস মুসাফির
ধূলি-ম্লান তবু উন্নত শির,
অমরা-অমৃত-জয়ী এস বীর
আনন্দ-বিহ্বল॥

মাতাল মানব করি মাতামাতি
দশ হাতে যবে লুটে যশ-খ্যাতি,
তোমরা সৃজিলে নব দেশ জাতি
অগোচর অচপল।

খেল চির-ভোলা শত ব্যথা সয়ে,
সংঘাত ওঠে সঙ্গীত হয়ে,
শত বেদনার শতদল লয়ে
লীলা তব অবিরল॥

ভুলি অবহেলা অভাব বিষাদ
ধরণীতে আনো স্বর্গের স্বাদ,
লভি তোমাদের পুণ্য প্রসাদ
পেনু তীর্থের ফল॥

৪৮

দেশ—একতালা

তোমাদের দান তোমাদের বাণী
পূর্ণ করিল অন্তর।
তোমাদের রস-ধারায় সিনানি
হলো তনু শুচি সুন্দর॥

শান্ত উদার আকাশের ভাষা
মলিন মর্ত্যে অমৃত পিপাসা
দিলে আনি, দিলে অভিনব আশা
গগন-পবন-সঞ্চর॥

বুলায়ে মায়ার অঞ্জন চোখে
লয়ে গেলে দূর কল্পনা-লোকে,
রাঙাল কানন পলাশে অশোকে
তোমাদের মায়া-মন্তর॥

ফিরদৌসের পথ-ভোলা পাখি
আনন্দ-লোকে গেলে সবে ডাকি,
ধূলি-ম্লান মন গেলে রঙে মাখি
ছানিয়া সুনীল অম্বর॥

৪৯

বেহাগ—খেমটা

যেন ফিরে না যায় এসে আজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়।
সখি দিসনে তোরা তারে লাজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

পথ ভুল করে
যায় আন-ঘরে জানি সই,
তবু আমারি সে রাজাধিরাজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

ফুল চুরি ওর পেশা
ও শুধু চোখের নেশা, জানি সই,
একা আমার ছবি তার হিয়া-মাঝ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

সুন্দর বলে তায়
সকলে পাইতে চায়,
সে পরালো মোরে প্রেমের তাজ
বঁধুয়া ফিরে না যায়॥

৫০

পিলু মিশ্র—কার্ফা

মদির আবেশে কে চলে ঢুল-ঢুলু-আঁখি।
হেরিয়া পাপিয়া উঠিছে পিউ পিউ ডাকি॥

আলতা-রাঙা পায়ে আলপনা আঁকে,
পথের যত ধূলি তাই বুক পেতে থাকে,
দুধারে তরুলতা দেয় চরণ ফুলে ফুলে ঢাকি।

তারি চোখের চাওয়ায় গো দোলা লাগে হাওয়ায়,
তালীবন তাল দিয়ে যায় তাল-ফেরতায়।
আকুল তানে গাহে বকুল-বনের পাখি॥

তারি মুখ-মদের ছিটে
জোগায় ফুলে মধু মিঠে,
চাঁদের জৌলুস তাহারি রওশনী মাখি॥

৫১

ভৈরবী—দাদ্‌রা

নাচে সুনীল দরিয়া আজি দিল-দরিয়া
পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে।
কূলে তার ঝুমুর ঝুমুর ঘুমুর বাজে মিঠে আওয়াজে
নাচে জল-পরীর মেয়ে॥

তার জল-ছলছল কূলে কূলে
ফেনিল যৌবন ওঠে দুলে,
চাঁদিনী-উজ্জ্বল তনু ঝলমল
পর্য্যনে উছল জাগে জোয়ার,
আধো ঘুমে আসে তার নয়ন ছেয়ে॥

জল-বালা মুক্তা-মালা গাঁথে নিরালা
চাঁদের তরে,
কাজল-বরণী তরুণী তটিনী চলেছে ধেয়ে॥

৫২
পিলু মিশ্র—কার্ফা

মহুয়া ফুলের মদির বাসে,
নেশাতে নয়ন ঝিমিয়ে আসে॥

মাতাল পাপিয়া পিয়া পিয়া ডাকে,
দোলন-চাঁপার ঝুলন-শাখে,
মদালস বায়ে মন উদাসে॥

নিঁদালি ছাওয়া চৈতালী হাওয়া,
স্বপনের ঘোর লাগে আকাশে
মৌমাছির পাখা জড়িয়ে আসে॥

৫৩
দেশ—দাদ্‌রা

দুপুর বেলাতে একলা পথে
ও কে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।
ক্ষ্যাপা হাওয়াতে উড়িছে আঁচলা,
খোঁপা খুলিয়া খুলিয়া খুলিয়া যায়॥

ছল করে জল যায় সে আনিতে
দেখিয়া গুরুজন ঘোমটা দিতে
ও সে ভুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া যায়॥

কাহার গলার মালার তরে
আপন মনে আঁচল ভরে
ফুল তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া যায়॥

কার বিরহে পরান দহে,
কিসের নেশায় মদির মোহে
ও সে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া যায়॥

৫৪

বেহাগমিশ্র—কার্ফা

শিউলি-তলায় ভোরবেলায়
কুসুম কুড়ায় পল্লী-বালা।
শেফালি পুলকে ঝরে পড়ে মুখে
খোঁপাতে চিবুকে আবেশ-উতালা॥

ঘোমটা খুলিয়া তার পিঠে লুটায়,
শিথিল কবরী লুটিছে পায়,
নৃত্যের ভঙ্গে ফুল তোলে রঙ্গে,
আধো আঁধার বন তার রূপে উজালা॥

নিলাজ পাঁয়জোরে তার ওঠে ঝঙ্কার রিনিঝিনি,
মন কয় চিনি চিনি,

এ কি গো বন-দেবীর সতিনী।
শিশির ধরে পায় আলতার রঙ চায়,
পাখি তারি গান গায় বনে নিরালা॥

৫৫

সিন্ধু—ত্রিতালী

যৌবন-সিন্ধু টলমল টলমল,
প্রেমের ইন্দু আকাশে ঝলমল।
হৃদয়-তটিনী জোয়ারে নেয়ে যায়,
তরঙ্গ-রঙ্গে ছলছল ছলছল॥

অন্তর-মন্দির-বাসিনী আজি
আসিল আলোকে ফুল-সাজে সাজি,

নাচুনী ছন্দে চলে সে আনন্দে
মৃদুল মন্দে দুলায়ে বনতল ॥

মল্লিকা অতসী ওঠে বনে বিকশি
তার তনু-চন্দন-গন্ধে।
বাজে চুড়ি ও কঙ্কণ মণি-বন্ধে,
কোকিল কুহরে কুহু অবিরল ॥

৫৬
খাম্বাজ—কার্ফা

চারু চপল পায়ে যায় যুবতী গোরী।
আঁচলের পাল তুলে সে চলে ময়ূর-পঙ্খী-তরী ॥

আয় রে দেখিবি যদি ভাদরের ভরা নদী,
চলে কে বে-দরদী ভেঙে কূল গিরি-দরী ॥

মুখে চাঁদের মায়া, কেশে তমাল-ছায়া,
এলোচুলে দুলে দুলে নেচে চলে হাওয়া-পরী ॥

নয়ন-বাণে মারে প্রাণে, চরণ-ছোঁয়ায় জীবন দানে,
মায়াবিনী যাদু জানে, হার মানে উর্বশী অপ্সরী ॥

৫৭
ভাটিয়ালি—কার্ফা

দুধে আলতায় রং যেন তার সোনার অঙ্গ ছেয়ে
সে ভিন-গাঁয়েরই মেয়ে।
চাঁদের কথা যায় ভুলে লোক তাহার মুখে চেয়ে।
সে ভিন-গাঁয়েরই মেয়ে।

ও-পারের ঐ চরে যখন চুল খুলে সে দাঁড়ায়,
কালো মেঘের ভিড় লেগে যায় আকাশের ঐ পাড়ায়।

পা ছুঁতে তার নদীর জলে জোয়ার আসে ধেয়ে।
সে ভিন-গাঁয়েরই মেয়ে।

চোখ তুলে সে মেঘের পানে ভুরু যখন হানে,
অমনি ওঠে রামধনু গো সেই চাহনির টানে।
কপালের সে ঘাম মুছে গো আঁচল যখন খুলে,
ধানের ক্ষেতে ঢেউ খেলে যায়, দরিয়া ওঠে দুলে,
আমি চোখের জলে খুঁজি তারেই দুখের তরী বেয়ে।
সে ভিন-গাঁয়েরই মেয়ে॥

৫৮

ভাটিয়ালি—কার্ফা

আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা ঠেলে
আমি খুঁজে বেড়াই তারেই রে ভাই
যে গিয়েছে আমায় ফেলে॥

আমার তোদের মতই ঘর ছিল ভাই
এমনি গাঙের কূলে,
সেই ঘরেতে রূপের জোয়ার
উঠতো দুলে দুলে।
সেই সোনার পরী উড়ে গেছে
সোনার পাখা মেলে॥

পায়ে চলে খুঁজি তারে, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজি,
নাইতে চলে বৌ-ঝি, আমি ভাবি সে-ই বুঝি॥
চাঁদের দেশের মেয়ে সে ভাই, গেছে বাপের বাড়ি,
মাটিতে মোর পা বাঁধা ভাই, উড়ে যেতে নারি।
হারালে সব যায় পাওয়া ভাই,
শুধু মানুষ নাহি মেলে॥

৫৯
কাফি—ঠুংরী

বনে চলে বনমালি বনমালা দুলায়ে।
তমালে কাজল-মেঘে শ্যাম-তুলী বুলায়ে॥

ললিত মধুর ঠামে কভু চলে কভু থামে,
চাঁচর চিকুরে বামে শিখি-পাখা ঢুলায়ে॥

ডাকিছে রাখাল-দলে 'আয় রে কানাই' বলে,
ডাকে রাধা তরুতলে ঝুলনিয়া ঝুলায়ে॥

যমুনার তীর ধরি চলিছে কিশোর হরি,
বাজে বাঁশের বাঁশরি ব্রজনারী ভুলায়ে॥

৬০
দেশ-জয়জয়ন্তী—একতালা

ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে ঘনশ্যাম
ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়।
ধরিতে ধরার ভার, নাশিতে এ হাহাকার
আরবার এস এ-ধরায়॥

নিখিল মানবজাতি কলহ ও দ্বন্দ্বে
পীড়িত শ্রান্ত আজি কাঁদে নিরানন্দে,
শঙ্খ পদ্ম হাতে এ ঘোর তিমির-রাতে
তিমির-বিদারী এস অরুণ-প্রভায়॥
বিদূরিত কর এই নিরাশা ও ভয়,
মানুষে মানুষে হোক প্রেম অক্ষয়॥

কলিতে দলিতে এস এই দুখ পাপ তাপ,
দেহ বর সুন্দর, শেষ হোক অভিশাপ,
গদা ও চক্র করে অরিন্দম এস,
হত-মান দুর্বল মাগিছে সহায়॥

৬১

কীর্তন

মোর পুষ্প-পাগল মাধবী-কুঞ্জে
এই ত প্রথম মধুপ গুঞ্জে,
তুমি যেয়ো না আজি যেয়ো না।
মম চন্দ্র-হসিত মাধবী নিশীথ
বিষাদের মেঘে ছেয়ো না॥

হের তরুণ তমাল করুণ ছায়ায়
আসন বিছায়ে তোমারে সে চায় ;
তোমার বাঁশির বিদায়-সুরে
বনে কদম্ব-কেশর ঝুরে ;
ওগো অকরুণ ! ঐ সকরুণ গীতি গেয়ো না।
তুমি যেয়ো না আজি যেয়ো না॥

তোলা বন-ফুল রয়েছে আঁচলে
হয়নি ক মালা গাঁথা,
বকুলের ছায়ে নব কিশলয়ে
হয়নি আসন পাতা।
মুকুলিকা মোর কামনা সলাজ
দলিও না পায়ে, হে রাজাধিরাজ !
মম অধরের হাসি করিও না বাসি,
পরবাসী যেতে চেয়ো না।
তুমি যেয়ো না আজি যেয়ো না॥

৬২

কানাড়া মিশ্র—রূপক

মনে যে মোর মনের ঠাকুর
তারেই আমি পূজা করি,
আমার দেহের পঞ্চভূতের
পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরি॥

ফকির যোগী হয়ে বনে
ফিরি না তার অন্বেষণে,
মনের দুয়ার খুলে দেখি
রূপের জোয়ার, মরি মরি॥

আছেন যিনি ঘিরে আমায়,
তাঁরে আমি খুঁজবো কোথায়,
সমুদ্দুরে খুঁজে বেড়াই
সমুদ্রেতেই ভাসিয়ে তরী॥

মন্দিরের ঐ বদ্ধ খোঁপে
ঠাকুর কি রয় পূজার লোভে?
মনের ধোঁওয়া বাড়াও আরো
ধূপের ধোঁওয়ায় পায় না হরি॥

৬৩

ভৈরবী—একতালা

এই দেহেরই রঙমহলায়
খেলিছেন লীলা-বিহারী।
মিথ্যা মায়া নয় এ কায়া
কায়ায় হেরি ছায়া তাঁরি॥

রূপের রসিক রূপে রূপে
খেলে বেড়ায় চুপে চুপে,
মনের বনে বাজায় বাঁশি
মন-উদাসী বন-চারী॥
তার খেলা-ঘর তোর এ দেহ,
সে ত নহে অন্য কেহ,
সে যে রে তুই,—তবু মোহ
ঘুচল না তোর হায় পূজারী॥

খুঁজিস তারে ঠাকুর-পূজায়
উপাসনায় নামাজ রোজায়,

চাল কলা আর সিন্নি দিয়ে
ধরবি তারে হায় শিকারী !
পালিয়ে বেড়ায় মন-আঙিনায়
সে যে শিশু প্রেম-ভিখারি ॥

৬৪
(ভৈরবী) ভজন—কার্ফা

হে চির-সুন্দর, বিশ্ব-চরাচর
তোমারি মনোহর রূপের ছায়া।
রবি শশী তারকায় তোমারি জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া ॥

দেহের সুবাস তব কুসুম-গন্ধে,
তোমার হাসি হেরি শিশুর আনন্দে,
জননীর রূপে তুমি আমাদেরে যাও চুমি,
তব স্নেহ-প্রেমরূপ—কন্যা জায়া ॥

হে বিরাট শিশু ! এ যে তব খেলনা—
ভাঙা গড়া নিতি নব, দুখ শোক বেদনা।

শ্যামল পল্লবে সাগর-তরঙ্গে
তব রূপ লাবণী দুলে ওঠে রঙ্গে,
বিহগের কণ্ঠে তব মধু কাকলি,
মায়াময় ! শত রূপে বিছাও মায়া ॥

৬৫
পিলু বারোয়াঁ—ত্রিতালী
(দ্বৈত গান)

উভয়ে— কপোত কপোতী উড়িয়া বেড়াই
সুদূর বিমানে আমরা দুজনে।

কানন কান্তার শিহরি ওঠে
মোদের প্রণয়-মদির কূজনে॥

স্ত্রী— ভ্রমর গুঞ্জে মঞ্জুল গীতি
হেরিয়া আমার বঁধুর প্রীতি
পুরুষ— আমার প্রিয়ার নয়নে চাহি
কুসুম ফুটে ওঠে বিপিনে বিজনে॥

স্ত্রী— তোমা ছাড়া স্বর্গ চাহি না, প্রিয়!
মোদের প্রেমে চাঁদ আসে নেমে
মাটির পাত্রে পান করি অমিয়।
পুরুষ— বিশ্ব ভুলায়ে ঐ রাঙা পায়ে
আমারে বেঁধেছ জীবনে মরণে॥

৬৬

কাফি মিশ্র—কার্ফা

এ কোথায়—আসিলে হায় তৃষিত ভিখারি
হায় পথ-ভোলা পথিক হায় মৃগ মরুচারী॥

তোমার পথে প্রিয় ছিলাম যবে আমার পরান পাতি
সেদিন যদি আসিতে নাথ হইতে ব্যথার সাথী।
ধোওয়ায়ে নয়ন-জলে পা মুছাতাম আকুল কেশে,
আজ কেন দিবা-শেষে এলে নাথ মলিন বেশে,
হায় বুকে লয়ে ব্যথা আসিলে ব্যথাহারী॥

স্মৃতির যে শুকাল মালা যতনে রেখেছি তুলি,
ছুঁইয়ে সে হার ঝরাও না ম্লান তার কুসুমগুলি,
হায় জ্বলুক বুকে চিতা তায় ঢেলো না আর বারি॥

৬৭

গৌড় সারং—কাওয়ালি

চম্পক-বরণী টলমল তরণী
চলে শ্যামা তরুণী যৌবন-গরবী।
ডাকে দূর পারাবার ডাকে তারে বন-পার,
লালসে ঝরে তার পায়ে রাঙা করবী।

চলে বালা দুলে দুলে,
এলো-খোঁপা পড়ে খুলে
চাহে ভ্রমর কুসুম ভুলে
তনুর অর সুরভি॥

নাচের ছন্দে দোদুল
টলে তার চরণ চটুল,
হরিণী চায় পথ-বেভুল,
মায়া-লোক-বিহারিণী রচি চলে ছায়া-ছবি॥

৬৮

সিন্ধু মিশ্র—কার্ফা

শিউলি ফুলের মালা দোলে
শারদ-রাতের বুকে ঐ।
এমন রাতে একলা জাগি
সাথে জাগার সাথী কই॥

বকুল বনে একলা পাখি
আকুল হলো ডাকি ডাকি,
আমারও প্রাণ থাকি থাকি
তেমনি ডেকে ওঠে সই॥

কবরীতে করবী ফুল পরিয়া প্রেমে গরবিনী
ঘুমায় বঁধুর বাহু-পাশে, ঝিমায় দ্বারে নিশীথিনী।
ডাকে আমায় দূরের বাঁশি
কেমনে আর ঘরে রই॥

৬৯

কেদারা—একতালা

স্বদেশ আমার ! জানি না তোমার
শুধিব মা কবে ঋণ।
দিনের পরে মা দিন চলে যায়,
এল না সে শুভদিন।।

খাই দাই আর আরামে ঘুমাই,
পাগলের যেন ব্যথা-বোধ নাই,
ললাট-লিখন বলিয়া এড়াই
ভীরুতা, শক্তি ক্ষীণ।
তুমি অভাগিনী, সন্তান তব
সমান ভাগ্যহীন।।

কত শতাব্দী করেছি মা পাপ
মানুষেরে করি ঘৃণা
জানি না মুক্তি পাব না তাহার
প্রায়শ্চিত্ত বিনা।

স্বদেশ বলিতে বুঝেছি কেবল
দেশের পাহাড় মাটি বায়ু জল,
দেশের মানুষে ঘৃণা করি
চাই করিতে দেশ স্বাধীন।
যত যেতে চাই তত পথে তাই
হই মা ধূলি-বিলীন।।

ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছ কাঙাল ভাবিয়া
রেখেছি যাদেরে চরণে দাবিয়া
তাদের চরণ-ধূলি মাখি যদি
আসিবে সে শুভদিন।
নূতন আলোকে জাগিবে পুলকে
জননী ব্যথা-মলিন।।

৭০

পাহাড়ী—একতালা

স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী
তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।
নবীন ভারত ! নবীন ভারত !
স্তব-গান ওঠে ভুবন ভরি॥

শস্যে ফসলে ডেকেছে মা বান,
মাঠে ও খামারে ধরে নাকো ধান,
মুখ-ভরা হাসি, হাসি-ভরা প্রাণ,
নদী-ভরা যেন পণ্য-তরী॥

পড়ুয়ারা পড়ে বকুল-ছায়ে
সুস্থ সবল আদুল গায়ে,
মেয়েরা ফিরিছে মুক্ত বায়ে
কল-ভাষে দিক মুখর করি॥

ভুলিয়া ইর্ষা ভোগ আসক্তি
ধরার ক্লান্ত অসুর-শক্তি
এসেছে শিখিতে প্রেম ও ভক্তি
নব-ভারতের চরণ ধরি॥
তব প্রেমে তব শুভ ইঙ্গিতে
অভাব যেন মা নাই পৃথিবীতে,
স্বর্গ নামিয়া এসেছে মাটিতে,
শুধু আনন্দ পড়িছে ঝরি॥

৭১

মার্চের সুর

দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান
গাহে আজি উদ্ধত গান।
লঙ্ঘি গিরি দরী
ঝঞ্ঝা-নূপুর পরি
ফেরে মন্থর করি অসীম বিমান॥

আমাদেরে পদভরে ধরা টলমল,
অগ্নিগিরি ভয়ে মন্থর নিশ্চল,
কম্প্রমানা ধরা শান্ত অটল
চরণে লুটায় ঘোর সিন্ধু-তুফান॥

মোরা উচ্ছৃঙ্খল ঘোর স্পর্ধাভরে
ভাঙি দ্বার নিষেধের বজ্র-করে,
করি অসম্ভবের পানে নব অভিযান॥

মোদেরে প্রণমি যায় কাল-ভৈরব,
আমাদের হাতে মৃত্যুর পরাভব,
মৃত্যু নিঙাড়ি আনি জীবন-আসব,
মানুষে করেছি মোরা মহামহীয়ান॥

৭২

পেগ্যান

জগতে আজিকে যারা আগে চলে ভয়-হারা
ডেকে যায় আজি তারা, চল রে সুমুখে চল।
পিছু পানে চেয়ে মিছে পড়ে আছি সব নীচে,
চাসনে রে তোরা পিছে অগ্র-পথিক দল॥

চলার বেগে উঠবে জেগে বনে নূতন পথ,
বর্তমানের পানে মোদের চলবে অরুণ-রথ,
অতীত আজি পতিত রে ভাই, রচব ভবিষ্যৎ
স্বর্গ মোরা আনব, না হয় যাব রসাতল॥

রইব না পিছে পড়ে
অতীতের কঙ্কাল ধরে,
বইবে নব জীবন-স্রোত
যৌবন-চঞ্চল।
বিশ্ব-সভাঙ্গনে সকল জাতির সনে
বসিব সম-আসনে গৌরব-উজ্জ্বল॥

৭৩

বাউল—লোফা

আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি॥

এই দেশেরই মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটি॥

এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ করে ধন্য হতে আসে কত জাতি।
এই দেশেরই ধুলায় পড়ি
মানিক যায় রে গড়াগড়ি ;
বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙাল
এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি॥
এই মাটি এই কাদা মেখে
এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হল নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি।

এই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে
জ্বালল আলো ভালোবেসে,
মা আঁধার রাতে একলা জাগে
আগলে রে এই শ্মশান-ঘাঁটি॥

৭৪

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ
বহিয়া চলেছে আগের মতন
কই রে আগের মানুষ কই॥

মৌনী স্তব্ধ সে হিমালয়
তেমনি অটল মহিমময়,
নাহি তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি,
আমরাও আর সে জাতি নই॥

আছে সে আকাশ—ইন্দ্র নাই,
কৈলাসে সে যোগীন্দ্র নাই,
অন্নদা-সুত ভিক্ষা চাই
কি কহিব এরে কপাল বই॥

সেই সে আগ্রা দিল্লী ভাই
আছে পড়ে, সেই বাদশা নাই,
নাই কোহিনূর ময়ূর-তখত
নাই সে বাহিনী বিশ্বজয়ী॥

আমরা জানি না, জানে না কেউ
কূলে বসে কত গণিব ঢেউ,
অনেক সয়েছি, সহিব এও
দুখ তাপ শোক আরো কতই॥

ইসলামী গান

৭৫

মর্সিয়া

এল শোকের সেই মোহররম কারবালার স্মৃতি লয়ে।
আজি বে-তাব বিশ্ব-মুসলিম সেই শোকে রোয়ে রোয়ে॥

মনে পড়ে আসগরে আজ পিয়াসা দুধের বাচ্চায়
পানি চাহিয়া পেল শাহাদত হোসেনের বক্ষে রয়ে॥

এক হাতে বিবাহের কাঙন এক হাতে কাসেমের লাশ,
বেহোশ খিমাতে সকিনা অসহ বেদনা সয়ে॥

ঝরিছে আঁখিতে খুন হায় জয়নাল বেহুশ কেঁদে,
মানুষ বলে সহে এত পাথরও যেত ক্ষয়ে॥

শূন্য পিঠে কাঁদে দুলদুল হজরত হোসেন শহীদ,
আসমানে শোকের বারেষ, ঝরে আজি খুন হয়ে॥

৭৬

দেশ—কাওয়ালি

বহিছে সাহারায় শোকের 'লু' হাওয়া
দুলে অসীম আকাশ আকুল রোদনে।
নূহের প্লাবন আসিল ফিরে যেন
ঘোর অশ্রু শ্রাবণ-ধারা ঝরে সঘনে॥

হায় হোসেনা হায় হোসেনা বলি'
কাঁদে গিরি দরী মরু বনস্থলী,
কাঁদে পশু ও পাখি তরুলতার সনে॥

ফকির বাদশাহ গরিব ওমরাহে
কাঁদে তেমনি আজো, তারি মর্সিয়া গাহে,
বিশ্ব যাবে মুছে, মুছিবে না এ আঁসু,
চির কাল ঝরিবে কালের নয়নে॥

ফল্গুধারা–সম সেই কাঁদন–নদী
কুল–মুসলিম চিতে বহে গো নিরবধি,
আসমান ও জমিন রহিবে যতদিন
সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে॥

৭৭

ভৈরবী—কার্ফা

ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ
এল আবার দুসরা ঈদ।
কোরবানি দে কোরবানি দে,
শোন খোদার ফরমান তাকীদ॥

এমনি দিনে কোরবানি দেন
পুত্রে হজরত ইবরাহিম,
তেমনি তোরা খোদার রাহে
আয় রে হবি কে শহীদ॥

মনের মাঝে পশু যে তোর
আজকে তারে কর জবেহ্,
পুল্‌সরাতের পুল হতে পার
নিয়ে রাখ আগাম রশিদ॥

গলায় গলায় মিল রে সবে
ভুলে যা ঘরোয়া বিবাদ,
শিরনী দে তুই শিরীন জবান
তশ্‌তরীতে প্রেম মফিদ॥

মিলনের আরফাত ময়দান
হোক আজি গ্রামে গ্রামে,
হজের অধিক পাবি সওয়াব
এক হলে সব মুসলিমে।
বাজবে আবার নূতন করে
দীনী ডঙ্কা, হয় উমীদ॥

৭৮

ইমন মিশ্র—পোস্তা

তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম-জাঁহা পুন হোক আবাদ।
দাও সেই হারানো সুলতানত,
দাও সেই বাহু, সেই দিল্ আজাদ॥

দাও বে-দেরেগ তেগ জুলফিকার
খয়বর-জয়ী শেরে-খোদার,
দাও সেই খলিফা সে হাশমত
দাও সেই মদিনা সে বোগদাদ॥

দাও সে হামজা সেই বীর ওলিদ
দাও সেই ওমর হারুণ-অল-রশীদ,
দাও সেই সালাহউদ্দীন আবার
পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ॥

দাও সেই রুমী সাদী হাফিজ
সেই জামী খৈয়াম সে তবরিজ ;
দাও সে আকবর সেই শাহজাহান
সেই তাজমহলের স্বপ্ন-সাধ॥

দাও ভায়ে ভায়ে সেই মিলন
সেই স্বার্থত্যাগ সেই দৃপ্ত মন,
হোক বিশ্ব-মুসলিম এক-জামাত
উড়ুক নিশান ফের যুক্ত-চাঁদ॥

৭৯

হাম্বীর মিশ্র—কার্ফা

সাহারাতে ডেকেছে আজ বান, দেখে যা।
মরুভূমি হলো গুলিস্তান, দেখে যা॥

সেই বানেরই ছোঁওয়ায় আবার আবাদ হলো দুনিয়া,
শুকনো গাছে মুঞ্জরিল প্রাণ, দেখে যা॥

বিরান মুলুক আবার হলো গুলে গুলে গুলজার,
মক্কাতে আজ চাঁদের বাথান, দেখে যা॥

সেই দরিয়ায় পারাপারের তরী ভাসে কোরআন,
ওড়ে তাহে কলেমার নিশান, দেখে যা॥

কাণ্ডারী তার বন্ধু খোদার হজরত মোহাম্মদ,
যাত্রী—যারা এনেছে ঈমান, দেখে যা॥

সেই বানে কে ভাসবি রে আয়,
যাবি রে কে ফিরদৌস,
খেয়া-ঘাটে ডাকিছে আজান, দেখে যা॥

৮০

সিন্ধু ভৈরবী—কার্ফা

উম্মত আমি গুনাহ্‌গার
তবু ভয় নাহি রে আমার।
আহমদ আমার নবী
যিনি খোদ হবিব খোদার॥

যাঁহার উম্মত হতে চাহে সকল নবী,
তাঁহারি দামন ধরি
পুল্‌সরাত হব হব পার॥
কাঁদিবে রোজ-হাশরে সবে
যবে নফসি য়্যা নফসি রবে,
য়্যা উম্মতী বলে একা
কাঁদিবেন আমার মোখ্‌তার॥

কাঁদিবেন সাথে মা ফাতেমা
ধরিয়া আরশ আল্লার
হোসায়নের খুনের বদলায়
মাপী চাই পাপী সবাকার॥

দোজখ হয়েছে হারাম
যে দিন পড়েছি কলেমা,
যেদিন হয়েছি আমি
কোরানের নিশান-বর্দার॥

৮১

পিলু মিশ্র—কার্ফা

ফিরি পথে পথে মজনুঁ দীওয়ানা হয়ে।
বুকে মোর এয় খোদা তোমারি এশ্‌ক লয়ে॥

তোমার নামের তসবিহ লয়ে ফিরি গলে,
দুনিয়াদার বোঝে না মোরে পাগল বলে,
ওরা চাহে ধনজন আমি চাহি প্রেমময়ে॥

আছ সকল ঠাঁয়ে শুনে বলে সবে,
এমনি চোখে তোমার দিদার কবে হবে ;
আমি মনসুর নহি যে পাগল হব 'আনাল হক' কয়ে॥

তোমার হবিবের আমি উম্মত এয় খোদা,
তাই তো দেখিতে তোমায় সাধ জাগে সদা,
আমি মুসা নহি যে বেহুঁশ হয়ে পড়ব ভয়ে॥
তোমারি করুণায় যাবই তোমায় জেনে,
বসাব মোর হৃদে তোমার আর্শ এনে,
আমি চাই না বেহেশ্‌ত, রব বেহেশ্‌তের মালিক লয়ে॥

৮২

পাহাড়ী মিশ্র—কার্ফা

ভুবন-জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান।
খোদার রাহে আনল যারা দুনিয়া না-ফরমান॥

এশিয়া য়ূরোপ আফ্রিকাতে যাহাদের তকবীর
হুঙ্কারিল, উড়ল যাদের বিজয়-নিশান ॥

যাদের নাঙ্গা তলোয়ারের শক্তিতে সেদিন
পারস্য আর রোম রাজত্ব হইল খানখান ॥

শুকনো রুটি খোর্মা খেয়ে যাদের খলিফা
হেলায় শাসন করিল রে অর্ধেক জাহান ॥

যাদের নবী কমলিওয়ালা শাহানশাহ হয়ে,
আজকে তারা বিলাস-ভোগের খুলেছে দোকান ॥

সিংহ-শাবক ভুলে আছিস শৃগালের দলে,
দুনিয়া আবার পায়ে কি তোর হবে কম্পমান ॥

৮৩

ইমন মিশ্র—একতালা

বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা
শির উঁচু করি মুসলমান।
দাওত এসেছে নয়া জমানার
ভাঙা কিল্লায় ওড়ে নিশান ॥

মুখেতে কলমা হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক আল্লার
চল আগে চল বাজে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
বাঁধা যে রে তোর পাক কোরান ॥

নহি মোরা জীবন্ ভোগ-বিলাসের,
শাহাদত ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারির সাজে খলিফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান—

তারা আজ পড়ে ঘুমায় বেহুশ,
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান॥

ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর,
মগরেবের আজ শুনি আজান।
জমাত-শামিল হও রে এশাতে
এখনো জমাতে আছে স্থান॥

শুকনো রুটিরে সম্বল করে
যে ঈমান আর যে প্রাণের জোরে
ফিরেছি জগৎ মন্থন করে
সে শক্তি আজ ফিরিয়ে আন।
আল্লাহু আকবর রবে পুন
কাঁপুক বিশ্ব দূর বিমান॥

৮৪

ভৈরবী মিশ্র—কার্ফা

খোদার হবিব হলেন নাজেল
খোদার ঘর ঐ কাবার পাশে।
ঝুঁকে পরে আর্শ কুর্শী
চাঁদ সুরুয তাঁয় দেখতে আসে॥

ভেঙে পড়ে মূরত মন্দির,
লাত-মানাত, শয়তানী তখ্‌ত,
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র
উঠিছে তকবীর আকাশে॥

খুশির মউজ তুফান তোরা
দেখে যা মরুভূমে,

কোহ্-ই-তূরের পাথরে আজ
বেহেশতী ফুল ফুটে হাসে॥

য়্যেতিম-তারণ য়্যেতিম হয়ে
এল রে এই দুনিয়ায়,
য়্যেতিম মানুষ-জাতির ব্যথা
নৈলে বুঝত না সে॥

সূর্য ওঠে, ওঠে রে চাঁদ,
মনের আঁধার যায় না তায়,
হৃদ-গগন যে করল রওশন,
সেই মোহাম্মদ ঐ রে হাসে॥

আপন পুণ্যের বদলাতে যে
মাগিল মুক্তি সবার,
উম্মতি উম্মতি করে
দেখ আঁখি তাঁর জলে ভাসে॥

৮৫

বেহাগ—কার্ফা

মরহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল-আরবী।
বাদশারও বাদশাহ্ নবীদের রাজা নবী॥

ছিলে মিশে আহাদে, আসিলে আহ্‌মদ হয়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার এলে খোদার সনদ লয়ে ;
মানুষে উদ্ধারিলে মানুষের আঘাত সয়ে,
মলিন দুনিয়ায় আনিলে তুমি সে বেহেশতী ছবি॥

পাপের জেহাদ-রণে দাঁড়াইলে তুমি একা,
নিশান ছিল হাতে 'লা শরীক আল্লাহু' লেখা ;
গেল দুনিয়া হতে ধুয়ে মুছে পাপের রেখা,
বহিল খুশির তুফান, উদিল পুণ্যের রবি॥

৮৬

ভীম পলশ্রী—কার্ফা

মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লেআলা
তুমি বাদশারও বাদশাহ কমলিওয়ালা॥

পাপে-তাপে পূর্ণ আঁধার দুনিয়া
হলো পুণ্য বেহেশতি নূরে উজালা॥

গুনাহগার উম্মত লাগি তব
আজো চয়ন নাহি, কাঁদিছ নিরালা॥

কিয়ামতে পিয়াসী উম্মত লাগি
দাঁড়ায়ে রবে লয়ে তহুরার পিয়ালা॥

জ্বলিবে হাশর দিনে দ্বাদশ রবি,
নফসি নফসি কবে সকল নবী,
য়্যা উম্মতী য়্যা উম্মতী, একেলা তুমি,
কাঁদিবে খোদার পাক আর্শ চুমি—
পাপী উম্মত ত্রাণ তব জপমালা॥

করে আউলিয়া আম্বিয়া তোমারি ধ্যান,
তব গুণ গাহিল নিজে আল্লাহ্‌তালা॥

৮৭

দেশী টোড়ি মিশ্র—কার্ফা

তোমারি প্রকাশ মহান এ নিখিল দুনিয়া জাহান।
তোমারি জ্যোতিতে রওশন নিশিদিন জমিন ও আসমান॥

নিভিল কোটি তপন চাঁদ খুঁজিয়া তোমারে প্রভু,
কত দাউদ ঈসা মুসা করিল তব গুণগান॥

তোমারে কত নামে হায় ডাকিছে বিশ্ব শিশুর প্রায়,
কতভাবে পূজে তোমায় ফেরেশতা হুর পরী ইনসান॥

নিরাকার তুমি নিরঞ্জন ব্যাপিয়া আছ ত্রিভুবন,
পাতিয়া মনের সিংহাসন ধরিতে চাহে তবু প্রাণ॥

গীতি-শতদল

দু'টি কথা

'গীতি-শতদলে'র সমস্ত গানগুলিই 'গ্রামোফোন' ও 'স্বদেশী মেগাফোন' কোম্পানির রেকর্ডে রেখা-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার বহু গীত-শিল্পী বন্ধুর কল্যাণে 'রেডিও' প্রভৃতিতে গীত হওয়ায় এই গানগুলি ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অবসরে তাঁহাদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডি. এম. লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু শ্রীগোপালদাস মজুমদার 'গীতি-শতদলে'র বহিসৌষ্ঠবের জন্য অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। ইনি আমার আত্মীয়াধিক, কাজেই ইঁহার ঋণ স্বীকার করিব না।

আমার 'বুলবুল' প্রভৃতি গানের বই-এর মতো 'গীতি-শতদল'-ও স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

বিনয়াবনত

নজরুল ইসলাম

১

আরবি সুর—কাহারবা (তাল)

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
নাচিছে ঘূর্ণিবায়।
জল-তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল
ঢেউ তুলে সে যায়॥

দিঘির বুকের শতদল দলি,
ঝরায়ে বকুল চাঁপার কলি,
চঞ্চল ঝরনার জল ছলছলি
মাঠের পথে সে ধায়॥

বন-ফুল-আভরণ খুলিয়া ফেলিয়া,
আলুথালু এলোকেশ গগনে মেলিয়া,
পাগলিনী নেচে যায় হেলিয়া-দুলিয়া
ধূলি-ধূসর কায়॥

ইরানি বালিকা যেন মরু-চারিণী
পল্লির প্রান্তর-বন-মনোহারিণী
ছুটে আসে সহসা গৈরিক-বরণী
বালুকার উড়ুনি গায়॥

২

আরবি (নৃত্যের) সুর—কার্ফা

চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়
পল্লি-বালিকা বন-পথে যায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

শাড়ি তার কাঁটা-লতায়
জড়িয়ে জড়িয়ে যায়,
পাগল হাওয়াতে অঞ্চল লয়ে মাতে
যেন তার তনু পরশ চায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

শিরিষের পাতায় নূপুর
বাজে তার ঝুমুর ঝুমুর;
কুসুম ঝরিয়া মরিতে চাহে তার কবরীতে,
পাখি গায় পাতার ঝরোকায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

চাহি তার নীল নয়নে
হরিণী লুকায় বনে,
হাতে তার কাঁকন হতে মাধবীলতা কাঁদে,
ভ্রমরা কুন্তলে লুকায়।
একেলা বন-পথে যায়॥

৩

ইমন মিশ্র—কাওয়ালি

ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা
নাচে গিরি-কন্যা চঞ্চল ঝর্না
নন্দন-পথ-ভোলা চন্দন-বর্ণা॥

গাহে গান ছায়ানটে,
পর্বতে শিলাতটে,
লুটায়ে পড়ে তীরে শ্যামল ওড়না॥

ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ধীরিধীরি বাজে
তরঙ্গ-নূপুর বন-পথ-মাঝে।

এঁকেবেঁকে নেচে যায় সর্পিল ভঙ্গে
অপরূপ রঙ্গে কুরঙ্গ সঙ্গে,

গুরু গুরু বাজে তাল মেঘ-মৃদঙ্গে,
সেই তালে তালে নাচে বালিকা অপর্ণা॥

৪

শঙ্করা—একতালা

পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ
বউ-কথা-কও উঠল ডেকে।
শিস দিয়ে যায় উদাস হাওয়া
নেবু-ফুলের আতর মেখে॥

এমন পূর্ণ চাঁদের রাতি
নেই গো সাথে জাগার সাথি,
ফুল-হারা মোর কুঞ্জ-বীথি
কাঁটার স্মৃতি গেছে রেখে॥

শূন্য মনে একলা গুনি
কান্না-হাসির পান্না-চুনি,
বিদায়-বেলার বাঁশি শুনি
আসছে ভেসে ওপার থেকে॥

৫

পিলু—দাদ্‌রা

এসো বসন্তের রাজা হে আমার
এসো এ যৌবন-বাসর-সভাতে।
ফুলের দরবারে পাখির জলসাতে
বুকের অঞ্চল-সিংহাসনে মম
বসো আমার চাঁদ চাঁদিনী রাতে॥

রূপের দীপালি মোর জ্বলবে তোমায় ঘিরে বঁধু,
পিয়াব তোমায় পিয়া কানে কানে কথার মধু।

বন-কুসুমের মালা দিব বাহুর মালার সাথে
চরণে হবো দাসী বন্ধু হবো দুখ-রাতে॥

৬

পিলু—কাফি-কার্ফা

তুমি নন্দন-পথ ভোলা
মন্দাকিনী-ধারা উতরোলা॥

তোমার প্রাণের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে মধু উঠিল জেগে,
দোলন-চাঁপাতে লাগে দোলা॥

তোমারে হেরিয়া পুলকে ওঠে ডাকি
বকুল-বনের ঘুম-হারা পাখি,
ধরার চাঁদ তুমি চির-উতলা॥

৭

আশোয়ারী—দাদ্‌রা

তোমার ফুলের মতন মন।
ফুলের মতো সইতে নারে একটু অযতন॥

ভুল করে এই কঠিন ধরায়
তুমি কেন আসিলে হায়,
একটি রাতের তরে হেথায়
ফুলের জীবন॥

গাঁথবে মালা পরবে গলায়
অর্ঘ্য দেবে দেবতা-পায়,
ফেলে দেবে পথের ধূলায়
মিটলে প্রয়োজন॥

৮

ভৈরবী—খেমটা

হেসে হেসে কলসি নাচাইয়া কিশোরী চলে।
রিনিঠিনি কলস-কাঁকনে কি কথা বলে॥

নেচে চলে চাঁপা-বরনা যেন ঝরনা
বাহু দোলাইয়া,
নয়ান-কুরঙ্গ জাগায় গো তরঙ্গ
নদীর জলে॥

এত রূপ লাখ চোখে ধরে না
তারে দেখি কি করে,
বিধি দিল দুটি আঁখি আমারে
তাহে হায় পলক পড়ে।

গ্রামের পথ চাহে তারে
ডাকে বাঁশি বন-পারে,
গিরি দরি নদী চাহে যারে
তাহারে চাহি কোনো ছলে॥

৯

দেশ—কাওয়ালি

ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়
জাগিও না উহারে ঘুমাইতে দাও।
বনের পাখি ধীরে গাহ গান
দখিনা হাওয়া ধীরে ধীরে বয়ে যাও॥

এখনো শুকায়নি চোখে তার জল,
এখনো অধরে হাসি ছলছল,
প্রভাত-রবি শুকায়ো না তায়
ধীর কিরণে তাহার নয়নে চাও॥

সামলে পথিক ফেলিয়ো চরণ,
ঝরেছে হেথায় ফুলের জীবন,
ভুলিয়া দলো না ঝরাপাতাগুলি
ফুল-সমাধি থাকিতে পারে হেথাও॥

১০

পিলু মিশ্র—দাদ্‌রা

গত রজনীর কথা পড়ে মনে
রজনীগন্ধার মদির গন্ধে।
এই সে ফুলেরই মোহন মালিকা
জড়ায়েছিল সে কবরী-বন্ধে॥

বাহুর বল্লরী জড়ায়ে তার গলে
আধেক আঁচলে বসেছি তরুতলে,
দুলেছে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥

মুখরা 'বউ কথা কও' ডেকেছে বকুল-ডালে
লাজে ফুটেছে লালি গোলাপ-কুঁড়ির গালে।
কপোলের কলঙ্ক মোর মেটেনি আজো যে সই
জাগিছে তারি স্মৃতি চাঁদের কপোলে ঐ।
কাঁদিছে নন্দন আজি নিরানন্দে॥

১১

পলাশী মিশ্র—কাহারবা

পলাশ ফুলের গেলাস ভরি
পিয়াব অমিয়া তোমারে পিয়া।
চাঁদিনী রাতের চাঁদোয়া-তলে
বুকের এ আঁচল দিব পাতিয়া॥

নয়ন-মণির মুকুরে তোমার
দুলিবে আমার সজল ছবি,

সবুজ ঘাসের শিশির ছানি
মুক্তা-মালিকা দিব গাঁথিয়া ॥

ফিরোজা আকাশ আবেশে ঝিমায়,
দিঘির বুকে কমল ঘুমায়,
নীরব যখন পাখির কূজন
আমরা দুজন রবো জাগিয়া ॥

ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায়
ঘুমাব মোরা প্রিয় ঘুম যদি পায়,
বনের শাখা ঢুলাবে পাখা,
ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া ॥

১২

পঞ্চমরাগ মিশ্র—কাওয়ালি

রহি রহি কেন আজো সেই মুখ মনে পড়ে।
ভুলিতে তায় চাহি যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে ॥

দিয়াছি তাহারে বিদায় ভাসায়ে নয়ন-নীরে,
সেই আঁখি-বারি আজি মোর নয়নে ঝরে ॥

হেনেছি যে অবহেলা পাষাণে বাঁধি হিয়া,
তারি ব্যথা পাষাণ-সম রহিল বুকে চাপিয়া ॥

সেই বসন্ত ও বরষা আসিবে ফিরে ফিরে,
আসিবে না আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে ॥

১৩

দেশমিশ্র—আদ্ধা কাওয়ালি

পিউ পিউ বোলে পাপিয়া।
বুকে তার পিয়ারে চাপিয়া ॥

বাতাবি নেবুর ফুলেলা কুঞ্জে
মাতাল সমীরণ প্রলাপ গুঞ্জে,
ফুলের মহলায় চাঁদিনী শিহরায়
নদীতটে ঢেউ ওঠে ছাপিয়া॥

এমনি নেবুফুল এমনি মধুরাতে
পরাত বঁধু মোর বিনোদ খোঁপাতে,
বাতায়নে পাখি করিত ডাকাডাকি,
মনে পড়ে তায় উঠি কাঁপিয়া॥

১৪

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

চাঁদের পিয়ালাতে আজি
জোছনা-শিরাজি ঝরে।
ঝিমায় নেশায় নিশীথিনী
সে শারাব পান করে॥

সবুজ বনের জলসাতে
তৃণের গালিচা পাতে
উতল হাওয়া বিলায় আতর
চাঁপার আতরদানি ভরে॥

শাদা মেঘের গোলাব-পাশে
ঝরিছে গোলাব-পানি,
রজনীগন্ধার গেলাসে
রজনী দেয় সুরা আনি।

কোয়েলিয়া কুহু কুহু
গাহে গজল মুহু মুহু,
সুরের নেশা সুরার নেশা
লাগে আজি চরাচরে॥

১৫

সিন্ধু কাফি—দাদ্‌রা

এসো শারদ-প্রাতের পথিক
এসো শিউলি-বিছানো পথে।
এসো ধুইয়া চরণ শিশিরে
এসো অরুণ-কিরণ-রথে॥

দলি শাপলা শালুক শতদল
এসো রাঙায়ে তোমার পদতল,
নীল লাবণি ঝরায়ে ঢলঢল
এসো অরণ্যে পর্বতে॥

এসো ভাদরের ভরা নদীতে ভাসায়ে
কেতকী পাতার তরণী
এসো বলাকার ঝরা পালক কুড়ায়ে
বাহি ছায়াপথ-সরণি।

শ্যাম শস্যে কুসুমে হাসিয়া
এসো হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া
এসো ধরণীরে ভালোবাসিয়া
দূর নন্দন-তীর হতে॥

১৬

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

মালঞ্চে আজ কাহার যাওয়া-আসা।
ঝরা পাতায় বাজে
মৃদুল তাহার পায়ের ভাষা॥

আসার কথা জানায়
ঐ যে ফুলের আখর সবুজ পাতায়,
ঐ দোয়েল শ্যামার কূজন কয় যে বাণী
ঐ ঐ ঐ তার ভালোবাসা॥

মদির সমীরণে
তার তনুর সুবাস পাই যে ক্ষণে ক্ষণে।
সবুজ বসন ফেলি
পরল ঐ বন কুসমি-রঙা চেলি।
তাই বসুন্ধরায় জাগে
অরুণ আশা
ঐ ঐ ঐ আলোকের পিপাসা॥

১৭

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়
নবীন আমন ধানের খেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির-নাওয়া হিমেল হাওয়া
সেই নাচনে উঠল মেতে॥

টই-টুম্বুর ঝিলের জলে
কাঁচা রোদের মানিক ঝলে,
চন্দ্র ঘুমায় গগন-তলে
শাদা মেঘের আঁচল পেতে॥

নট্‌কান-রঙ শাড়ি পরে কে বালিকা
ভোর না হতে যায় কুড়াতে শেফালিকা!

আন্‌মনা মন উড়ে বেড়ায়
অলস প্রজাপতির পাখায়,
মৌমাছিদের সাথে সে চায়
কমল-বনের তীর্থে যেতে॥

১৮

জৌনপুরী টোড়ি—একতালা

আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো
আজ যে যাবার সময় হোলো॥

নীববে যখন আমার বাতি
আসবে তোমার নূতন সাথি
আমার কথা তারে বোলো॥

ব্যথা দেওয়ার কী যে ব্যথা
জানি আমি, জানে দেবতা।

জানিলে না কী অভিমান
করেছে হায় আমায় পাষাণ
দাও যেতে দাও, দুয়ার খোলো॥

১৯

ভৈরবী—দাদ্‌রা

হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু পারলে না হায় ফুল ফোটাতে।
মৌমাছি যে ফুলও ফোটায় হুল ফোটানোর সাথে সাথে॥

আঘাত দিলে, দিলে বেদন,
রাঙাতে হায় পারলে না মন,
প্রেমের কুঁড়ি ফুটল না তাই
পড়ল ঝরে নিরাশাতে॥

আমায় তুমি দেখলে নাকো, দেখ্‌লে আমার রূপের মেলা।
হায় রে দেহের শ্মশান-চারী, শব নিয়ে মোর করলে খেলা।
শয়ন-সাথি হলে আমার রইলে নাকো নয়ন-পাতে॥

ফুল তুলে হায় ঘর সাজালে, করলে নাকো গলার মালা,
ত্যাজি সুধা পিয়ে সুরা হলে তুমি মাতোয়ালা।
নিশাস ফেলে নিভাইলে যে দীপ আলো দিত রাতে॥

২০

মাঢ়-খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা

গোধূলির রঙ ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ-গগনে।
বিবাহের বাজল বাঁশি আজি বিদায়ের লগনে॥

নূতন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে,
সুন্দর লাগে ধরা নিবু নিবু মোর নয়নে॥

এতদিন কেঁদে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে,
আজি যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥

আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে,
সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে॥

হইল ধন্য প্রিয় মরণ-তীর্থ মম,
সুন্দর মৃত্যু এলে বরের বেশে শেষ জীবনে॥

২১

দেশি টোড়ি মিশ্র—লাউনী

সকরুণ নয়নে চাহে আজি মোর বিদায়-বেলা
ভুলিতে দাও বিদায়-দিনে হেনেছ যে অবহেলা॥

হাসিয়া কহ কথা আজ হাসিতে যেমন আগেতে
হেরিবে মোর জীবন-সাঁঝে গোধূলির রঙের খেলা॥

থেকে যাও আরো কিছুখন থাকিতে বলিব না কাল,
মরণ-সাগর পানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা॥

আজিকার সাঁঝের ছায়া যেন না পড়ে ও মুখে,
সাঁঝের শেষে যেন আসে চাঁদের আর তারকার মেলা॥

হে বন্ধু, বন্ধুর পথে কে কাহার হয়েছে সাথি,
তেমনি থাকিয়া যায় সব, যাবার যে যায় সে একেলা॥

২২

রাগেশ্রী—আদ্ধা কাওয়ালি

বাজিছে বাঁশরি কার অজানা সুরে।
ডাকিছে সে যেন তার সুদূর বঁধূরে॥

তারা-লোকের সাথিরে যেন সে চাহে ধরাতে,
তারি কাঁদন যেন ঝরা কুসুমে ঝুরে॥

চাঁদের স্বপন লয়ে জাগে সে নিশীথে একা,
নিরালা গাহে গান হায় বিষাদ-মধুরে॥

তাহারি অভিমান যেন উঠিছে বাতাসে কাঁপি,
তাহারি বেদনা দূর আকাশে ঘুরে॥

২৩

পিলু—খেম্‌টা

বন-হরিণীরে তব বাঁকা আঁখির
ওগো শিকারী, মেরো না তীর॥

ভীরু-হরিণী বনের ছায়ায়
খেলে বেড়ায় সে অধীর (চপলা)।
তার সুখ হাসি সাধ লয়ে হে নিষাদ
দিও না নয়নে নীর॥

আজো বোঝে না সে বাঁকা-চোখের ভাষা
পিয়ার লাগি জাগেনি পিয়াসা।
সরল চোখে তার প্রেমের লালি
ফোটেনি আবেশ মদির (নয়নে)।
তার আয়নার প্রায় স্বচ্ছ হিয়ায়
আঁকিও না হায়, দাগ গভীর॥

২৪

গৌড় সারং—কাওয়ালি

রেশমি চুড়ির তালে কৃষ্ণ-চূড়ার ডালে
পিউ কাঁহা পিউ কাঁহা ডেকে ওঠে পাপিয়া।

আঙিনায় ফুল-গাছে প্রজাপতি নাচে
ফেরে মুখের কাছে আদর যাচিয়া॥

দুলে দুলে বনলতা কহিতে চাহে কথা
বাজে তারি আকুলতা কানন ছাপিয়া॥

শ্যামলী-কিশোরী মেয়ে
থাকে দূর-নভে চেয়ে,
কালো মেঘ আসে ধেয়ে
গগন ব্যাপিয়া॥

২৫
ঝিঁঝিট—কার্ফা

সেই পুরানো সুরে আবার গান গেয়ে কে যায় নিতি।
গেয়েছিল এমনি সুরে একদা এক অতিথি॥

কণ্ঠে তাহার এমনি মায়া প্রাণ-মাখানো এমনি,
গাইতো হতাশ তরুণ পথিক এমনি করুণ-গীতি॥

এনেছিল বাসন্তী রঙ তার ছোঁওয়া আমার প্রাণে,
মুছে গেছে রঙের সে দাগ, কে জাগায় ফের তার স্মৃতি॥

চলে গেছে তাহার সাথে বসন্ত মোর অকালে,
ভরে গেছে ঝরা ফুলে শুকনো পাতায় বন-বীথি॥

ভুলিয়া ছিলাম ভালো তাই কি পুন কাঁদাতে
আসিল সে সিঁদুর-রাগে রাঙাতে সাঁঝের সিঁথি॥

২৬
পাহাড়ি—সেতারখানি

ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়
চলে নব অভিসারে ভীরু কিশোরী,
ওঠে পাতাটি নড়িলে সে চমকে॥

হরিণ-নয়নে সভয় চাহনি
আসিছে কে যেন দেখিবে এখনি,
পথে সে দেয় ফেলে নূপুর চুড়ি খুলে,
আপন ছায়া হেরি ওঠে গা ছমকে॥

'চোখ গেল, চোখ গেল' ডাকে পাপিয়া
শুনিয়া শরমে ওঠে কাঁপিয়া,
হায়, যার লাগি এত, কোথায় সে
ঝিল্লি-রবে ভাবে কেউ হবে,
বনে ফুল-ঝরার আওয়াজে দাঁড়ায় সে থমকে॥

২৭

পিলু—ঠুংরি

পিয়াসী প্রাণ তারে চায়
এনে দে তায়।
জনম জনম বিরহী প্রাণ মম
সাথিহীন পাখি সম কাঁদিয়া বেড়ায়॥

চাঁদের দীপ জ্বালি খুঁজিছে আকাশ তারে,
না পেয়ে তাহার দিশা কাঁদে সে বাদল-ধারে।

ঝরে অভিমানে ফুল তারে না-দেখতে পেয়ে,
বহে কাঁদন-নদী পাষাণ-গিরি বেয়ে।
আসিব বলে সে গেছে চলে
(আমি) আজো আছি বেঁচে তারি আশায়॥

২৮

খাম্বাজ—খেমটা

বেলা পড়ে এলো জলকে সই চল চল
ডাকিছে ওই তটিনী ছলছল॥

বকের সারিকার মালিকা দুলিয়ে,
আসিছে সাঁঝ ঐ চিকুর এলিয়ে,
আকাশের কোলে শিশু শশীরে ঐ
দেখিতে আসিছে তারকা দলে দল॥

কমলিনীর মলিন মুখ
হাসে জলে শাপলা শালুক,
বনের পথ হলো আঁধার
জোনাকি ঐ চমকে ঝলমল॥

২৯

সিন্ধু মিশ্র—খেম্‌টা

এলো ফুলের মহলে ভোমরা গুনগুনিয়ে।
ও-সে কুঁড়ির কানে কানে কি কথা যায় শুনিয়ে॥

জামের ডালে কোকিল কৌতূহলে,
আড়ি পাতি ডাকে কূ কূ বলে
হাওয়ায় ঝরা পাতার নূপুর বাজে রুনঝুনিয়ে॥

'ধীরে সখা ধীরে'—কয় লতা দুলে,
জাগিও না কুঁড়িরে, কাঁচা ঘুমে তুলে,—
'গেয়ো না গুনগুন গুনগুন সুরে
প্রেমে ঢুলে ঢুলে।'
নিলাজ ভোমরা বলে, 'না—না—না—না',
—ফুল দুলিয়ে॥

৩০

ভৈরবী—দাদ্‌রা

ফিরে ফিরে দ্বারে আসে যায় কে নিতি।
তার অধরে হাসি আর নয়নে প্রীতি॥

দোদুল তাহার কায়া ঘনায় চোখে মায়া
জেগে ওঠে দেখে তায় পুরানো স্মৃতি॥

তাহার চরণ-পাতে তাহার সাথে সাথে
আসে আঁধার রাতে শুক্লা চাঁদের তিথি॥

গেলে মন দিতে চাহে না সে নিতে,
ধরিতে গেলে চোখে সে কী তার ভীতি॥

ডাকি প্রিয় বলে তবু সে যায় চলে,
পায়ে পায়ে দলে হৃদয় ফুল-বীথি॥

৩১

জংলা—খেমটা

আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম কুসুম
ভোমরারে যেতে বল।
সখি গুঞ্জরি ফেরে কেন কুঞ্জে
বৃথাই এত ছল॥

কত কি শুনিয়ে যায় গুনগুনিয়ে হায়,
পাতার ঝরোকায় ঘোরে সে অবিরল॥

আমার প্রাণের ভিতর কেন ওঠায় সে ঝড়,
তারে ফিরালে ফেরে না হাসে কেবল,
সে ফিরিয়া গেলে চোখে আসে জল!
এ কী হলো দায় আঁখি নাহি চায়
না দেখিলে তায় প্রাণ পাগল॥

৩২

রসিয়া—কার্ফা

পলাশ-মঞ্জরী পরায়ে দে লো মঞ্জুলিকা।
আজি রসিয়ার রাসে হবো আমি নায়িকা লো
মঞ্জুলিকা॥

কৃষ্ণচূড়ার সাথে রঙিন অশোকে
বুলাল রঙের মোহন তুলিকা লো
মঞ্জুলিকা॥

মাদার শিমুল ফুলে, রঙিন পতাকা দোলে,
জ্বলিছে মনে মনে আগুন শিখা লো
মঞ্জুলিকা॥

৩৩

কাজরী—কার্ফা

এ ঘোর শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
হায়, রহি রহি সেই মুখ পড়িছে মনে॥

বিজলিতে সেই আঁখি
চমকিছে থাকি থাকি,
শিহরিত এমনি সে বাহু-বাঁধনে॥

কদম-কেশরে ঝরে তারি স্মৃতি,
ঝরঝর বারি যেন তারি গীতি।
হায় অভিমানী হায় পথচারী,
ফিরে এসো ফিরে এসো তব ভবনে॥

শনশন বহে বায় সে কোথায় সে কোথায়,
নাই নাই ধ্বনি শুনি উতল পবনে হায়,
চরাচর দুলি অসীম রোদনে॥

৩৪

বারোয়াঁ—ঠুংরি

দিও ফুলদল বিছায়ে
পথে বঁধুর আমার।
পায়ে পায়ে দলি ঝরা সে ফুলদল
আজি তার অভিসার॥

আমার আকুল অশ্রুবারি দিয়ে
চরণ দিও তার ধোয়ায়ে,
মম পরান পুড়ায়ে জ্বেলো
দীপালি তাহার॥

৩৫
তিলক-কামোদ—ঠুংরি

অবুঝ মোর আঁখি-বারি
আমি রোধিতে নারি॥

গলেছে যে নদী-জল
কে তারে রোধিবে বল,
পাষাণের সে নারায়ণ
তবু সে আমারি॥

৩৬
গারা খাম্বাজ—দাদ্‌রা

উচাটন মন ঘরে রয় না (পিয়া মোর)।
ডাকে পথে বাঁকা তব নয়না (পিয়া মোর)॥

ত্যাজিয়া লোক-লাজ
সুখ-সাধ গৃহ কাজ,—
নিজ গৃহে বনবাস সয় না (পিয়া মোর)॥

লইয়া স্মৃতির লেখা
কত আর কাঁদি একা
ফুল গেলে কাঁটা কেন যায় না (পিয়া মোর)॥

৩৭
দাদ্‌রা—(ঠুংরি)

ফিরে গেছে সই এসে (নন্দকুমার)।
অভিমানে ডাকিনি হেসে (নন্দকুমার)॥

হানিয়া অবহেলা
এ কী হলো জ্বালা,
ডাকি আজি তাহারেই
নয়নে জলে ভেসে—(নন্দকুমার)॥

৩৮

পিলু—কার্ফা

ছাড়ো ছাড়ো আঁচল বঁধু
যেতে দাও।
বনমালী, এমনি করে মন ভোলাও॥

একা পথে দুপুরবেলা
নিরদয়, একি খেলা!
তুমি এমনি করে মায়া-জাল বিছাও॥

পথে দিয়ে বাধা
একি প্রেম সাধা,
আমি নহি তো রাধা, বঁধু, ফিরে যাও॥

নিখিল নর-নারী
তোমার প্রেম-ভিখারি
লীলা বুঝিতে নারি তব শ্যামরাও।

৩৯

পিলু—খেম্‌টা

কুল রাখো না-রাখো
তুমি সে জানো,
গোকুলে তোমার কাজ
কুল-ভোলানো॥

মহতের পিরিতি
বালির বাঁধ সম,
কভু হাতে দাও দড়ি
কভু চাঁদ আনো॥

কভু তুমি রাধার, চন্দ্রাবলীর কভু,
যখন যার তখন তার দিকে টানো॥

রাজার অপরাধের নালিশ কোথায় করি,
তুমি জানো শুধু বাঁশিতে মন-ভেজানো॥

৪০

দেশ—কাওয়ালি

ফিরিয়া এসো এসো হে ফিরে
বঁধু এ ঘোর বাদলে নারি থাকিতে একা।
হায় গগনে মনে আজ মেঘের ভিড়
যায় নয়ন-জলে মুছে কাজল-লেখা॥

ললাটে কর হানি কাঁদিছে আকাশ
শ্বসিছে শনশন হুতাশ বাতাস,
তোমারি মতো ঝড় হানিছে দ্বারে কর,
খোঁজে বিজলি তোমারি পথ-রেখা॥

মেঘেরে শুধাই তুমি কোথায়,
কাঁদন আমার বাতাসে ডুবে যায়!
ঝড়ের নূপুর পরি রাঙা পায়
মোর শ্যামল-সুন্দর দাও দেখা॥

৪১

ভৈরবী—তাল ফেরতা

আঁখি ঘুম-ঘুম নিশীথ নিঝুম ঘুমে ঝিমায়।
বাহুর ফাঁদে স্বপন-চাঁদে বাঁধিতে চায়॥

আমি কার লাগি
একা নিশি জাগি
বিরহ-ব্যথায় !
সে কোথায় কাহার বুকে বঁধু ঘুমায়।
কাঁদি চাতকিনী বারি-তৃষায়।
ফুল-গন্ধে আজি যেন বিষ-মাখা হায়॥

কেন এ ব্যথা এ আকুলতা
পরের লাগি এ পরান পুড়ে,
মরুভূমিতে বারি কভু কি ঝুরে।
কাঁদে চকোর, চাঁদ হাসে সুদূরে।
(আমি) এবার যেন মরে আসি তারি রূপ ধরে
সে যাহারে চায়॥

৪২

ভৈরবী—আদ্ধা কাওয়ালি

সেদিনো প্রভাতে রাতুল শোভাতে
হেসেছে বুকে মোর চারু-হাসিনী।
পরেছ খোঁপাতে আমার দেওয়া ফুল
সে কি গো সবি ভুল বিজন-বাসিনী॥

যেচেছ কত না আদর সোহাগ
ক্ষণে অভিমান ক্ষণে অনুরাগ,
কত প্রিয় নামে ডেকেছ আমারে
সে কি গেছ ভুলে মধু-ভাষিণী॥

আমার আশা সাধ সাধনা সুখ হাসি
তোমার সাথে প্রিয় গিয়াছে সব ভাসি।
কেন ফেলে দিলে নিরাশার কূলে,
কোন অপরাধে বলো উদাসিনী॥

৪৩

ভৈরবী—কার্ফা

জাগো জাগো, রে মুসাফির
হয়ে আসে নিশিভোর।
ডাকে সুদূর পথের বাঁশি
ছাড় মুসাফিরখানা তোর॥

অস্ত-আকাশ-অলিন্দে ঐ পাণ্ডুর কপোল রাখি
কাঁদে মলিন ভোরের শশী, বিদায় দাও বন্ধু চকোর॥

পেয়েছিলি আশ্রয় শুধু, পাসনি হেথায় স্নেহ-নীড়,
হেথায় শুধু বাজে বাঁশি উদাস সুরে ভৈরবীর।
তবু কেন যাবার বেলা ঝরে রে তোর নয়ন-লোর॥

মরুচারী, খুঁজিস সলিল অগ্নিগিরির কাছে হায়,
খুঁজিস অমর ভালোবাসা এই ধরণীর এই ধূলায়।
দারুণ রোদের দাহে খুঁজিস কুঞ্জ-ছায়া স্বপ্ন-ঘোর॥

৪৪

ভৈরবী—দাদরা

কতো জনম যাবে তোমার বিরহে।
শত স্মৃতি জ্বালা পরান দহে॥

শূন্য যে গৃহ মোর শূন্য জীবন,
একা থাকার ব্যথা আর কতো সহে (ওগো)
স্মৃতির জ্বালা পরান দহে॥

দিয়াছি যে ব্যথা জীবন ভরি হায়
গলি নয়ন-ধারায় সে ব্যথা বহে
স্মৃতির জ্বালা পরান দহে॥

৪৫

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

হায় ঝরে যায় মোর আশা-কুসুম ঝরে ঝরে।
ফিরে যায় কেঁদে বসন্ত কুঞ্জ-দুয়ারে॥

বহিল বৈশাখী ঝড়, ঝরিয়া গেল বনফুল,
বিঁধিছে কণ্টক স্মৃতির, উড়িয়া গেল গো বুলবুল।

যেন কার ব্যথিত নিশাস শ্বসিয়া ফিরিছে হেথা,
দলিত রাঙা গোলাপে জাগিছে তাহারি ব্যথা।
মুরছায় দশ দিশি যেন ব্যথা-ভারে॥

ছিল যথায় রাঙা ফুল-মেলা,
আজি পাতা ঝরার সেথা খেলা।
অবেলায় বাজে বিদায় বাঁশি বন-পারে॥

৪৬

কাফি মিশ্র—কার্ফা

এ কোথায় আসিলে হায়, তৃষিত ভিখারি।
হায় পথ-ভোলা পথিক, হায় মৃগ মরুচারী॥

মোর ব্যথায় চরণ ফেলে
চির-দেবতা কি এলে,
হায়, শুকায়েছে যবে মোর নয়নে নয়ন-বারি॥

তোমার আসার পথে প্রিয়
ছিলাম যবে পরান পাতি,
সেদিন যদি আসিতে নাথ
হইতে ব্যথার ব্যথী।
ধোওয়ায়ে নয়ন-জলে
পা মুছাতাম আকুল কেশে,
আজ কেন দিন-শেষে
এলে নাথ মলিন বেশে।
হায় বুকে লয়ে ব্যথা আসিলে ব্যথা-হারী॥

স্মৃতির যে শুকানো মালা যতনে রেখেছি তুলি
ছুঁড়ে সে হার ঝরায়ো না ম্লান তার কুসুমগুলি।
হায় জ্বলুক বুকে চিতা, তায় ঢেলো না আর বারি॥

৪৭

খাম্বাজ মিশ্র—কার্ফা

ভুল করে আসিয়াছি
অপরাধ যেয়ো ভুলে
দেবতা চাহে কি ফুল মরে যবে পদমূলে॥

ভুলে গেছি স্বপন-ঘোরে
তুমি যে ভুলেছ মোরে,
তবু খুঁজি স্মৃতির রেখা
ভাঙন-ধরা মনের কূলে॥

নাহি মনে—ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে,
বিশ্ব আমার শূন্য করে কবে বঁধু বিদায় নিলে।
হাসি-মুখখানি শুধু মনে ওঠে দুলে দুলে॥

আমার স্মৃতির চিতা পুড়িতে সে কত বাকি
দেখিয়া চলিয়া যাব যে দেশে নাই তোমার আঁখি।
তুমি থাকো হাসির দেশে, আমি হতাশার কূলে॥

৪৮

পিলু খাম্বাজ—লাউনি

ভোলো প্রিয় ভোলো ভোলো আমার স্মৃতি।
তোরণ-দ্বারে বাজে করুণ বিদায়-গীতি॥

তুমি ভুল করে এসেছিলে
ভুলে ভালবেসেছিলে,
ভুলের খেলা ভুলের মেলা
তাই প্রিয় ভেঙে দিলে।
ঝরা ফুলে হেরো ঝুরে কানন-বীথি॥

তব সুখ-দিনে তব হাসির মাঝে অশ্রু মম
রবির দাহে শিশির সম শুকাইবে প্রিয়তম!
হাসিবে তব নিশীথে নব চাঁদের তিথি॥

ফোটে ফুল যায় ঝরে
গহন বনে অনাদরে,
গোপনে মোর প্রেম-কুসুম
তেমনি গেল গো মরে ;
আমার তরে কাঁটার ব্যথা কাঁদুক নিতি॥

৪৯

আশাবরী—দাউনি

আমি যেদিন রইব না গো
লইব চির-বিদায়।
চিরতরে স্মৃতি আমার
জানি মুছে যাবে, হায়॥

আর্শিতে তার ছায়া পড়ে
রয় যবে সে সুমুখে,
সে যবে যায় দূরে চলে
অমনি ছবি মিলায়॥

এই ধরণীর খেলা-ঘরে
মনে রাখে কে কারে,
দুলে সাগর চাঁদ-সোহাগে
মরু মরে পিপাসায়॥

রবি যবে ওঠে নভে
চাঁদে কে মনে রাখে,
একূল ভাঙে ওকূল গড়ে
মানুষের মন নদীর প্রায়॥

মোর সমাধির বুকে প্রিয়
উঠবে তোমার বাসর-ঘর,
হায়, অসহায় ভিখারি মন
কাঁদে তবু সেই ব্যথায়॥

৫০

বেহাগ-খাম্বাজ—দাদরা

এলে   কে গো চির-সাথী অবেলাতে
যবে   ঝুরিছে সন্ধ্যামণি আঙিনাতে॥

রোদের দাহে এলে স্নিগ্ধ-বাস ফুল-রেণু
নিঝুম প্রাণে এলে বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
    চাঁদের তিলক এলে আঁধার রাতে॥

ফুল ঝরার বেলা এলে কি শেষ অতিথি,
কাঁদে হা হা স্বরে রিক্ত কানন-বীথি।

এলে কোন মরুভূমে পিয়াসী দয়িত মোর,
শুক্লাতিথির শেষে কাঁদিতে এলে চকোর।
    আসিলে জীবন-সাঁঝে ঘুম ভাঙাতে॥

৫১

ঝুমুর—খেমটা

ও তুই   যাসনে রাই-কিশোরী কদম-তলাতে।
সেথা   ধরবে বসন-চোরা ভূতে
    পারবিনে আর পলাতে।
    —কদম-তলাতে॥

সে   ধরলে কি আর রক্ষে আছে,
তোর   বসন গিয়ে উঠবে গাছে,
ওলো   গোবর্ধন-গিরি-ধারী সে
    পারবিনে তায় টলাতে।
    —কদম-তলাতে॥

দেখতে পেলে ব্রজবালা
ঘট কেড়ে সে ঘটায় জ্বালা,
ওগো   নিজেই গলে জল হবি তুই
    পারবিনে তায় গলাতে।
    —কদম-তলাতে॥

ঠেলে ফেলে অগাধ নীরে
সে হাসে লো দাঁড়িয়ে তীরে,
শেষে ভাসিয়ে নিয়ে প্রেম-সাগরে
দোলায় নাগর-দোলাতে।
—কদম-তলাতে॥

৫২

সিন্ধু—কাওয়ালি

দুঃখ ক্লেশ শোক পাপ তাপ শত
শ্রান্তি মাঝে হরি শান্তি দাও দাও॥

কাণ্ডারী করত্রর পার করো করো পার
উত্তাল তরঙ্গ অশান্তি-পারাবার,
অভাব দৈন্য শত হৃদি-ব্যথা-ক্ষত,
যাতনা সহিব কত প্রভু, কোলে তুলে নাও॥

হে দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু,
অম্বর ব্যাপি ঝরে তব কৃপা-বিন্দু,
মরুর মতন চেয়ে আছি নব ঘনশ্যাম—
আকুল তৃষ্ণা লয়ে, প্রভু পিপাসা মিটাও॥

৫৩

বেহাগ-খাম্বাজ—ঠুংরি

ভোলো অতীত-স্মৃতি ভোলো কালা।
কি হবে কুড়ায়ে ছিন্ন এ মালা॥

মিছে রোধি পথ
মিনতি করিছ কত,
জাগায়ে পুরানো ক্ষত
দিও না জ্বালা॥

৫৪

সুরট মিশ্র—ঝাঁপতাল

চির-কিশোর মুরলীধর কুঞ্জবন-চারী
গোপনারী-মনোহারী বামে রাধা প্যারি॥

শোভে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে,
গোষ্ঠ-বিহারী কভু, কভু দানবারি॥

তমাল-তলে কভু কভু নীপ-বনে
লুকোচুরি খেলো হরি ব্রজ-বধূ সনে।
মধুকৈটভারি কংস-বিনাশন,
কভু কণ্ঠে গীতা, শিখী-পাখা-ধারী॥

৫৫

বাউল-দাদ্‌রা

সাগর আমায় ডাক দিয়েছে
মন-নদী তাই ছুটছে ঐ।
পাহাড় ভেঙে মাঠ ভাসিয়ে
বন ডুবিয়ে তাই তো বই॥

তরঙ্গে তাই রাত্রিদিন
গান গেয়ে যাই নিদ্রাহীন
বাজিয়ে ঢেউ-এর বীণ।
বন্যা এনে মায়ার পুরী ভাসিয়ে নাচি তাথৈ থৈ॥

৫৬

বাউল—কার্ফা

ভালোবেসে অবশেষে কেঁদে দিন গেল।
ফুল-শয্যা বাসি হলো, বঁধু না এল॥

পানের খিলি শুকাইল বাটাতে ভরা,
এ পান আমি কারে দিব সে বঁধু ছাড়া,
নীলাম্বরী শাড়ি ছি ছি পরলেম মিছে লো॥

সখি এবার ধরে দিস যদি তায়
তারে রাখ্‌ব বেঁধে বিনোদ খোঁপায়
কাঙালে পাইলে রতন যেমন রাখে লো॥

সোঁদা-মাখা দিসনে কেশে, গন্ধে যে লো তার
মনে আনে চন্দন-গন্ধ সোনার বঁধুয়ার।
এত দুঃখ ছিল আমার এই বয়সে লো॥

৫৭

পাহাড়ি মিশ্র—কার্ফা

এসো নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া
কৃষ্ণ কানাইয়া হরি।
মাখি গোখুর-ধূলিরেণু গোঠে চরাইয়া ধেনু
বাজায়ে বাঁশের বাঁশরি॥

গোপী-চন্দন-চর্চিত অঙ্গে
প্রাণ মাতাইয়া প্রেম-তরঙ্গে,
বামে হেলায়ে ময়ূর-পাখা দুলায়ে তমাল-শাখা
নীপ-বনে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে।
এসো লয়ে সেই শ্যাম-শোভা ব্রজ-বধূ মনোলোভা
সেই পীত বসন পরি॥

এসো গগনে ফেলি নীল ছায়া,
আনো পিপাসিত চোখে মেঘ-মায়া
এসো মাধব মাধবী-তলে,
এসো বনমালি বন-মালা গলে,
এসো ভক্তিতে প্রেমে আঁখি জলে।
এসো তিলক-লাঞ্ছিত সুর-নর-বাঞ্ছিত
বামে লয়ে রাই কিশোরী॥

৫৮

কানাড়া মিশ্র—কার্ফা

রাস-মঞ্চোপরি দোলে মুরলীধারী
নটবর সুন্দর শ্যাম।
নবঘন শ্যামল লাবণি ঢলঢল,
অবনী টলমল টলে অবিরাম॥

দোলে যমুনা-জল, রাধা গোপিনী-দল,
কদম-তমাল তরু দোলে,
নাচে ধেনু বেণু-রবে ময়ূর-ময়ূরী সবে,
দোলে হলধর বলরাম॥

দোলে চরাচর ব্রহ্মা বিষ্ণু হর
সুর অসুর নর দোলে,
প্রেম-প্রীতি স্নেহ হৃদি প্রাণ দেহ—
বন গৃহ প্রান্তর দোলে,
প্রেম-বিগলিতা বিশাখা ললিতা
দোলে শ্রীদাম সুদাম॥

৫৯

বেহাগ মিশ্র—কার্ফা

নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দ-দুলাল।
মোর প্রাণে মোর মনে এসো ব্রজ-গোপাল॥

এসো নূপুর রুনুঝুনু পায়ে,
এসো প্রেম-যমুনা নাচায়ে
এসো বেণু বাজায়ে এসো ধেনু চরায়ে
এসো কানাই রাখাল॥

এসো ঝুলনে হোরিতে রাসে,
কুরুক্ষেত্র-রণে, এসো প্রভাসে,

এসো শিশুরূপে, এসো কিশোর বেশে,
এসো কংস-অরি, এসো মৃত্যু করাল ॥

এসো মহা-ভারতের দেবতা,
আনো নৃত্যের তালে নব বারতা,
এসো মধু-কৈটভ-অরি আনো নব গীতা,
এসো নারায়ণ ভগবান বিশ্ব-ভূপাল ॥

৬০
খাম্বাজ—কার্ফা

নাচে ঐ আনন্দে নন্দ-দুলাল।
তাতা থৈ তাতা থৈ—
নাচে বৃন্দাবনে হরি ব্রজ-গোপাল ॥

ছন্দ নামে, দক্ষিণে বামে,
টলে বাঁকা শিখী-পাখা
উছল যমুনা-জলে বাজিছে তাল।
নাচে নন্দ-দুলাল ॥

বিরাট খেলে হেরো আজ শিশুর রূপে,
স্বর্গে কাঙাল করি ধরায় এল চুপে চুপে।

এত রূপ কেমনে দেখি,
দিলে বিধি দুটি আঁখি,
তাহে আবার পলক পড়ে ;
বিশ্ব-পালক হলো বালক রাখাল ॥

৬১
জৌনপুরী মিশ্র—আদ্ধা কাওয়ালি

তোমারে কি দিয়া পূজি ভগবান।
আমার বলে কিছু নাহি হরি
সকলি তোমারি যে দান ॥

মন্দিরে তুমি, মুরতিতে তুমি,
পূজায় ফুলে তুমি, স্তব-গীতে তুমি,
ভগবান দিয়ে ভগবান পূজা
করিতে—তুমি যদি ভাব অপমান॥

কেমন তব রূপ দেখিনি হরি,
আপন মন দিয়ে তোমারে গড়ি,
হাসো না কাঁদো তুমি সে রূপ হেরি
বুঝিতে পারি না—তাই কাঁদে প্রাণ॥

কোটি রবি শশী আরতি করে যায়
মৃৎ-প্রদীপ জ্বালি আমি দেউলে তার,
বন-ডালায় পূজা-কুসুম-সম্ভার
যোগী মুনি করে যুগ যুগ ধ্যান।
কোথায় শ্রীমুখ তব কোথায় শ্রীচরণ,
চন্দন দিব কোন্‌খান॥

৬২

সিন্ধু মিশ্র—কার্ফা

আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়ন-তারা
হৃদয়ে মোর রাধা প্যারি।
আমার প্রেম প্রীতি ভালোবাসা
শ্যাম-সোহাগী গোপ-নারী॥

আমার স্নেহে জাগে সদা
পিতা নন্দ মা যশোদা,
ভক্তি আমার শ্রীদাম সুদাম,
আঁখি-জল-যমুনা-বারি॥

আমার সুখের কদম-শাখায়
কিশোর হরি বংশী বাজায়,
আমার দুখের তমাল-ছায়ায়
লুকিয়ে খেলে বন-বিহারী॥

মুক্ত আমার প্রাণের গোঠে
চরায় ধেনু রাখাল কিশোর,
আমার প্রিয়জনে নেয় সে হরি—
সেই তো ননী খায় ননী-চোর।
কৃষ্ণ-রাধা-কথা শুনায়
দেহ ও মন শুক সারি॥

৬৩

বেহাগ-মিশ্র—কার্ফা

মন লহ নিতি নাম রাধা শ্যাম
গাহ হরি গুণ গান।
তব ধন জন প্রাণ যাহার কৃপার দান
জপো তার নাম জয় ভগবান জয় ভগবান॥

জনক-জননীর স্নেহে তাঁহার
রূপ হেরিস তুই স্নেহময়,
ভাই-ভগিনীর প্রীতিতে যাঁর
শান্ত মধুর পরিচয়।
প্রণয়ী বন্ধুর মাঝে
যাঁর প্রেম রূপ বিরাজে,
পুত্র কন্যা-রূপে সেই জুড়ায় এ তাপিত পরান।
জপো তার নাম জয় ভগবান, জয় ভগবান॥

তৃষ্ণা ক্ষুধায় সেই কৃষ্ণেরি লীলা,
হাসে শ্যাম শস্যে কুসুমে রঙিলা,
তরঙ্গে ছলছল আঁখি জল-নীলা,
কল-ভাষা নদী-কলতান।

দেয় দুখ-শোক সেই, পুন সেই করে ত্রাণ।
জপো তার নাম জয় ভগবান জয় ভগবান॥

৬৪

ভৈরবী—দাদ্‌রা

তোমার সৃষ্টি-মাঝে হরি
হেরিতে যে নিতি পাই তোমায়।
তোমার রূপের আবছায়া ভাসে
গগনে সাগরে তরুলতায়॥

চন্দ্রে তোমার মধুর হাস,
সূর্যে তোমার জ্যোতিপ্রকাশ,
করুণা-সিন্ধু, তব আভাস
বারি-বিন্দুতে হিম-কণায়॥

ফোটা ফুলে হরি, তোমার তনুর
গোপী-চন্দন গন্ধ পাই,
হাওয়ায় তোমার স্নেহের পরশ,
অন্নে তোমার প্রসাদ খাই।

রাস-বিহারী, তোমার রূপ দোলে
দুঃখ-শোকের হিন্দোলে,
তুমি ঠাঁই দাও যবে ধরো কোলে,
মোর বন্ধু স্বজন কেঁদে ভাসায়॥

৬৫

ভৈরবী—কাওয়ালি

দাও দাও দরশন পদ্ম-পলাশ লোচন
কেঁদে দু নয়ন হলো অন্ধ।
আকাশ বাতাস-ঘেরা তব ও মন্দির-বেড়া
আর কতকাল রবে বন্ধ॥

পাখি যেমন সন্ধ্যাকালে বন্ধু স্বজন পালে পালে
উড়ে এসে বসেছিল ডালে হে,
রাত পোহালে একে একে উড়ে গেল দিগ্বিদিকে,
পড়ে আছি একা নিরানন্দ।

টুটিল বাঁধন মায়ার, কবে শুনিব এবার
ও রাঙা চরণ-নূপুর-ছন্দ ॥

দুঃখ-শোক-রৌদ্রজলে ফেলে মোরে পলে পলে
ছলিতেছ হরি কতই ছল হে,
জীবনের বোঝা প্রভু বহিতে কি হবে তবু,
সহিতে পারি না আর দ্বন্দ্ব।
মরণের সোনার ছোঁওয়ায় ডেকে লও ও-রাঙা পায়
দেখাও এবার মুখ-চন্দ ॥

৬৬

ঝাড় মিশ্র—কাওয়ালি

নাচিছে নট-নাথ, শঙ্কর মহাকাল।
লুটাইয়া পড়ে দিবা-রাত্রির বাঘছাল,
আলো-ছায়ার বাঘছাল ॥

ফেনাইয়া ওঠে নীল কণ্ঠের হলাহল,
ছিঁড়ে পড়ে দামিনী অগ্নি-নাগিনী দল,
দোলে ঈশান মেঘে ধূর্জটি জটাজাল ॥

বিষম ছন্দে বোলে ডমরু নৃত্য-বেগে,
ললাট-বহ্নি দোলে প্রলয়ানন্দে জেগে,
চরণ-আঘাত লেগে জাগে শ্মশানে কঙ্কাল ॥

সে নৃত্য-ভঙ্গে গঙ্গা তরঙ্গে
সংগীত দুলে ওঠে অপরূপ রঙ্গে,
নৃত্য-উছল জলে বাজে জলদ তাল ॥

নৃত্যের ঘোরে ধ্যান-নিমীলিত ত্রিনয়ন
প্রলয়ের মাঝে হেরে নব সৃজন-স্বপন,
জ্যোৎস্না-আশিস ঝরে উছলিয়া শশী-থাল ॥

৬৭

সুরট মিশ্র—দাদরা

বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে
এসো কিশোর বংশীধারী।
চূড়ায় বেঁধে ময়ূরপাখা
বামে লয়ে রাধা প্যারি॥

আমার আঁধার প্রাণের মাঝে
এসো অভিসারের সাজে,
নয়ন-জলের যমুনাতে
উজান বেয়ে ছুটুক বারি॥

এমনি চোখে তোমায় আমি
দেখতে যদি না পাই হরি,
দেখাও পদ্ম-পলাশ আঁখি
তোমার প্রেমে অন্ধ করি।

ঘুচাও এবার মায়ার বেড়ি,
পরাও তিলক কলঙ্কেরি,
'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' ভাবো
শ্যাম হে আর সইতে নারি॥

৬৮

বাউল

বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু।
আমি সুর শুনে তার বাউল হয়ে এনু গো॥

ঐ সুরে পড়ে মনে
কোন সুদূর বৃন্দাবনে
যেত নন্দ-দুলাল ব্রজের গোপাল বাজিয়ে বাঁশি বনে।
শুনে ছুটত পথে ব্রজের বালা, ভুলত তৃণ ধেনু গো॥

কবে নদীয়াতে গোরা
ও ভাই ডেকে যেত এমনি সুরে এমনি পাগল-করা,
কেঁদে ডাকত বৃথাই শচিমাতা, সাধত বসুন্ধরা,
প্রেমে গলে যত নরনারী যাচত পদ্ম-রেণু গো॥

৬৯

খাম্বাজ কাফি—হোরি কাহারবা

আজি নন্দ-দুলালের সাথে
খেলে ব্রজনারী হোরি।
কুঙ্কুম আবির হাতে
দেখো খেলে শ্যামল খেলে গোরী॥

থালে রাঙা ফাগ,
নয়নে রাঙা রাগ,
ঝরিছে রাঙা সোহাগ
রাঙা পিচকারি ভরি॥

পলাশে শিমুলে ডালিম ফুলে
রঙনে অশোকে মরি মরি
ফাগ আবির ঝরে তরুলতা চরাচরে,
খেলে কিশোর কিশোরী॥

চাঁদ রুপালি থালে জোছনা-আবির ঢালে
রঙে রাঙা চকোর চকোরী।
দোলন-চাঁপার শাখে দোয়েল শ্যামা ডাকে
আজি দোল-পূর্ণিমা স্মরি॥

৭০

মালকৌষ—সেতারখানি

শোনো লো বাঁশিতে
ডাকে আমারে শ্যাম।

গুমরিয়া কাঁদে বাঁশি
লয়ে রাধা নাম॥

পিঞ্জরে পাখি যেন
লুটাইয়া কাঁদে মন,
আশে পাশে গুরুজন বাম॥

৭১
ভৈরবী—দাদরা

হেলে-দুলে বাঁকা কানাইয়া গোকুলে চলে॥

গোপ-নারী ভুলি স্বজন
যৌবন মন পায়ে তার লুটায়,
বংশী বাজায়ে সে
গোকুলে চলে॥

দলে দলে গোপ-রাখাল
ব্রজ-দুলাল নাচে তমাল-ছায়,
পুষ্প-মালঞ্চে বনান্তে আনন্দে
গোপাল চলে॥

৭২
কীর্তন

মণি-মঞ্জীর বাজে অরুণিত চরণে সখি
রুনুঝুনু রুনুঝুনু মণি-মঞ্জীর বাজে।
হেরো গুঞ্জা-মালা গলে বনমালী চলিছে কুঞ্জ মাঝে॥

চলে নওল কিশোর,
হেলে-দুলে চলে নওল কিশোর।
হেরি সে লাবণি কৌস্তুভমণি নিষ্প্রভ হলো লাজে
চরণ-নখরে শ্যামের আমার চাঁদের মালা বিরাজে॥

বঁধুর চলার পথে পরান পাতিয়া রবো
চলিতে দলিয়া যাবে শ্যাম,
আমি হইয়া পথের ধূলি বক্ষে লইব তুলি
চরণ-চিহ্ন অভিরাম॥

ভুলে যা তোরা রাধারে কৃষ্ণ-নিশির আঁধারে
হারায়ে সে গেছে চিরতরে,
কালো যমুনার জলে ডুবেছে সে অতল তলে
মিশে গেছে সে শ্যাম সাগরে॥

ঐ বাঁশি বাজিছে শোন্ রাধা বলে
মোর তরুণ তমাল চলে, অঙ্গ-ভঙ্গে শিখি-পাখা টলে।
তার হাসিতে বিজলি
কাজল-মেঘে যেন উঠিছে উছলি।
রূপ দেখে যা দেখে যা,
কোটি চাঁদের জোছনা-চন্দন মেখে যা,
মোর শ্যামলে দেখে যা॥

৭৩

কীর্তন

ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে
থাকিতে দে লো এ পথে পড়ে
যে পথ ধরে গিয়াছে হরি চলি।
আমি যাব না আর গোকুলে,
লোক-নিন্দা মানব না সই
যাব না আর গোকুলে,
সখি শিশিরে আর ভয় কি করি ভেসেছি যবে অকূলে॥

সখি দিসনে লো দিসনে লো রাখ্ গোপী-চন্দন,
চন্দনে জুড়ায় না প্রাণের ক্রন্দন।
দ্বিগুণ বাড়ায় জ্বালা নব মালতী-মালা,
ও যে মালা নয়, মনে হয় সাপিনীর বন্ধন॥

সখি যাহার লাগিয়া বসন-ভূষণ, সেই গেল যদি চলে
কি হবে এ ছার ভূষণের ভার ফেলে দে যমুনা-জলে।
সকলের মায়া কাটায়েছি সখি, টুটিয়াছে সব বন্ধন,
যেতে দে আমায় যথা মথুরায় বিহরে নন্দ-নন্দন॥

দেখব তারে, আমি রাজার সাজে দেখব তারে,
রাজার সাজে কেমন মানায় গো-রাখা রাখাল-রাজে।

আমার হৃদয়ের রাজা রাজ্য পেয়েছে
দেখিতে যাইব আমি,
যদি চিনিতে না পারে আসিব লো ফিরে
দুয়ারে ক্ষণেক থামি,
মোর রাজ-দর্শন-পুণ্য হবে,
আমি তীর্থের ফল লভিয়া ফিরিব
দেখিয়া জীবন-স্বামী॥

৭৪

হোরি—কার্ফা

আনন্দ-দুলালী ব্রজ-বালার সনে
নন্দ-দুলাল খেলে হোলি।
রঙের মাতন লেগে যেন শ্যামল মেঘে
খেলিছে রাঙা বিজলি॥

রাঙা মুঠি-ভরা রাঙা আবির-রেণু
রাঙিল পীত-ধড়া শিখী-পাখা বেণু
রাঙিল শাড়ি কাঁচলি॥

লচকিয়া আসে মুচকিয়া হাসে
মারে আবির, পিচকারি,
চাঁদের হাট তোরা দেখে যা রে দেখে যা
রঙে মাতোয়ালা নর-নারী।
শিরায় শিরায় সুরার শিহরণ
রঙ্গে অঙ্গে পড়ে ঢলি॥

৭৫

মালগুঞ্জ—ত্রিতালী

গুঞ্জা-মালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা।
বনমালি এসো দুলাইয়া বন-মালা॥

তব পথে বকুল ঝরিছে উতল বায়ে
দলিয়া যাবে বলি অরুণ-রাঙা পায়ে,
রচেছি আসন তরুণ তমাল-ছায়,
পলাশে শিমুলে রাঙা প্রদীপ জ্বালা॥

ময়ূরে নাচাও এসে তোমার নূপুর-তালে,
বেঁধেছি ঝুলনিয়া ফুলেল কদম-ডালে,
তোমা বিনে শ্যাম বিফল এ ফুল-দোল,
বাঁশি বাজিবে কবে উতলা ব্রজবালা॥

৭৬

কীর্তন

মোর মাধব-শূন্য মাধবী-কুঞ্জে (সখি গো)
আমি যাব না যাব না, দেখিতে পাব না
সে শ্যাম নীরদ-পুঞ্জে।
মোরে থাকিতে দে গো এমনি পড়ে,
মোরে মাখিতে দে সেই পথের ধূলি
চলে গেছে হরি যে পথ ধরে।
সখি খুলে নীল শাড়ি দে লো তাড়াতাড়ি
গেরুয়া বসন পরায়ে,
ব্রজে নীলমণি নাই, কি হবে বৃথাই
গায়ে নীল শাড়ি জড়ায়ে।
তোরা খুলে নে লো মোর আভরণ,
কপাল যাহার পুড়েছে লো সই
ভস্ম সে তার ললাট-ভূষণ॥

জনম যাহার যাইবে কাঁদিয়া
কাঁদিতে দে তারে একাকী,
বৃথা প্রবোধ তারে দিসনে তোরা,
জানি নয়নের জল হয়তো শুকাবে
শুকাবে ব্যথার রেখা কি?
ভুলে যা লো তোরা ভুলে যা আমায়,
যদি কৃষ্ণেরে তোরা ভুলিতে পারিস
ভুলিতে পারিবি রাধায়॥

৭৭

কীর্তন

ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার আসবে ফিরে কবে?
জাগবে কি আর ব্রজবাসী ব্যাকুল বেণুর রবে?
বাজবে নূপুর তমাল-ছায়ায়
বইবে উজান হ্রদ-যমুনায়,
অভাগিনী রাধার কি আর তেমনি সুদিন হবে?
গোঠে নাহি যায় রাখালেরা আর
লুটায়ে কাঁদে পথের ধুলায়,
ধেনু ছুটে যায় মথুরা পানে
না হেরি গোঠে রাখাল-রাজায়।
উড়িয়া গিয়াছে শুক-সারি পাখি
শুনি না কৃষ্ণ-কথা (আর),
শ্যাম-সহকারে তরুরে নাহি হেরি
শুকাল মাধবী-লতা।
শ্যাম বিনে নাই সে শ্যাম-কান্তি,
শুকায়েছে সব।
কদম তমাল তরু-পল্লব হাসি উৎসব শুকায়েছে সব।
সখি গো—
চির-বসন্ত ছিল যথা আজ সেথা শূন্যতা
হাহাকার রবে কাঁদে শ্যাম (হে)
ললিতা বিশাখা নাই নাই চন্দ্রাবলী
নাই ব্রজে শ্রীদাম সুদাম (সখা হে)॥

৭৮

কীর্তন

সখি যায়নি তো শ্যাম মথুরায়
আর আমি কাঁদব না সই।
সে-যে রয়েছে তেমনি ঘিরে আমায়॥

মোর অন্তরতম আছে অন্তরে
অন্তরালে সে যাবে কোথায়?
আছে ধেয়ানে স্বপনে জাগরণে মোর
নয়নের জলে আঁখি-তারায়॥

কে বলে সখি অন্ধকার এ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ নাই,
তমাল কদম শ্যাম পল্লবে হৃদি-বল্লভে দেখিতে পাই।
গোকুলে যে আজ কৃষ্ণপক্ষ
কে বলে সখি কৃষ্ণ নাই।
অন্য পক্ষে কি কাজ সখি
গোকুলে যে আজ কৃষ্ণপক্ষ,
দেখো কৃষ্ণেরই নাম লয় সবাই
সখি গো—
আমি অন্তরে পেয়েছি লো, বাহিরে হারিয়ে তায়,
যাক না সে মথুরায় যেথা তার প্রাণ চায়॥

শ্যামে হেরিয়াছি যমুনার কালো জলে সাগরে,
আষাঢ়ের ঘন মেঘে হেরিয়াছি নাগরে।
হেরিয়াছি তারে শ্যাম শস্যে হেমন্তে
পীত-ধড়া হেরি তার কুসমি বসন্তে।
এঁকেছিলাম শ্যামের ছবি সেদিন সখি খেলার ছলে,
আঁকিনি লো চরণ তাহার পালায়ে সে যাবে বলে।
আনিয়া দে আজ সে চিত্রপট
আঁকিব লো আজি চরণ তার,
সে যায়নি মথুরা কাঁদিস নে তোরা
আছে আছে শ্যাম হৃদে আমার॥

৭৯

ভজন

নমো নটনাথ! এ নাট-দেউলে
করো হে করো তব শুভ চরণ-পাত।
তোমার সংগীতে নৃত্য-ভঙ্গিতে
হউক হেথা নব জীবনসঞ্জাত॥

তব প্রসাদে দেব-দেব হে আদি কবি,
বাক-মুখর হলো মূক এ ছায়া-ছবি,
আজি এ ছবি-পটে
তব মহিমা রটে,
আলো-ছায়ায় দুলে স্বপন-রাঙা রাত॥

তব আশিসে, হে মহেন্দ্র, দিক আনি
অভিনব আশা প্রাণ এ রূপ-বাণী।
হৃদয়ে সকলের
দাও হে ঠাঁই এর,
আনুক এ রূপ-লোকে নবীন প্রভাত॥

৮০

বাউল—লোফা

ভবের এই পাশা খেলায়
খেলতে এলি, হায় আনাড়ি!
হাতে তোর দান পড়ে না
হাত খোল না তাড়াতাড়ি॥

তুই আর তোর সাথী ভাই
কাঁচা খেলোয়াড় দুজনাই,
মায়া রিপুর সাথে তাই
নিত্য হেরে ফিরিস বাড়ি॥

তোরি সে চালের দোষে
যায় কেঁচে তোর পাকা ঘুঁটি,
ফিরিতে হয় অমনি
যেমনি যাস ঘরে উঠি!
ও হাতে হর্দম চক ছয়-তিন-নয় পড়তে আড়ি॥

সংসার-ছক পেতে হায়,
বসে রোস মোহের নেশায়,
হেরে যে সব খোয়ালি
যাসনে তবু খেলা ছাড়ি॥

প্রাণ মন দুই ঘুঁটিতে যুগ বেঁধে তুই যা এগিয়ে,
দেহ তোর একলা ঘুঁটি রাখ, আড়িতে মার বাঁচিয়ে।
আড়িতে মার খেলে তুই স্বর্গে যাবি জিতবি হারি॥

৮১

হোরী

কাফি—সাদ্রা

ভুবনে ভুবনে আজি ছড়িয়ে গেছে রঙ।
রাঙিল, মাতিল ধরা অভিনব ঢং॥

রাঙা বসন্ত হাসে নন্দন-আনন্দে,
চিত্ত-শিখী নাচে মদালস-ছন্দে,
নাচিছে পরানে আজি তরুণ দুরন্ত
বাজায়ে মৃদং॥

কামোদে নটে আমোদে ওঠে গান
মাতিয়া ওঠে প্রাণ।

উতল যমুনা-জল-তরঙ্গ,
অঙ্গে অপাঙ্গে আজি খেলিছে অনঙ্গ,
পরানে বাজে সারং সুর
কাফির সঙ॥

৮২

ভৈরবী—একতালা

অসুর-বাড়ির ফেরৎ এ মা,
শ্বশুর-বাড়ির ফেরৎ নয়।
দশভুজার করিস পূজা
ভুলরূপে সব জগৎময়॥

নয় গৌরী নয় এ উমা
মেনকা যার খেতো চুমা,
রুদ্রাণী এ, এ যে ভূমা,
একসাথে এ ভয় অভয়॥

অসুর দানব করল শাসন
এইরূপে মা বারে বারে,
রাবণ-বধের বর দিল মা
এইরূপে রাম-অবতারে।

দেব-সেনানী পুত্রে লয়ে
যায় এই মা দিগ্বিজয়ে,
সেইরূপে মায়ের কররে পূজা
ভারতে ফের আসবে জয়॥

৮৩

কীর্তন

আজি প্রথম মাধবী ফুটিল কুঞ্জে
মাধব এল না সই।
এই যৌবন-বনমালা কারে দিব
মোর বনমালি বই॥

সারা নিশি জেগে বৃথাই নিরালা
গাঁথিলাম নব মালতীর মালা,

অনাদরে হায় সে মালা শুকায়
দেখিয়া কেমনে রই॥

মম অনুরাগ-চন্দন ঘসে
লাজ ভুলে সাঁঝ হতে আছি বসে,
শুকাইয়া যায় চন্দন হায়
রাধিকা-রমণ কই॥

চলিলাম আমি যথা প্রাণ চায়,
প্রভাতে আসিলে মোর শ্যামরায়
বলিস আঁধারে হারাইয়া হায়
গেছে রাধা রসময়ী॥

৮৪
যোগিয়া—একতালা

জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
চিন্ময়ীরূপে জাগো।
তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী
কাঁদে আর ডাকে মা গো॥

বরষ বরষ বৃথা কেঁদে যাই,
বৃথাই মা তোর আগমনী গাই,
সেই কবে মা আসিলি ত্রেতায়
আর আসিলি না গো॥

কোটি নয়নের নীল পদ্ম মা
ছিঁড়িয়া দিলাম চরণে তোর,
জাগিলি না তুই, এলিনে ধরায়,
মা কবে হয় হেন কঠোর।
দশ ভুজে দশ প্রহরণ ধরি
আয় মা দশ দিক আলো করি,
দশ হাতে আন্ কল্যাণ ভরি,
নিশীথ-শেষে উষা গো॥

৮৫

রসিয়া—হোরি

হোরির রঙ লাগে আজি গোপিনীর তনু-মনে
অনুরাগে-রাঙা গোরীর বিধু-বদনে॥

ফাগের লালী আনিল কে
কাজল-কালো চোখে,
কামনা-আবির ঝরে রাঙা নয়নে॥

অশোক রঙন ফুলের আভা
জাগে ডালিম-ফুলি গালে,
নাচিছে হৃদয় আজি
রসিয়ার নাচের তালে।

তাম্বুল-রাঙা ঠোঁটে
ফাগুনের ভাষা ফোটে,
প্রাণের খুশির রঙ লেগেছে
রাঙা বসনে॥

৮৬

ভজন

বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু
আর হইব না পথহারা
বন্ধু স্বজন সব ছেয়ে যায়
তুমি একা জাগো ধ্রুবতারা॥

মায়ারূপী হায় কত স্নেহ-নদী,
জড়াইয়া মোরে ছিল নিরবধি,
সব ছেড়ে গেল হারাইল যদি
তুমি এসো প্রাণে প্রেমধারা॥

ভ্রান্ত পথের শ্রান্ত পথিক
লুটায় তোমার মন্দিরে,
আরো যাহা কিছু আছে মোর প্রিয়
লয়ে বাঁচাও এ বন্দীরে।

জগতের এই প্রেম বিষ-মিশা,
মিটে না তাহাতে অগস্ত্য-তৃষা ;
হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা
চাহি না বন্ধু সুত দারা ॥

কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা
কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর,
ছুঁতে ভেঙে যায় তবু শিশুপ্রায়
ভুলাও মোদেরে নিরন্তর।
ডাকি লও মোরে মুক্ত আলোকে
তব আনন্দ-নন্দন-লোকে,
শান্ত হোক এ ক্রন্দন, আর
সহে না এ বন্ধন-কারা ॥

৮৭

টোড়ি—কাওয়ালি

জাগো জাগো ! জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে,
ডাকে উষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায় রবি রাঙা মহিমায়,
গাহে প্রভাত-পাখি হেরো নিশি পোহালো ॥

জাগো উর্ধ্বে ধরার শিশু স্বপ্ন-আতুর,
নব বিস্ময়-লোকে জাগো সৃজন-বিধুর !
রাঙা গোধূলি-বেলা রচো ধূলির ধোঁয়ায়,
আনো কল্প-মায়া, নাশো গহন কালো ॥

৮৮

দ্বৈত গান

পুরুষ ॥ পরান হরিয়া ছিলে পাশরিয়া
কেমনে লো প্রিয়া আনন্দে!
স্ত্রী ॥ ছিনু কী যেন স্বপনে মগ্না
পু ॥ আজি হবে কি এ কণ্ঠ-লগ্না?
স্ত্রী ॥ না, না।
পু ॥ হায় ফুল ফুটবে না কি এ বসন্তে!
মালঞ্চে পাপিয়া উঠিছে ডাকিয়া,
বিরহী এ হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
হৃদয় চাপিয়া রেখো না আর,
খোলো গো মনের দ্বার!
স্ত্রী ॥ মুখে আসে না বুকের ভাষা,
কেমনে জানাই ভালোবাসা?
পু ॥ প্রেমের দরিয়া ওঠে উছলিয়া,
স্ত্রী ॥ কে করে সে প্রেমের আশা।
পু ॥ চাও
স্ত্রী ॥ যাও॥

৮৯

দ্বৈত গান

পুরুষ ॥ নবীন বসন্তের রানি তুমি
গোলাব-ফুলি ঢং।
স্ত্রী ॥ তব অনুরাগের রঙে
আমি উঠিয়াছি রেঙে
প্রিয় এই অপরূপ ঢং॥

পু ॥ পলাশ কৃষ্ণচূড়ার কলি
রাঙা ও পায়ে এলে কি দলি?
স্ত্রী ॥ বেয়ে প্রেমের পথের গলি
এলাম কঠোর হৃদয় দলি
মম পায়ে তাহারি রঙ॥

পু ॥ হায় হৃদয়-হীনা হৃদয়-সাথী হয় না সে জানি,
অবুঝ হৃদয় তবু চাহে তায়, জানে সে পাষাণী।
স্ত্রী ॥ ধরিয়া পায়ে প্রেম জানায়ে
যাও পলায়ে শেষে কাঁদায়ে।

পু ॥ বায়ু কেঁদে যায় ফুল ঝরায়ে।
স্ত্রী ॥ না না যাও মন চেয়ো না
গন্ধ লহ ফুল চেয়ো না,
আছে, কাঁটা ফুলের সঙ্গ॥

৯০

দ্বৈত গান

পুরুষ ॥ আজি মিলন-বাসর প্রিয়া
হেরো মধুমাধবী নিশা।
স্ত্রী ॥ কত জন্ম-অভিসার শেষে
আজি পেয়েছি তব দিশা॥

পু ॥ সহকার-তরু হেরো দোলে
মালতীলতারে লয়ে বুকে,
স্ত্রী ॥ মাধবী-কঙ্কণ পরি
দেওদার তরু দোলে সুখে।
উভয়ে ॥ প্রাণ কানায় কানায় আজি পুরে
হিয়া আবেশ-পুলক-মিশা॥

পু ॥ শারাব-রঙের শাড়ি পরেছে চাঁদিনী রাতি,
স্ত্রী ॥ তারার রূপে গলে পড়ে গগনে চাঁদের বাতি,
পু ॥ হলো জোছনা-শিরাজি রঙিন
স্ত্রী ॥ নীল আকাশের শিশা॥

পু ॥ হেরো জোয়ার-উতলা সিন্ধু পূর্ণিমা চাঁদেরে পেয়ে,
স্ত্রী ॥ কোন দূর অতীত স্মৃতি মম প্রাণে মনে ওঠে ছেয়ে।
উভয়ে ॥ মিলন-ঘন-মেঘলোকে আজি মিটিবে মরু-তৃষা॥

৯১

পিলু-সাহানা—কার্ফা

ওরে হুলোরে তুই রাত বিরেতে ঢুকিসনে হেঁসেল।
কবে বেঘোরে প্রাণ হারাবি বুঝিসনে রাস্কেল॥

স্বীকার করি শিকারী তুই গোঁফ দেখেই চিনি,
গাছে কাঁঠাল ঝুলতে দেখে দিস গোঁফে তুই তেল॥

ওরে ছোঁচা ওরে উঁছা বাড়ি বাড়ি তুই হাঁড়ি খাস,
নাদনার বাড়ি খেয়ে কোনদিন ধনে প্রাণে বা মারা যাস,
কেঁদে মিয়াঁও মিয়াঁও বলে বিবি বেরালী করবে রে হার্টফেল॥

তানপুরারই সুরে যখন তখন গলা সাধিস,
শুনে ভুলো তোরে তেড়ে আসে, তুই ন্যাজ তুলে ছুটিস,
তোরে বস্তায় পুরে কবে কে চালান দিবে ধাপা-মেল॥

বৌঝি যখন মাছ কোটে রে, তুমি খোঁজ দাও,
বিড়াল-তপস্বী, আড়নয়নে থালার পানে চাও,
তুই উত্তম মধ্যম খাস এত তবু হলো না আক্কেল॥

৯২

সুর—ভোজপুরি হোরি—তাল খচমচি

নিয়ে কাদা মাটির তাল
খোলে হোরি ভূতের পাল।
নর্দমা হতে ছিটায় কর্দম হর্দম কাহার চাঁড়াল॥

দুই পাশের পথিকের গায়
কাদা ছিটিয়ে মোটর যায়,
নল দিয়ে ঐ জল ছিটায়
ফুটপাথে উড়িয়া দুলাল॥

খচমচ খচমচ বাজায় তাল
ভোজপুরী মাড়োয়ারি ভাই,
ঝি ফেলে দেয় ছাদ থেকে
গোবর-গোলা আবার ছাই,

দেয় ঢেলে পিচদানির পিচ
কাপড় চোপড় লালে লাল॥

ভুঁড়িতে ফুঁড়িছে ডাক্তার পিচকারি ঐ—
হোলি হেয়!
টক্কর খেয়ে উলটে পড়ে ময়লা গাড়ি—
হোলি হেয়!
ষাঁড়ের গুঁতোয় খানায় পড়ে
খেলে হোরি পাঁড় মাতাল॥

৯৩

হোরি—দাদরা

আজকে হোরি ও নাগরী
ওগো গিন্নি ও ললিতে।
শিগগির রাঙা জল ভরে দাও,
ফরসি হুঁকোর পিচকিরিতে॥

গাজর বিট আর লাল বেগুনে
রাঁধবে শালগম সৈন্ধব নুনে,
রাঙা দেখে লঙ্কা দিও
লাল নটে আর ফুল-কারিতে॥

গাইব গান আজ পূর্ণিমাতে
মালোয়ারি জ্বর আসলে রাতে,
তুমি দোহার ধরবে সাথে
গিঁঠে বাতের গিটকিরিতে॥

আমি লাল গামছা পরে যাব
লাল-বাজারে পায়চারিতে,
তুমি যাবে চিড়িয়াখানায়
মুখেতে গণ্ডার মারিতে,
না হয় তুমি যাও বাপের বাড়ি
আমি যাই শ্বশুর-বাড়িতে॥

৯৪

পল্লি-নৃত্যের গান

আজ লাচনের লেগেছে যে গাঁদি গো
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি।
আমার কোমর কাঁকাল ভেঙে গেছে
লেচে লেচে ও দাদি।
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি॥

মাদলের বোল : হুরর হুররে দাদা, দাদারে দাদা!
তিন দাদা পুত্ নাত্তিন্ নাচে
দাদারে দাদা!
নাত্তিন নাচে পুত্তিন নাচে
সত্তিন নাচে শ্যাওড়া গাছে দাদারে দাদা!
তিন দাদা পুত্ নাত্তিন্ নাচে॥

বড়কি নাচে ছুটকি নাচে
মুটকি নাচে ধ্যাতিং তিং,
সুঁটকি নাচে খুপি নাচে
নাচে সাথে আহ্লাদি।
আজ নাচনের লেগেছে গাঁদি॥

মাদলের বোল : ও গিজ্জে, মুড়কি ভিজে!
ও গিজ্জে রেল ঠুকে দে!
শিরিশের বাগান ঘুরে
হাত বাড়ালে পয়সা পড়ে।
ওরে আমার ফকির চাঁদ
গাই দুয়োরো বাছুর বাঁধ॥

বুড়ি নাচে ভুঁড়ি নাচে নাচে ছোঁড়া ছুঁড়ি গো,
গোদা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচিছে বাঁদা বাঁদি।
আজ লাচনের লেগেছে গাঁদি॥

মাদলের বোল : ও গিজ্জে থাসনে ভিজে,
ও গিজ্জে চাঁদদিদি যে

সাবাস বেটি বকন-ছা
কলামোচায় ফড়িং খা।
ও গিজে তাল ভটাভট !
ও গিজাং ঘিচতা ঘিচাং ঘিচতা ঘিচাং !
ও গিজে যাচ্চলে যা বরিশাল্যা
পাবনা ঢাকা খুলন্যে জেলা !
তেহাই : পিয়াজ পিয়াজ রসুন থাক
যার পাঁঠা তার বাপের গোয়াল যাক
থাক কাঁকুড় থাক
তোর ছেলে তোর দাদার ছেলে !
হুল্লোড় ধ্বনি : দে গরুর গা ধুইয়ে !

৯৫

চা-স্তোত্র

চায়ের পিয়াসী পিপাসিত চিত আমরা চাতক দল।
দেবতারা কন সোমরস যারে সে এই গরম জল॥

চায়ের প্রসাদে চার্বাক ঋষি বাক-রণে হলে পাস,
চা নাহি পেয়ে চার-পেয়ে জীবন চর্বণ করে ঘাস।
লাখ কাপ চা খাইয়া চালাক
হয়, সে প্রমাণ চাও কত লাখ ?
মাতালের দাদা আমরা চাতাল, বাচাল বলিস বল॥

চায়ের নামে যে সাড়া নাহি দেয় চাষাড়ে তাহারে কও,
চায়ে যে 'কু' বলে চাকু দিয়ে তার নাসিকা কাটিয়া লও।
যত পায় তত চায় বলে তাই
চা নাম হলো এ সুধার ভাই।
চায়ের আদর করিতে, হইল দেশে চাদরের চল॥

চা চেয়ে চেয়ে কাকা নাম ভুলে পশ্চিমে চাচা কয়,
এমন চায়ে যে মারিতে চাহে সে চামার সুনিশ্চয়।
চা করে করে ভৃত্য নফর
নাম হারাইয়া হইল চাকর,
চা নাহি খেয়ে বেচারা নাচার হয়েছে চাষা সকল॥

চায়ে এল যার চাল-কুমড়ো সে, চাঁদা করে যার চাঁটি,
চা না খাইয়া চাদা খায় আজ দেখহ অশ্ব-জাতি।
একদা মায়ের মুণ্ডেতে শিব
চা ঢেলে দেন ; বের করে জিভ
চা-মুণ্ডা রূপ ধরিলেন দেবী সেইদিন রে পাগল॥

চায়ে পা ঠেকিয়ে সেদিন গদাই পড়িল মোটর চাপা,
চাঁট ও চাটনি চায়েরই নাতনি, লুকাতে পারো কি বাপা?
চায়ে মরো বলে গালি দিয়ে মাসি
চামর ঢুলায় হয়ে আজ দাসী,
চাটিম্ চাটিম্ বুলি এই দাদা চায়ের নেশারই ফল॥

৯৬

শ্যালানুসন্ধিৎসু

গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে গিন্নি চটে কাঁই।
আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কাঁদিছেন সদাই॥

কোথায় শালা শালা কোথায়, কেবল ভদ্রলোক,
ডাকতে গিয়ে জিভ কেটে ভাই ফিরিয়ে নি চোখ!
ভ্যালা ফ্যাসাদ হলো দাদা, শালায় কোথায় পাই॥

খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেলুম সম্মুখে আট-শালা,
আটশালাতে মোর শালা নাই বসেছে পাঠ-শালা,
দো-শালাতে গরু বাঁধা, আমার শালা নাই॥

খুঁজতে গেলুম শহর, দেখি শালার ছড়াছড়ি,
পান-শালাতে পান করে যায় মাতাল গড়াগড়ি,
ধর্মশালা অতিথ-শালা শালার অন্ত নাই॥

হাতি-শালা ঘোড়া-শালা রাজার ডাইনে বাঁয়ে,
হঠাৎ দেখি যাচ্ছে বাবু দো-শালা গায়ে,
দো-শালা তো চাইনে বাবা, এক শালাকে চাই॥

দশ-শালা ব্যবস্থা ঝুলে গরিব চাষার ভাগ্যে,
দিয়াশলাই পেয়ে ভাবি, শালাই পেলাম, যাকগে।
চাইনু শালা, মুদি দিল গরম মশলাই॥

ঢেঁকি-শালায় ঢেঁকি শুয়ে প্যাক-শালাতে ছাই,
হায় শালায় কোথায় পাই॥

৯৭

পেগ্যান—সংগীত

গান গাহে মিসি বাবা শুনিয়া শুধায় হাবা
খুকি কাঁদে কেন বাবা, ফোঁড়া কি কাটিছে ওর?
হাসিয়া কহেন পিসি ও-দেশেতে শীত বেশি
তাই কাঁদে বাবা মিসি হিহি হিহি হিহি হো—
কিবে গিলে-করা গলা ঢেউ-তোলা আট-পলা,
খায় রোজ এক তোলা স্ক্রু-ভেজানো জল।
সাথে গায় হেঁড়ে-গলা ধনীর সহিত খলা,
কাঁপে বাড়ি তিন-তলা থরহরি টলমল॥

৯৮

বাঙালিবাবু

নখ-দন্ত-বিহীন চাকুরি-অধীন আমরা বাঙালি বাবু।
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু॥

ঢিলে-ঢালা আছে কোঁচা সামলায়ে
ভুঁড়ি বয়ে ছুটি নিউপিস্ট পায়ে
আপিসে কষিয়া কলম পিষিয়া
ঘরে এসে খাই সাবু॥

রবিবারে ছুটি আছে বলে ভাই
বাবা বলে চিনে ছেলেপিলে তাই

নাকে শাঁখ বেঁধে সেদিন ঘুমাই,
নয় ঘরে বসে খেলি গ্রাবু॥

হাঁচি টিকটিকি সিন্নি মানিয়া
পরান-পাখিরে রেখেছি ধরিয়া
দেখে ব্যাঙের ছাতারে উঠি চমকিয়া
ভয় হয় বুঝি তাঁবু॥

এগজামিনের লাঠি ধরে ধরে
দাঁড়াই আসিয়া আফিসের দোরে,
মাইনে যা পাই তাই দিয়ে খাই
কদলী আর অলাবু॥

গোলামের কুড়ি ফোটার এ বোঝা
নামায়ে কোমর হতে দাও সোজা
বাতে আর হাড়-হাবাতে ধরেছে—
বাপপুরে কনে যাবু॥

৯৯

রাম-খুঁটি

নমো নম রাম-খুঁটি।
তুমি গাদিয়া বসেছ আমাদের বুকে, সাধ্য নাই যে উঠি॥

তুমি নির্বিকার হে পরম পুরুষ
আপনাতে আছ আপনি বেহুঁশ,
তব বাঁধন ছিঁড়িতে বৃথা টানাটানি
বৃথা মাথা কুটোকুটি॥

আইন কানুন আচার বিচার
বিধি ও নিষেধ শ্রী পরিবার
শত রূপে তুমি জগৎ মাঝার
চাপিয়া আছ যে টুটি॥

কত রূপে তব লীলার প্রকাশ
কভু হও খুঁটো কভু হও বাঁশ,
কভু হাঁড়ি-কাঠ কভু ঘানি-গাছ
ঘোরাও ধরিয়া ঝুঁটি॥

কখনো পাঁচনি-রূপে পিঠে পড়ো,
কখনো জোয়াল-রূপে কাঁধে চড়ো,
কখনো কঞ্চি বাঁশ চেয়ে দড়
কভু গুঁতো কভু লাঠি।
ঠুঁটো ত্রিভঙ্গ হে প্রভু তোমার
ভয়ে মোরা গুটিসুটি॥

১০০
গোঁড়া ও পাতি

আবু আর হাবু দুই ভায়ে ভায়ে সদাই ভীষণ দ্বন্দ্ব।
বোঝালে বোঝে না, এক ভাই কানা আর এক ভাই অন্ধ॥

হাবু বলে, 'আবু, বিশ্রী দেখায় শিগ্‌গির চাঁছো দাড়ি!'
আবু বলে, 'দাদা, পেঁয়াজের ঝাড় ঐ টিকি কাটো তাড়াতাড়ি।'
টিকি ও দাড়িতে চুলোচুলি বাধে, ট্রাম বাস হয় বন্ধ॥

হাবু বলে, 'আবু, তোর কি তাহাতে, বাঁচুক মরুক তুর্কি?
বেঁচে থাক তুই আর বেঁচে থাক তোর দর্মার মুরগি!'
আবু বলে, 'দাদা, মুরগি বাঁচাতে ছুটি যে সমরকন্দ।'

হাবু বলে, 'আবু, কাছা দে শিগ্‌গির!' আবু বলে, 'ছাড়ো গামছা!'
হাবু আনে ছুটে খুন্তি, আবু উঁচাইয়া ধরে চামচা।
হাবু সে দেখায় যুযুৎসু প্যাঁচ, আবু মোহরমি ছন্দ॥

হাবু বলে, 'আবু, পাঁঠার আমার মেরেছিস তুই জাত,
খোদার খাসি যে করেছিস তারে, দেবো অভিসম্পাত।'
আবু বলে 'দাদা, মারিনি তো জাত, মেরেছি বোঁট্‌কা গন্ধ।'

আবু আসে তেড়ে লুঙ্গি তুলে, হাবু বাগাইয়া ধরে কোঁচা,
আবু বের করে ছোরাছুরি, হাবু দেখায় বাঁশের খোঁচা।
হাবু বলে 'দেবো ভুঁড়ি চাপা', আবু দেখায় অর্ধচন্দ্র॥

টিকি আর দাড়ি ছেড়ে আড়াআড়ি সহসা হইল দোস্ত,
আবু খায় কিনে গোস্ত কাবাব, হাবু খায় বড়ি পোস্ত,
আবু যায় চলে কাঁকিনাড়া, হাবু চলে যায় গোয়ালন্দ॥

১০১

জাতের জাঁতিকল

একে একে সব মেরেছিস, জাতটা শুধু ছিল বাকি।
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবি নাকি॥

ভাতের হাঁড়ি হুঁকোর জলে কোনোরূপে শাস্ত্র-বুড়ো
জাত বাঁচিয়ে লুকিয়ে আছে, তারেও বাবা দিস্‌নে হুড়ো।
এক কোণে সে পড়ে আছে ছোঁওয়া-ছুঁয়ির কাঁথা ঢাকি॥

জবু-থবু জাতকে নিয়ে এ তো দেখি বিষম ল্যাঠা,
পথ চল্‌তে গেলেই দেখি শুদ্র অজাত বেজাত ঠ্যাটা,
মেথর চাঁড়াল ডোম হাড়ি সব মাল নিয়ে যায় কাঁচি পাকি॥

গরুর গাড়ি চড়তে গিয়ে দেখি শূদ্র চালায় গাড়ি,
হুঁকোতে টান দিতে গিয়ে জল ফেলে দিই তাড়াতাড়ি।
রেলগাড়িতে বামুন শূদ্রে মাছে শাকে মাখামাখি॥

মেথ্‌রানিটা বললে, 'বাবু, জাত জান কি তোমার মায়ের?
পাঁচ ছেলের সে ময়লা ফেলে, আমি ফেলি লক্ষ ছেলের!
স্নান করে সে ঠাকুর পূজে, আমার বেলায় জাতের ফাঁকি॥'

ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাঁচি ভূ-ভারতে কেমন করে,
অব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ চাঁড়াল আষ্টেপিষ্টে আছে ভরে,
এমন করে কদিন চালাই জাতের ছেঁড়া কাপড় টাকি॥

পুতুলের বিয়ে

(ছোট মেয়েদের নাটক)

উৎসর্গ

সানি ও নিনি

—কল্যাণীয়েষু

—কুশীলবগণ—

মেয়ে—

কমলি, টুলি, পঞ্চি, খেঁদি, বেগম, ঠাকুর-মা।

পুরুষ—

কমলির দাদামণি ও পুরুত ঠাকুর।

(পঞ্চি ময়মনসিংহের ও খেঁদি বাঁকুড়া জেলার অধিবাসিনী।)

পুতুলের বিয়ে

(পুতুল খেলিতে খেলিতে মেয়েদের গান)

খেলি আয় পুতুল-খেলা
    বয়ে যায় খেলার বেলা সই।
বাবা ঐ যান আপিসে ভাবনা কিসের,
    খোকারা দোলায় ঘুমায় ঐ ॥

দাদা যায় ইস্কুলেতে, মা খুড়িমা
    রান্না করেন ঐ হেঁসেলে,
ঠানদি দাওয়ায় ঝিমোয় বসে
    ফোকলা বদন মেলে।
আয় লো ভুলি পঞ্চি টুলি
    পটলী খেঁদি কই।

কম্‌লি : তা হলে ভাই টুলি, তোকে আর টুলি বলব না। তুই আজ থেকে আমার বেয়ান হলি, কেমন? আজ যে আমার চীনে-পুতুলের সঙ্গে তোর মেম-পুতুলের বিয়ে।

টুলি : না ভাই কম্‌লি, তোর ঐ বাদা-কুচ্ছিৎ চীনে-পুতুলটার সঙ্গে আমার মেম-পুতুলের বিয়ে দেবো না। বাবা! তোর ঐ পুতুলটা যা চোখ উল্টোয়! আমার পুতুল ওকে দেখলে ভয়ে আঁৎকে উঠবে। তার চেয়ে—তোর ঐ পুতুলটি, যার নাম রেখেছিস ডালিম কুমার—ঐটিকে আমি জামাই করব।

কম্‌লি : মা গো, কি হবে! তা হলে আমার চীনে পুতুলের বিয়ে হবে কি করে? ওকে যে কেউ বিয়ে করতে চায় না। অত বড় ছেলে আমার আইবুড়ো হয়ে থাকবে? মা গো, লোকে বলবে কি!

টুলি : তা ভাই, তুই বরং পঞ্চির মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কর না।

পঞ্চি : কি কন! পঞ্চির বেটি অত হস্তা না। ওই চীনা অলম্বুসডারে জামাই করব নি। ওডা দেখবার যেমন ভূতের লাহান, নামও তেমনি রাখছে—ফুচুং! উয়ারে দেইহাই আমার মায়্যা একেরে চিক্কুর পাইর‍্যা ফাল দিয়া উঠব! টুলি আপন বেডিরে দেয় না ক্যান?

টুলি : বাপরে, ওকে আর ক্ষ্যাপাস নে ভাই! তার চেয়ে বরং বাঁকড়ি খেঁদিকে বলে দেখ, সে যদি মেয়ে দিতে রাজি হয়!

খেঁদি : বটে! সে হবেক নাই ভাই! আমার বিটিকে বিষ খাওয়াই মেরে ফেল্‌বে, তবু উ চীনাটাকে বিয়া দিব নাই। টুলি একটা চীনা মেয়্যাআনা করাক, উয়ার সঙ্গে তখন ঐ চীনা পুতুলের বিয়া দিবেক।

কম্‌লি : না ভাই, তোরা সব আমার খোকাকে অমন করে যা-না তাই বলিসনে! খোকা একটু খ্যাঁদা আর চোখ একটু কুতুরে বলেই না তোরা ওকে চীনা মনে করিস! ওকি আর সত্যিই চীনে? ওকে তো আমিই পেটে ধরেছি। ঐ দ্যাখ্ ও বুঝি কাঁদছে। ষাট, ষাট, বালাই!—

ধন্ ধন ধন্ ধন্ মুরলি
এই ধনকে দেখতে নারে কোন বেরালি!
ওকে কে বলে রে খ্যাঁদা,
তার চোখে লাগুক ধাঁদা।
খ্যাঁদা কি বলতে দেবো?
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেবো॥

টুলি : তা হলে ভাই, ডালিম কুমারের সঙ্গেই আমার মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হল, কেমন?

কম্‌লি : আচ্ছা ভাই, তাই নয়তো হল! তোর পুতুলের নাম কি ভাই? পুঁটুরানি, না? দে, বউকে একটু নাচাই।

পুঁটু নাচে কোন খানে
শতদলের মাঝখানে।
সেথায় পুঁটু কি করে,
ডুব-গালিগালি মাছ ধরে।
মাছ ধরে আর ফুল পাড়ে
কুঁড়োজালি দিয়ে মাছ ধরে॥

খেঁদি : এই! বিয়া যে দিবি, নেমন্তন্ন করতে বেরাবি নাই? ইদিকে ম্যাঘে ম্যাঘে যে অনেক বেলা হয়ে গেল খ।

কম্‌লি : খ ঠিক বলেছ ভাই খ। না ভাই সত্যি, চল,—পটলিকে আর বেগমকে নিয়ে আসি।

টুলি : ঐ দেখ বেগম আসছে।—হ্যাঁ, দেখ কম্‌লি, বেগমের সুন্দর একটা জাপানি পুতুল আছে, ঐটের সঙ্গে তোর চীনে পুতুলের বিয়ে দে না!

কম্‌লি : বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস ভাই। সেই—কী যেন একটা ছড়া আছে—ছাই মনেও পড়ছে না!

টুলি : ও! সেই ছড়াটা তো?—

খুকুর দেবো বিয়ে বেগম-মহলে,
খুকু হবে বেগম সাহেব, বাঁদী সকলে।
খুকু হাতে পরবে হীরের বালা
গলায় পড়বে মুক্তোর মালা।
সোনার খাটে থাকবে শুয়ে রূপোর মহলে
শতেক বাঁদী বাঁধবে চুল নাইয়ে গোলাব-জলে॥
(গান করিতে করিতে বেগমের আগমন)

কূলের আচার নাচার হায়
আছিস কেন শিকায় ঝু'লে।
কাচের জারে বেচারা তুই
মরিস কেন ফেঁপে ফুলে॥
কাঁচা তেঁতুল পেয়ারা আম
ডাঁশা জামরুল আর গোলাপ-জাম—
যেমনি তোরে দেখিলাম
অমনি সব গেলাম ভুলে॥

কম্‌লি : আয় ভাই বেগম, তুই আজ এত দেরি করলি কেন ভাই?

বেগম : বাপ রে। আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে। আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দার ভিতর বিবি করে রখতে।

কম্‌লি : মা গো মা ! কি হবে ! অসৈরণ সইতে নারি ! আট বছরের মেয়ে আবার বিবি হবে ! যা না তাই ! তোর সেই ছড়াটা কি রে বেগম?

বেগম : ও ! সেইটে?—

মা গো মা
আমি বিবি হব না !
আম কুড়োবো জাম কুড়োবো, কুড়োবো শুক্‌নো পাতা,
সোয়ামী করবে লাঙল-চাষ, আমি ধরব ছাতা।

টুলি : এই বেগম! শুনেছিস? আমার মেম-পুতুলের সাথে কম্‌লির ডালিমকুমারের আজ বিয়ে।

বেগম : সে কি ভাই! কম্‌লির ডালিমকুমার যে আমার জামাই হবে বলে কথা দিয়েছিল। আমার জাপানি পুতুলের কি হবে তা হলে?

কম্‌লি : তা ভাই, কি করি বল। তোরা সবাই চাস ডালিমকুমারকে জামাই করতে। ও বেচারা ছেলে মানুষ, ক'টা বউ সামলাবে বল তো! তাতে আবার বিবি বউ! বউগুলো আমার ছেলের হাড় সেদ্ধ করে দেবে যে!

বেগম : তা আমি জানিনে ভাই! টুলি তো ফুচুংকে জামাই করবে কথা ছিল। আমার গেঁইসা পুতুল কি তা হলে কড়ে-রাঁড়ি হয়ে থাকবে?

পঞ্চি : কম্‌লি রে বোন্‌ডি। তোর পোলারে দুইট্যা মায়্যার সাথে বিয়া দিয়া দে।

কম্‌লি : তা ভাই ও মন্দ বলেনি। আমার ডালিমকুমার তোদের দুজনার মেয়েকেই বিয়ে করুক। সে বেশ হবে। এক বউ শুয়ে থাকবে আর এক বউ মশা তাড়াবে।

টুলি : কি? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে? আমি বেঁচে থাকতে নয়। আয় পুঁটু, তোর অন্য বর খুঁজিগে।

পঞ্চি : বাপপুরে! তোমার পুথুলটা যেন হক্কল বুঝবার পারছে! পুথুল, তার আবার হতিন!

টুলি : তুই বুঝবি কিলা? হতিস মেয়ের মা, তা হলে বুঝতিস। পুঁটু, বল তো মা সেই ছড়াটা?

আয়না আয়না আয়না
সতীন যেন হয় না।
উদ্‌বেড়ালি ক্ষুদ খায়
স্বামী রেখে সতীন খায়।

খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা
সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ভ্যাংরা।

বেড়ি বেড়ি বেড়ি
সতীন আবাগী চেড়ি।
খোরা খোরা খোরা
সতীনকে ধরে নিয়ে যায় যেন তিন মিনসে গোরা।
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা
থুতকুড়ি থুতকুড়ি থুতকুড়ি।
সতীন যেন হয় আঁটকুড়ি।

পাখি পাখি পাখি
নিচে মল সতীন আমি উপর থেকে দেখি।
ফুলগাছটি ঝিকুড়ি
সতীন আবাগী মেকুড়ি।
ঢেঁকিশালে শূল আর ঠুস করে মল।
বঁটি বঁটি বঁটি
সতীনের ছেরাদ্দের কুটনো কুটি।
অশথ্ কেটে বস্‌ত করি
সতীন কেটে আলতা পরি!

খেঁদি : এতও জানে খ ! ছড়ায় ছড়ায় ছির্‌কুটে দিলেক।

বেগম : নে ভাই, আর ঝগড়া করতে হবে না। আমি ঐ ফুচুং-এর সাথেই গেঁইসা পুতুলের বিয়ে দেবো।

টুলি : আঃ, তুই বাঁচালি ভাই বেগম। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হোক তোর।

কম্‌লি : নে ভাই, এইবার লগ্নের ব্যবস্থা দেখি। এখন যে একজন পুরুত ঠাকুরের দরকার। পাঁজি পুঁথি দেখবে কে?

টুলি : হ্যাঁ ভাই, বেশ মনে করেছিস ! আমাদের বাড়িতে পুরুত ঠাকুর এসেছেন। মায়ের কি ব্রত আছে। আমি গিয়ে বুড়োকে ধরে আনি।

বেগম : সব তো হল ভাই, আমার মেয়ের কপালেই ঐ চোখ উল্টানো চীনা পুতুলটা ছিল।

পঞ্চি : আরে যাইতে দে ! পুতুলের তো বিয়া ! ঐ চীনাডার সাথেই তোর জাপানি মায়্যাটার বিয়া দিয়া দে। আর কাইজ্যা করে না। দেহি রে কম্‌লি, তোর চীনা পুতুলডারে দেহি। মাইয়্যো গো, উয়ার চেহারাডা দেইহ্যা আমার একটা ছড়াগান মনে আইছে।—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাচখ্যাচায়
প্যাঁচায় গিয়া উঠল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ।
প্যাঁচার ভাইশতা কোলা ব্যাং
কইল, চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাঁচায় কয়, বাপ, বারিত যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়
বোঁচা নাকে ফ্যাচফ্যাচায়॥

(সকলের হাসি)

বেগম : না ভাই ! জামাইয়ের যা কেচ্ছা করছে, আমি ওর সাথে মেয়ের বিয়া দেবো না।

খেঁদি : লে ভাই, তুরা যদি ঝগড়াই করবি, বিয়া হবেক কখন? ইদিকে লগনের বেলা যে বয়ে গেল। আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি করে খ।

কম্‌লি : না ভাই, ও-কথা বলিসনে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন, টুলি, তুইও তো জানিস ও গানটা, গা না ভাই আমার সাথে।

(গান)

মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥
এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান॥
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান॥

টুলি : সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম, এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম বলে কি তাকে ঘেন্না করতে হবে?—এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে—আমি পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আনি।

কম্‌লি : শিগগির আসবি কিন্তু ভাই। দাদা এলে কিন্তু সব তচনচ করে দেবে।

(গান করিতে করিতে কম্‌লির দাদামণির আগমন)

(গান)

হেড মাস্টারের ছড়ি, সেকেন্ড মাস্টারের দাড়ি
থার্ড মাস্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড-পণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি॥

দাঁড়াইয়া ঐ হাই বেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে ভেংচে,
খোঁড়া সেকেন্ড পণ্ডিত যায় লেংচে
হুঁকো হাতে বাড়ি,
তার মুখ নয় তেলো হাঁড়ি,
মোর হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ি॥

মণি : এই কম্‌লি, কি হচ্ছে? ওরে বাপ রে! কি সুন্দর সুন্দর সব পুতুল বের করা হয়েছে। দেখি, দেখি তোর পুতুল। আহা হাহা, ভাগ্নে আমার। এস এস, একটু আদর করি।

কম্‌লি : ওই যাঃ। আমার সায়েব পুতুলের ঠ্যাং ছিঁড়ে দিলে। হেই দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটি—আজ যে আমার পুতুলের বিয়ে। তোমাকে খুব করে খেতে দেবো, মা কালির দিব্যি করে বলছি।

মণি : হুঁম! মাস্টার মশাইয়ের মার খেয়ে আজ ক্ষিদেটা বেশি রকমেরই হয়েছে। দে, তবে নিয়ে আয় খাবার।

কম্‌লি : ও মা, এখুনি খাবার কি! টুলি পুরুতকে ডাকতে গেছে, পুরুত ঠাকুর আসুন, বিয়ে হোক, তারপর না খাবার।

মণি : আরে, পুরুত ঠাকুর আবার কি মন্ত্র পড়াবে? দে, আমি মন্ত্র পড়াচ্ছি—

আশীর্বাদং শিরশ্ছেদং ধ্বংস নাশং
অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্টিং পুরে মরং।

খেঁদি : মা গো কি হবে! এই নাকি মন্তর হল খ!

মণি : এই বাঁকড়ি খেঁদি, চুপ কর বলছি, নৈলে তোর দাদাকে শুদ্ধ ডেকে আনব, মজাটা টের পাবি তখন!

বেগম : দোহাই মণিদা, ওকে আর ডাকতে হবে না! বাপ রে, একা রামে রক্ষে নেই, তাতে আবার সুগ্রীব দোসর!

মণি : এই যে, বেগম! তুই কি খাওয়াবি? পোলাও মাংস কিন্তু! নৈলে তোর মেয়ের নাড়ি ভুঁড়ি বের করে দেবো, একেবারে হিরণ্যকশিপু বধ!

টুলি : এই যে ভাই পুরুত ঠাকুরকে এনেছি। বাবা, ঠাকুর কি আসতে চান। পাঁচ সিকে পয়সার কড়ার করে তবে এনেছি। —ও বাবাঃ! মণিদা যে! তাহলেই হয়েছে, সব ভণ্ডুল করবে!

পুরুত ঠাকুর : বলি, কি গো দিদি ঠাকরুণরা, বর কনে সব প্রস্তুত তো? এই সঙ্গে তোরাও কনে সেজে নে। আমারও এই সাথে একটা হিল্লে হয়ে যাক।

খেঁদি : মা গো, বুড়ার ভীমরথি হয়েছে খ। কুঁজার আবার সাধ যায় চিত হয়ে শুতে খ!

পুরুত : কেন, আমায় বুঝি পছন্দ হল না? আরে, রোজ চাল-কলা খেতে পারি। আর, মাসে চারখানা করে নতুন কাপড়।

কমলি : রক্ষে করুন ঠাকুর, আমরা কি হনুমান যে, চাল-কলার লোভ দেখাচ্ছেন! এখন পাঁজি-পুঁথি বের করে বিয়ের লগ্ন দেখুন।

মণি : পুরুত ঠাকুরের টিকিটি কি সুন্দর! যেন পারে যাবার টিকিট! আগায় আবার জবা ফুল বাঁধা, যেন কুঁকড়ো ঝুলছে!

পুরুত : আরে রামঃ রামঃ! এ লক্ষ্মীছাড়াটা কোত্থেকে জুটল? না দিদি ঠাকরুণ, আমার আর মন্ত্র পড়া হবে না। যা হনুমান জুটিয়েছ, ও চাল-কলা তো খাবেই, উল্টে জাত-ধর্ম পর্যন্ত নষ্ট করে দেবে!

মণি : ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই! আপনার চট্টোপাধ্যায় মশাই যে বঙ্কিম হয়ে চাতক পক্ষীর মতো হাঁ করে আছেন! বাবা, চটি তো নয় যেন জাঁতিকল! ওটা কি? গামছা? ওটা গাম ছা ত নয়, গাম ধাড়ি!

কমলি : আঃ, কি হচ্ছে দাদা? পুরুত মশাই, আপনি রাগ করবেন না। আপনি এখন দিন দেখুন।

পুরুত : হুঁ, বর কনেকে নিয়ে এস, যৌটক মিলিয়ে দেখি। বাঃ বাঃ ! চমৎকার বর কনে। এদের নাম কি?

কমলি : বরের নাম ডালিমকুমার, কনের নাম পুঁটুরানি।

টুলি : আর একজোড়া বর কনে আছে পুরুত ঠাকুর। বরের নাম ফুচুং আর কনের নাম গেঁইসা।

পুরুত : এ রকম নাম তো সনাতন ধর্মে শোনা যায় না !

টুলি : হাঁ ঠাকুর মশাই, বর হচ্ছে চীনে, আর কনে হচ্ছে জাপানি।

পুরুত : তা হলে ঐ কমলির দাদাই ওদের পুরুত হোক। ওসব যাবনিক অনুষ্ঠান আমার জানা নেই।

মণি : বেশ, বেশ ! এই কমলি, শিগগির তুই তা হলে এক ঝুড়ি আরসুলো, গোটা দুই টিকটিকি, তিনটে সোনা ব্যাং, পোয়াখানিক কেঁচো, এক ডজন পচা ডিম আর খানিকটা নাপ্পি যোগাড় করে আন, বুঝলি? ভোজ হবে।

পঞ্চি : দ্যাহো দাদা, এইদুন এক চটকনা লাগাইমু যে উৎকা মাইর‍্যা পইর‍্যা যাইব্যা ! ওয়াক থুঃ ! এ কি কয়, আমার বমি আইতেছে !

মণি : আরে, আরশোলার কাবাব, টিকটিকির চাটনি, পচা ডিমের ঘন্ট, তারপর এই—কোলাব্যাঙের কাটলেট, এসব না হলে চীনেদের ভোজ হবে কি করে? আর, বেগম ! তোরা তো ঈদের সময় সামাই খাস, কেঁচো দিয়ে কি চমৎকার চীনে সামাই হবে।

বেগম : তৌবা, তৌবা ! মণি দাদা, তুমি ভয়ানক দুষ্টু ! পেটের ভাত পর্যন্ত উঠে আসছে !

পুরুত : হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ট ! টুলি, তুই ডেকে এনে আমার এই সর্বনাশটা করলি ! আবার গঙ্গাস্নান করতে হবে দেখছি !

মণি : তা তো হবে, কিন্তু ঠাকুর মশাই, এখানে গো-বর তো পাওয়া যায় না, খানিকটা নর-বর এনে দেবো?

কমলি : দাদা, আমি চললাম মাকে ডাকতে। এখনি টের পাবে মজা !

মণি : আচ্ছা ভাই, এই আমি চুপ করলাম। এক ঘন্টার মধ্যে কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা চাই।

টুলি : এইবার ঠাকুর মশাই লগ্ন ক্ষণ দেখুন না।

পুরুত : আর দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু লগ্ন, সব প্রস্তুত তো?

কমলি : হাঁ, সব প্রস্তুত। আমরা ততক্ষণ একটা বিয়ের গান গেয়ে নিই। আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন।

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এল ঐ
সোনার গগনময়।
দাও আশিস অভয়, হে দেব জ্যোতির্ময়॥
মিলিল আবার দুইটি প্রাণ
কত যুগ পরে, হে ভগবান,

সার্থক কর, হে মনোহর, এ মিলন অক্ষয়।
যেন চির-সুখী হয়, হে দেব জ্যোতির্ময়॥

মণি : এই! বিয়ে যে হবে, তোদের ব্যাণ্ড কই, নহবৎ কই? শোন, আমি কেনেস্তারা বাজাই, বুঝলি? আর, টুলি, তুই শিঙে ফোঁক। পঞ্চি, তুই ভেঁপু বাজা? বাজা, বাজা, বাজা!

(ক্যানেস্তারা ইত্যাদির বাদ্য)

কমলি : দোহাই দাদা, থামো! তোমার রওশন-চৌকি মাথায় থাক। আমাদের রওশন-চৌকি আমাদের বাড়িতেই আছে। যা তো ভাই বেগম, তুই গ্রামোফোনে তালিম হোসেনের সেই সানাই-এর রেকর্ডখানা বাজা তো।

টুলি : বা ভাই, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস! (রেকর্ড বাজিয়া উঠিল) ঐ যে রেকর্ডখানা বেজে উঠল। এতক্ষণে না বেবাড়ি বলে মনে হচ্ছে!

পুরুত : কই, বর কনেকে নিয়ে এস। বরের হাতে কনের হাত দাও। আহা হা হা, অত জোরে না। বরের হাত যে দেহ ছেড়ে চলে এল। হাঁ হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার বল তো বাবা ডালিমকুমার—

যদিদং হৃদয়ং তব
তদিদং হৃদয়ং মম।

মণি : অনুস্বারং আর বিসর্গং যদি সংস্কৃতং হয়তং তবে আমিং কেনং বসতং। এই! একবার তোদের ফুচুং আর গেঁইসাকে নিয়ে আয়, আমি মন্তর পড়ি। হ্যাঁ বল তো বাবা ফুচুং—

ওয়ানং মর্নং আই মেটং এ লেমং ম্যানং
ক্লোজং টু মাই ফার্মং

পুরুত : বাপ রে বাপ, এ অবার কোন মন্তর রে বাবা! যেমন উনুনমুখো দেবতা, তেমনি ছাইপাঁশ নৈবিদ্যি।

কমলি : দাদার মন্তর পড়া ঠিক হচ্ছে তো পুরুত মশাই?

পুরুত : আরে, ঐ হয়েছে! হোক না কাঠের বেরাল, ইঁদুর ধরলেই হল। ঐ কারুর বিয়েতে হয় না!

কমলি : নে ভাই টুলি, নে ভাই বেগম, খুড়ি বেয়ান, এইবার তোদের জামাইকে আশীর্বাদ কর!

বেগম : বাবা ফুচুং! উপরে আল্লা, নিচে তুমি। দেখো, আমার গেঁইসা যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

যেন গাইবাছুরে সোহাগ ভরে
ধনে জনে ঘর ভরে,
আদর আহ্লাদ উপচে পড়ে।
যেন অষ্ট সুখে খায়
সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যায়।

ভিখ-ফকিরে আঁজলা আঁজলা ভিক্ষা পায়।
শ্বশুর শাশুড়ির চৌদোল এসে
পঞ্চ বাজন বাজিয়ে নিয়ে যায়।

টুলি : বাবা! উপরে ভগবান, নিচে তুমি। তোমার হাতে মেয়েকে দিলুম। দেখো যেন কোনো কষ্ট দিও না।

রাজরাজেশ্বর স্বামী হোক,
ভীমার্জুন ভাই হোক।
যেন উমার মতো আদর পাস,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পাস,
জয়া বিজয়া দাসী পাস,
কুবেরের ভাণ্ডার পাস।
ঘরে ঘটিবাটি ঝলমল করে,
আলনায় কাপড় দলমল করে।
বছর বছর পুত্র পাস।
হবে পুত্তুর মরবে না,
চোখের জল পড়বে না।

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

বেগম : এই পঞ্চি, তুই সেই লাল টুকটুক গানখানা গা না ভাই।

(পঞ্চির গান)

লাল টুকটুক মুখে হাসি মুখখানি টুলটুল।
বিনি পানে রং দেখে যা লাল-ঝুঁটি বুলবুল॥
দেখতে আমার খুকুর বিয়ে
সূয্যি ওঠেন উদয় দিয়ে,
চাঁদ ওঠে ঐ প্রদীপ নিয়ে
গায় নদী কুলকুল॥

খেঁদি : আমি আর কি আশীর্বাদ করব গ, তুরাই যে সব বলে ফেল্লি।

জন্ম জন্ম এয়ো হবি,
জামায়ের সুয়োরানী হবি।
আকালের লক্ষ্মী হবি।
সময়ে পুত্রবতী হবি।
সোনার কলসি টলমল
ঘটে ঘটে গঙ্গা-জল।
একূল থেকে ওকূলে যাবি,
দুইকূল শীতল করবি।

মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুর কুলে তারা,
তিন কূলে পড়বে জল গঙ্গা যমুনার ধারা।
মা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুল ভরে দাও ধনে জনে সুখী।

পঞ্চি : আমি ভাই আর কি কইমু—
চুল মেলবা সোনার খাড়ে,
নাইবা ধুইবা পদ্মার ঘাড়ে।
ভাত খাইবা সোনার থালে
বেন্নন খাইবা রূপার বাডিতে।
আঁচাইবা ডাবর–ভরা
পান খাইবা বিরা বিরা।
সুপারি খাইবা ছরা ছরা;
খয়ের খাইবা চাক্কা চাক্কা।
চুন খাইবা খুটরি–ভরা,
পেচকি ফেলাইবা লাদা লাদা।
(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

কমলি : নে ভাই, লগ্নের বেলা যে বয়ে গেল, এখন সকলে মিলে বর কনেকে বরণ করি। তার আগে ভাই বেগম একটা ওদের বিয়ের গান গাক।

(বেগমের গান)

শাদি মোবারকবাদি শাদি মোবারক।
দেয় মোবারক–বাদ আলম রসুলে–পাক আল্লা হক॥
আজ এ খুশির মহফিলে
দুলহা ও দুলহিনে মিলে
মিলন হল প্রাণে প্রাণে
মাশুক আর আশক॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এস এ মিলন–উৎসবে,
দোওয়া কর আজ এ খুশির
গুলিস্তান গুলজার হোক॥

কমলির ঠাকুরমা : ওরে ও–ও–ও কমলি, ওলো ও টুলি, ওরে ভুলি রে, ও নবা—

টুলি : ওরে কমলি, ঐ শোন ঠাকুমা ডাকাডাকি করছে। এই বেলা আশীর্বাদের গানটা গেয়ে নে।

(গান)

সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশিস।
শ্বশুর শাশুড়ির মা বাপের কুলের তারা হয়ে হাসিস।
লহ লহ এই আশিস॥
রামের মতো স্বামী পাস, সতী হস সীতার সম,
দশরথ কৌশল্যার মতো শ্বশুর শাশুড়ি অনুপম।
লক্ষ্মণ সম দেবর পেয়ে সুখের সায়রে ভাসিস।
লহ লহ এই আশিস॥
গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান,
সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান।
অন্নপূর্ণা জগৎ-জীবের মা হয়ে ফিরে আসিস
লহ লহ এই আশিস॥
সভা-উজ্জ্বল জামাই পাস,
ধরার মতো সহ্য পাস,
জন্মায়স্তে কাল কাটাস।
পাকা চুলে পরিস সিঁদুর হয়ে থাকিস স্বামীরে সো।
বেঁচে থাকিস যতকাল অক্ষয় থাক তোর হাতের নো।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে গঙ্গাজলে দেহ রাখিস।
লহ লহ এই আশিস।

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

—সমাপ্ত—

কালো জাম রে ভাই

কালো জাম রে ভাই!
আম কি তোমার ভায়রা ভাই?
লাউ বুঝি তোর দিদিমা
আর কুমড়ো তোর দাদামশাই॥

তরমুজ তোর ঠাকুমা বুঝি
কাঁঠাল তোমার ঠাকুর্দা,

গোলাপজাম তোর মাসতুত ভাই
জামরুল কি ভাই তোর ঝোন্যাই॥

পেয়ারা কি তোর ল্যাটিম রে ভাই
চিচিঙ্গে তোর লাঠি,
জাম্বুরা তোর ফুটবল
আর লঙ্কা চুষিকাঠি।
টোপাকুল তোর বৌ বুঝি
আর বৈঁচি লিচু তোর জামাই॥

নোনা আতা সোনা ভাই তোর
রাঙা দি তোর লাল মাকাল,
ডাব বুঝি তোর পানি-পাঁড়ে
টিল বুঝি তোর ভাদুরে তাল।
গেছো দাদা, আয় না নেমে
গালে রেখে চুমু খাই॥

জুজুবুড়ির ভয়

(দুপুর বেলায় খোকারা সব ছাদে গিয়ে কিৎকিৎ খেলছে)

ন্যাড়া : ছেল দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ দিগ।

হেবো : আমাদের মড়া মরেছে, কাঠ কুড়োতে যাবি কে,
আমাদের মড়া মরেছে, কাঠ কুড়োতে যাবি কে।

হরে : মোড়, মোড়, মোড়!

পুঁটো : ছেলকপাটি বৃন্দাবন,
ছেলকপাটি দাঁত কপাটি
ন্যাড়া মাথায় মারব চাঁটি।
আম পাতা জোড়া জোড়া—
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া—
হাডু ডুডু ডুডু......

মা : ও পুঁটো, ও হেবো, ও হরে! দুপুর রোদ্দুরে বাঁদর ছেলে কিৎ কিৎ খেলা হচ্ছে। শিগগির নেমে আয়!

হেবো : এই ন্যাড়া, মা ডাকছে, শিগগির চ'।

মা : কতদিন বলেছি, দুপুর বেলা ঘরে বসে বসে পড়বি, শিগগির বই নিয়ে বস!

হেবো : ওরে মায়ের বাবারে! ছাড় ছাড়, কান গেল, কান গেল! ছাদে খেলছিলুম কোথায়, ছাদে তো জুজুবুড়ি তাড়াচ্ছিলুম, তোমায় ধরতে এসেছিল।

খুকি : মা গো, তোরে সত্যি বলি, দেখে এলুম ছাদে গিয়ে,
মা–ধরা এক জুজুবুড়ি বসে আছে ঝুলি নিয়ে।
বললে, 'সে মা খোকায় ধরে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুঠি ধরে আর তিন সের দুধ খাওয়াই তায়।'
খবরদার মা, দুধ খেতে আর বলিসনে কো দোর দিয়ে।

হেবো : বললে বুড়ি, 'জল ঘাটলে বকে খোকায় যে সব মায়
হাবুডুবু খাওয়াই তাদের ডুবিয়ে কাদা–জল–ডোবায়!'
খবরদার মা, বকিসনে আর খেললে আমি জল নিয়ে।

খুকি : না বেড়াতে দিয়ে রোদে, ধরে যে মা পাড়ায় ঘুম,
বললে বুড়ি, 'বস্তায় পুরে লাগাই তারে দুমাদ্দুম।'
খবরদার মা, ঘুম পাড়াসনে, বেড়ালে রোদে গিয়ে।

মা : দাঁড়া, তোদের জুজুবুড়ি তাড়ানো দেখাচ্ছি। এই ন্যাড়া, হেবো, হরে! শিগগির বই নিয়ে বস। এই খুকি, ঘুমাবি আয়।

ঘুম আয় ঘুম! ঘুম আয় ঘুম!
নিশুতি দুপুর, নিশীথ নিঝুম।
ঘুম আয় ঘুম, ঘুম আয় ঘুম!
টুলটুল ঝিঙে ফুল ঘুমে ঝিমায়,
ঝুমকো লতায় ঝিঁঝি আলসে ঘুমায়।
খোকনের চোখে দেয় ঘুম–পরি চুম।
ঘুম আয় ঘুম॥

কে কি হবি বল

বোন : সাত ভাই চম্পা কে কি হবি বল।
তোরা কে কি হবি বল।
কেল্লো, ভুলো, হেবো, পচা, ভুতো, ন্যাড়া, ডল।

প্রথম ভাই : আমি হব কাবলিওয়ালা,
এক কুলো চাপ দাড়ি।
'তেরে মুসে আগা, মের মাগায়া,
লেয়াও রূপি তাড়াতাড়ি!'

দ্বিতীয় ভাই : আমি হব পণ্ডিত মশাই,
কাঁপবে ছেলের দল
দেখে কাঁপবে ছেলের দল॥
তৃতীয় ভাই : আমি হব ফেরিওয়ালা,
চাই চানাচুর ঘুগনিদানা !
পাড়ায় পাড়ায় ফিরব ঘুরে
পারবে না কেউ করতে মানা !
রাত্রে হাঁকব 'কুলফি বরফ'
হায় কি মজার কল॥
চতুর্থ ভাই : আমি হব জজ সায়েব,
দিব ফাঁসি ছমাস করে,
পঞ্চম ভাই : দারোগা আমি,
তোর জজকে চালান দিব থানায় ধরে।
ষষ্ঠ ভাই : আমায় দেখে দারোগা গুড়ুম,
আমি হব কনিষ্ঠ—বল॥
সপ্তম ভাই : আমি হব বাবার বাবা,
মা সে আমার ভয়ে
ঘোমটা দিয়ে লুকোবে কোণে
চূর্ণি-বিচ্ণি হয়ে !
বলবে বাবায়, ওরে খোকা
শিগগির পাঠশালা চল॥

ছিনিমিনি খেলা

ন্যাড়া : এই গুয়ে ! পুকুরের অত কাছে যাসনে ! পা পিছলে পড়ে যাবি। দেখছিসনে পুকুরটা জলে কি রকম টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে।

গুয়ে : দেখ না ভাই, কি সুন্দর শাপলা আর সুঁদিফুল ফুটে রয়েছে ! চারটি তুলে আনি।

ন্যাড়া : ওরে না না, মা বলেছে পুকুরে জল-দানো আছে ! ঠ্যাং ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আয় চারটি খোলামকুচি কুড়িয়ে এনে ছিনিমিনি খেলি। আচ্ছা, পুঁটো, তুই আগে ছোঁড়।

পুঁটো : না ভাই, এক সঙ্গে ছুঁড়ি। দেখি, কার কতদূর যায়। রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি ! (সকলে খোলামকুচি ছুঁড়িল)।

ন্যাড়া : ওরে ভাই, দ্যাখ দ্যাখ, ব্যাঙটার মাথায় লেগেছে। ঐ দেখ, জলে নেমে চিৎ হয়ে পড়ল। ঠিক যেন মনি-ব্যাগ ভাসছে।

পুঁটো : আচ্ছা ভাই, মা যে বলে—জল ঘাঁটালে সর্দি হয়, কই ব্যাঙের তো সর্দি হয় না।

(ব্যাঙের ডাক)

(সকলের গান)

ও ভাই কোলা ব্যাং, ও ভাই কোলা ব্যাং!
সর্দি তোমার হয় না বুঝি, ও ভাই কোলা ব্যাং।
সারাটি দিন জল ঘেঁটে যাও ছড়িয়ে দুটি ঠ্যাং।
ও ভাই কোলা ব্যাং॥

লক্ষ্মী মেয়ে মা তোর বুঝি,
খেললে বেড়ায় না কো খুঁজি,'
কেউ বকে না, মজাসে তাই গাইছ ঘ্যাঙর ঘ্যাং॥

দিবানিশি জল ঘাঁট, তাও
চোখ ওঠে না, কি ওষুধ খাও?
জল-দানোটা আসলে, ফেলে দাও কি মেরে ল্যাং॥

ব্যাঙদাদা, তোর মায়ের মতো
মা যদি মোর লক্ষ্মী হত,
তোর সাথে ভাই থাকতাম জলে—
ছেড়েং ডেড়েং ড্যাং!
ছেড়েং ডেড়েং ড্যাং॥

কানামাছি

হেবো : এই ন্যাড়া, এই গুয়ে, এই খেঁদি! আয় ভাই কানামাছি খেলি। এই গুয়ে, তুই ভাই কানামাছি।

গুয়ে : না ভাই, তা কেন, এস গোনা হোক—

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি
রেন কম ঝমাঝম!
পা পিছলে আলুর দম!

এই রে, ন্যাড়া চোর। নে ওর চোখ বাঁধ। আচ্ছা রেডি—

সকলে : কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ,
কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ !
ন্যাড়া : ওরে বাবারে ! ওরে বাবারে ! (কান্না)
খেঁদি : ওঠ ভাই লক্ষ্মীটি, কাঁদতে নেই।
ন্যাড়া : না ভাই, আমি আর খেলব না। আমার বড্ডো লেগেছে।
হেবো : চোর দেয় না বাড়ি যায়
হাঁড়ি-বাড়ি ভাত খায়।
খেঁদি : ছি ছি ছি, দেখছিস, ওরা কি বলছে? ওঠ চল খেলি চল।
ন্যাড়া : উঃ, আমার ভয়ানক লেগেছে ! কাঠটা শক্ত যেন কাঠ !
গুয়ে : না রে, ওটা কাঠ না, ওটা তালগাছ। দাঁড়া না, ওকে হুলোই।

(গান)

ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মতন পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই॥
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই?
আমার মতন একপায়ে ভাই
দাঁড়িয়ে আছিস কান ধরে ঠায়
একটুখানি ঘুমোয় না তোর
পণ্ডিত মশাই॥
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই॥

মাথায় তুলে পাততাড়ি তোর
কি ছাই বকিস বকর বকর?
আমতা আমতা করে নামতা
পড়িস কি সদাই?
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই॥

তালগাছ, তোর মাথার কোলে
বাবুই পাখির বাসা ঝোলে,
কোচর-ভরা মুড়ি যেন—
দে না দুটি, খাই।
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই॥

পাখিরা তোর মাথায় এসে
উড়ে এসে জুড়ে বসে,

ঠুকরে ওরা দেয় কি মাথায়,
পাতা নাড়িস ভাই?
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই॥

নবার নামতা পাঠ

(গান)

নবা : একদা এক হাড়ের গলায়
বাঘ ফুটিয়াছিল—

নবার বাবা : হাঁ রে নবা, এই বুঝি তোর নামতা পড়া হচ্ছে? খেয়ে উঠে যদি তোর নামতা পড়া না পাই, তা হলে আজ তোর হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব। বুঝলি?

নবা : না বাবা, আমি তো পড়ছি।

(নামতা পাঠ)
একেককে এক—
বাবা কোথায়, দেখ!
দুয়েককে দুই—
নেই কো? একটু শুই!
তিনেককে তিন—
উহুহু! গেছি! আলপিন!
চারেককে চার—
ঐ ঘরে আচার!
পাঁচেককে পাঁচ—
হুই দেখ কুলের গাছ।
ছয়েককে ছয়—
বাবা গুড় বয়!
সাতেককে সাত—
পণ্ডিত মশাই কাত!
আটেককে আট—
আমি বড় লাট!
নয়েককে নয়—
আর একটু ভয়!
দশেককে দশ—
বাবা আপিস! ব্যস্!

(গান)

আমি যদি বাবা হতুম, বাবা হত খোকা,
না হলে তার নামতা পড়া,
মারতাম মাথায় টোকা॥
রোজ যদি হত রবিবার!
কি মজাটাই হত যে আমার!
কেবল ছুটি! থাকত নাকো নামতা লেখা জোকা!
থাকত না কো যুক্ত অক্ষর, অঙ্কে ধরত পোকা॥

সাত ভাই চম্পা

—প্রথম ভাই—

আমি হব সকাল বেলার পাখি।
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠব আমি ডাকি।
সূয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন'—মা বলবেন রেগে!
বলব আমি, 'আলসে মেয়ে! ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল—তাই বলে কি সকাল হবে নাকো!
আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে!'
ঊষা দিদির ওঠার আগে উঠব পাহাড়-চূড়ে,
দেখব নিচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মুড়ে,
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়,
বলব আমি, 'ভোর হল যে, সাগর ছুটে আয়!'
ঝর্না-মাসি বলবে হাসি, 'খোকন এলি নাকি?'
বলব আমি, 'নই কো খোকন, ঘুম-জাগানো পাখি!'
ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে আলো,
সূয্যিমামা বলবে উঠে, 'খোকন, ছিলে ভালো?'
বলব, 'মামা, কথা কওয়ার নাই কো সময় আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার!'
রবির আগে চলব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগবে সাগর, পাহাড়, নদী, ঘুমের ছেলে মেয়ে!

—দ্বিতীয় ভাই—
—আমি হব গাঁয়ের রাখাল ছেলে।
বলব, 'দাদা, প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে!'
আঁচল ভরে মুড়ি নেব, হাতে নেব বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটিরে কোলে করে পার হব ভাই খাল,
বটের ছায়ায় জুটবে এসে রাখাল ছেলের পাল।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে,
ছাতিম তরু ধরবে ছাতা আমার মাথার পরে।
শালের পাতার মুকুট গড়ে পরিয়ে দেবে তারা,
সিংহাসনে পাতবে এনে নবীন ধানের চারা।
গলায় বনফুলের মালা ; দুলবে ছাতিম-শাখে
কাঁচা রোদের সোনার ঝালর পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
দণ্ড তুলে বলব আমি, 'ওগো করদ নদী,
করব শাসন এই মাঠে কর না দিয়ে যাও যদি।
এদেশে না ফললে ফসল, না পেলে ঘাস গরু,
না হাসিলে ফুলে-ফলে আমার দেশের তরু,
পাহাড় কেটে পাথর এনে রাখব তোমায় বেঁধে,
তোমায় খুঁজে সাগর-মাতা মরবে তোমার কেঁদে!'
বলব মেঘে, 'জল দিয়ে যাও, আমি রাখাল-রাজা,
নৈলে বন্ধু থামিয়ে দেবো তোমার মাদল-বাজা!
বজ্র তোমার নেব কেড়ে নিবিয়ে বিজলি-বাতি,
রাখব বেঁধে তোমার রাজার ঐরাবতী হাতি!'
বনকে ডেকে বলব, 'কানন, শোনো আমার কথা,
ভিড় করে সব নীড় বাঁধিবে সকল পাখি হেথা।
ঝড়কে বলো, আমার আদেশ—একটি পাখির নীড়
উড়ায় যদি, ধরে তারে পরাব জিঞ্জির।'
সন্ধ্যা হলে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে।

—তৃতীয় ভাই—
—আমি হব দিনের সহচর।
বলব, 'ওরে রোদ উঠেছে লাঙল কাঁধে কর!
তোদের ছেলে উঠল জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশি,
জাগল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ রে মাঠের চাষী!'

'শ্যাওলা' 'হাঁসা' দুই না বলদ দুই ধারেতে জুড়ে
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটির কাগজ ফুঁড়ে
লিখব সবুজ কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি,
উপর হতে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।

ধরায় ডেকে বলব, 'ওগো শ্যামল বসুন্ধরা,
শস্য দিয়ো আমাদেরে এবার আঁচল ভরা।
জংলি মেয়ে ছিলে তুমি, ছিল না কো 'ছিরি',
মরুর বুকে থাকতে শুয়ে, ফিরতে কানন গিরি।
আমরা তোমায় ধরে এনে দিয়েছি ঘর-বাড়ি,
গা ভরা তোর গয়না মা গো ময়নামতির শাড়ি।
জংলা কেটে ক্ষেত করেছি, ফসল সেথা ফলে;
পাহাড়ে তোর 'বাংলো' তুলে দ্বীপ রচেছি জলে।
বন্ধ্যা সম যে সুধা তোর একলা নিয়ে ছিলি,
আমরা নিয়ে সে সুধা তোর বিশ্বে করি বিলি!
বন্য মেয়ে! আমরা তোরে করেছি রাজরানী,
ধুলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসন আনি।'

খামার ভরে রাখব ফসল গোলায় ভরে ধান,
ক্ষুধায় কাতর ভাইগুলিরে আমি দেবো প্রাণ!
এই পুরানো পৃথিবীকে রাখব চির তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটির রাজা!

—চতুর্থ ভাই—

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার 'লাল বাওটা' তুলে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মানিক তার
আমার তরী বোঝাই করে দেবে উপহার।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখবে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তামালা আমারে নজরানা।
চারপাশে মোর গাংচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।

আসবে হাঙর কুমির তিমি—কে করে তায় ভয় ;
বলব, 'ওরে, ভয় পায় যে—এ সে ছেলেই নয়।'
সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, আমি বণিক বীর;
খাজনা জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজি মোল্লামাঝি, নৌ-সেনা ঐ জেলে,
বর্শা দিয়ে বিঁধবে তারা, রাজ্যে আমার এলে।'
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখব না কো আর,
বন্যা এনে ভাঙব বিভেদ করব একাকার।
আমার দেশে থাকলে সুধা তাদের দেশে দেবো।
বলব মাকে, 'ভয় কি গো মা, বাণিজ্যেতে যাই !
সেই মণি মা দেবো এনে তোর ঘরে যা নাই।
দুঃখিনী তুই, তাই তো মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব—ঢাকব মা এ লাজ।'
লাল জহরত পান্নাচূণী মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানী।

শিশু জাদুকর

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু জাদুকর !
কোন রূপ-লোকে ছিলি রূপকথা তুই,
রূপ ধরে এলি এই মমতার ভুঁই।
নবনীত সুকোমল লাবণি লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগবিজয়ে।
কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি—
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।
অমরার প্রজাপতি অন্যমনে
উড়ে এলি দূর কান্তার-কাননে।
পাখা ভরা মাখা তোর ফুল-ধরা ফাঁদ,
ঠোঁটে আলো চোখে কালো-কলঙ্কি চাঁদ !
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল—
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা–যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে?
বনে কি পড়িল কম একটি কুসুম?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।

স্বরগের সব–কিছু চুরি করে চোর,
পলাইয়া এলি এই পৃথিবীর ক্রোড়!

নিয়ে এলি হুরিদের তুলতুলে গাল,
পরিদের রাঙা ঠোঁট টুকটুকে লাল,
কিন্নরী–কণ্ঠ ও নার্গিস চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের উষার আলোক,
চিবুকের টোল ভরে সুধা অমিয়া,
মন্মথ–ফুলধনু ভুরুতে, নিয়া
চোখে ফিরদৌসের লাল ইয়াকুত!—
তোরে, চোর, খুঁজে ফেরে আসমানি দূত!
তোরে হেরি বেহেশতে কাঁদে ইউসুফ,
তোর হাসি শুনে বনে বুলবুলি চুপ।
ছোট তোর মুঠি ভরি আনিলি মণি—
সোনার জিয়নকাঠি মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভরে এলো ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হল, কি জানিস গুণ!
এল কুসুমের বাস পাখিদের গান,
ভিড় করে আলো এল, বুক ভরে প্রাণ।
পেলি হেথা ঠোঁট–ভরা মধু চুম্বন,
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।
তোর নামে রহিল রে মোর স্মৃতিটুক,
তোর মাঝে রহিলাম আমি জাগরূক।

অগ্রন্থিত গল্প

হারা ছেলের চিঠি

মা,

সেদিন ছিল যাত্রানাস্তির দিন যেদিন ভোরে নতুন করে পুবের পানে পা বাড়ালাম! ঐ পুবের পারে উদয়-রবির তোরণদ্বারে সেদিন সোহিনী-বিভাস পূরবীর মতো কান্না কেঁদে আমায় ডাক দিয়েছিল। আমার মনের বীণায় বুঝি সে সুর-মূর্চ্ছনার ছোঁওয়া লেগেছিল। সাগরপারের আমার সেই অচেনা বীণ-বাদিনীর কাজল চোখে তখন বাদল নেমেছিল। সে বিদেশিনীর সজল চাওয়ার মিনতি ইঙ্গিত আমি সেদিন বুঝিনি। তার দীঘল ঘন আঁখিপল্লবের কম্পনে কম্পনে যে কালো ছায়াছবির মায়া দুলছিল, তাকেই আমি সেদিন বোবা বালিকার পথে বেরিয়ে পড়ার হাতছানি মনে করেছিলাম। তাই পথহীন পথের বুকে দাঁড়িয়ে আমি ঐ সীমাহারা পুবের পানে হাত বাড়ালাম। তখন ছিল যাত্রানাস্তির ক্ষণ। মনে হলো, ঐ নীল আকাশের নিতল চোখে জল-ছলছল শুকতারাটি যেন তারি আঁখিতারা, তার করুণ কিরণের অরুণ সুর আমার হিয়ার হিয়ায় পথিক বধূর বেদন জাগিয়ে গেল। তোমার পলাতকা পথিক-শিশু আবার পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে মনে হলো, এই আমার সেই 'বিপুল সুদূর'—সেই অদেখা বন্ধু, যার বাঁশির সুর আমায় দিশেহারা বাউল, পথহারা পথিক করে পথের পর পথ ঘুরিয়ে মারছে—কোথাও বাসা বাঁধতে দিচ্ছে না। ঝড়ের রাতে নীড়হারা বিহগ শাবকের মতো আমি একটু আশ্রয় আশায় শুধু দিগ্বলয়ের কোল ঘেঁসে ঘেঁসে উড়ে বেড়িয়েছি, ঘরের পানে তৃষিত-ব্যাকুল চোখে চেয়েছি, আর কেমন এক বিদ্রোহ-অভিমানে আমার দুচোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে আশ্রয়ও আমি পাইনি, ঘরও মেলেনি—তোমার মতন করে এ বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখিকে কেউ বুকে তুলেও নেয়নি—আজ আমি আবার ছুটে যেতে চাই কেন? কিসের এত অভিমান-ক্রন্দন আজ আমার বুকে নিখিল মাতৃহারা শিশুর আকুল হাহাকার হানছে? আত্মীয়-পরে সবাই মিলে যার গলায় কসাইয়ের মতো ছুরি চালিয়েও কাঁদাতে পারেনি, ভগবান যার প্রথম এবং প্রধান শত্রু, রুদ্রদেব সারা বিশ্বের অশান্তি আর অভিশাপ হেনেও যাকে পরাজয় মানাতে পারেনি, তাকে তুমি কেমন করে এমন অসহায় শিশুর মতন করে ডাক ছেড়ে কাঁদালে? কেন তাকে কাঁদালে? আর কিসের এ দুর্জয় ক্রন্দন আমার? কেন আজ মনে হচ্ছে, এই আমার একবার প্রাণ খুলে পথে পথে কেঁদে বেড়াবার দিন? আজ আমার মনে পড়ছে, যে কেউ আমায় আদর করে বুকে ধরতে এসেছে, অমনি সে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

আর অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ অকারণ আহত আমি, শুধু জল-ভরা চোখে কোনো নিষ্ঠুর নিয়ন্তার পানে তাকিয়ে কী যেন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছি! অমনি দূরে দূরে শাল-পিয়ালের শ্যামল পথ পারায়ে ঐ বীণ-বাদিনীর কচি কণ্ঠের সিক্ত-সুর এই বলে আমায় কাঁদায়ে গেছে :

সে মানুষ আগুন-ভরা, পড়লে ধরা
সে কি বাঁচে?
কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে যে তার
রক্ত নাচে!

কিন্তু সত্যই কি আমি আগুন-ভরা? সত্যিই কি আমার আগুন আঁচে গৃহবাসীর ঘরের শান্তি পুড়ে ছারখার হয়ে যায়? কেন? আমি বোধ হয় ভুলেও কোনোদিন কোনো শত্রুরও শত্রুতা-সাধন করিনি। আমি পথের পথিক, পথের ভিখারি, চির-গৃহ-হারা। আমার শত্রুই বা কে, আর কারই বা অনিষ্ট করব? আমি তো দুঃখ দিতে চাইনে, আমি চাই শুধু আনন্দ দিতে, নিজে সারা বিশ্বের, নর-নারীর সকল অকল্যাণ-বিষ আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে ঘরে ঘরে কল্যাণ বিলাতে! তবে, এ কোন নির্মম শক্তি আমার মঙ্গল-পথে কাঁটার বেড়া দেয়? তবু কি বলতে হবে মা, যে, 'মঙ্গলময়' বিশেষণে বিশেষিত বিধাতা নামক কোনো জীব এ বিশ্বকে সুনিয়ন্ত্রিত করে চালাচ্ছে? নাই—নাই, এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা নিয়ন্তা কেউ নাই।

যাক সে কথা। কি বলছিলাম? সেদিন ছিল ১৩২৭ সালের ২১শে চৈত্র, রবিবার, নিশিভোর; দিন ক্ষণ সমস্ত কিছু ছিল যাত্রানাস্তির, যেদিন অকারণে বিনা-কাজের আহ্বানে পুবের পানে পাড়ি দিলাম। সে যাত্রার কথা আমার প্রাণ-প্রিয়তম বন্ধুদেরও জানালাম না, পাছে তারা বাধা দেয়। আমায় যে তখন চলায় পেয়েছে, তখন পথ যে আমায় ডাক দিয়েছে। আমি এই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে আসছি যে, কাজের মাঝে ডাক পড়লে আমি তাতে সাড়া দিতে পারি না, কিন্তু বিনা কাজের ডাকে আমার মাঝের পাগল কি উল্লাসেই না নৃত্য করে ওঠে!

কেন চলেছিলাম? কিসের আশায় চলেছিলাম? কে আমায় দুঃখ দিল যে, আমার পথের বাসা হাতের সুখে বানিয়ে এমন করে পায়ের সুখে ভেঙে পথে দাঁড়ালাম? তা জানিনে! ... আজ এক-বুক বেদনা বুকে চেপে ঐ অকারণ-যাত্রার মানেটা হাজার রকমে বুঝতে চেষ্টা করছি আর সেই ব্যর্থ চেষ্টার ব্যথা ক্লেশে মাথার আর বুকের ভেতরটা আমার যেন কেমন নিঃসাড় হয়ে আসছে—কে যেন আগুনের হাতুড়ি নিয়ে পাঁজর-চাপা এই ঝাঁজরা কলজেটাতে ঘা মারছে।

আমার বড্ডো আদরের পথে পাওয়া এক ছোট বোন মরণ-শিয়রে দাঁড়িয়ে, তার এই পালিয়ে-বেড়ানো পথিক-ভাইটিকে ধরতে পাঠিয়ে সেই পথের বুকে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত শেষ দৃষ্টিটুকুর করুণ সোহাগ-কান্না বিছিয়ে রেখেছিল। পথের নেশা

আমায় এমন মাতাল করে তুলেছিল যে, নির্মম আমি, আমার অভিমানী বোনের সে অধিকার দুপায়ে দলে চলে গেছি। সে শুধু জল-ভরা চোখে এই স্নেহ অধিকারের পরাজয় চেয়ে চেয়ে দেখেছে—কিছু বলেনি ! তার ঐ কিচ্ছু-না-কওয়াটাই আমার বুকে দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছে ! আমার এ অপরাধ সে ক্ষমা করবে কিনা জানি না, কিন্তু সে করলেও আমি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। স্নেহ-অধিকারকে মাড়িয়ে যাওয়ার বুঝি ক্ষমা নাই।

হায় ! কত দুঃখের, কত ক্লেশের, কত আশা-ভরসার বন্ধনে আমি নিজেকে জড়াই আমার এই পথে-পাওয়াদের মাঝে ! আর কত নিবিড় করেই না তাদের এই হারা-ভিতু বুকের তলায় জড়িয়ে ধরি ! আবার, সে কোন মুহূর্তে এক নিমেষের ভুলে, এক অজানা ক্ষণের খামখেয়ালিতে কি নিষ্করুণভাবেই না সে বেদনা-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে আর এক অজানা পথে ছুটে চলি ! সে ভুল এত বড় ভুল যে সারা জীবনের সাধনাতেও তা আর বুঝি শোধরানো যায় না। এ কি অশোয়াস্তির অভিশপ্ত অশান্ত জীবন আমার ! কে আমায় এই নির্দয় ভুল করায়? কে এমন করে আমার পথের বাসা বারেবারে ঝড়ে উড়িয়ে দেয়? কে সে? কেন তার এ অহেতুক দুষমনি আমার ওপর?

এই বন্ধন ছিন্ন করে করে আজ দেখছি, এতে ক্ষতি হয়েছে আমারি সবচেয়ে বেশি, দুঃখ পেয়েছি আমিই সবেচেয়ে বেশি ! এতে যে আমার নিজের বুকই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আমি যে বাঁধন খুলিনি, বাঁধন ছিঁড়েছি। আর, ঐ টেনে ছেঁড়ার দরুন প্রতিবারই একটা করে শক্ত গিঁট আমার কলজে-তলায় কেটে বসে গেছে ! তাই আজ আমার এই হৃদয়রোগের সৃষ্টি, আজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও আমার এত কষ্ট ! দম যেন আটকে আসছে, তবু একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না ! হিয়ায় হিয়ায় আমার এক বীভৎস খুনখারাবি—শুধু লাল আর লাল ! খানখান খুন ! ! সে ছিন্ন গ্রন্থি-বন্ধনগুলোর সব কটাই আমার হৃদপিণ্ডটা জুড়ে ক্রমেই দাগ কেটে কেটে বসে যাচ্ছে, আর ততই আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ঝাউ-এর বুকে উত্তরী হাওয়ার লুটিয়ে-পড়া কাঁদনের মতো কাৎরে কাৎরে উঠছে ! উঃ, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা মা !

হ্যাঁ, তবু আমায় যেতে হলো। সকলের স্নেহ-অধিকারের কাতর কান্না আহ্বানকে পরাজিত করে আমায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, পুবের হাওয়ায় ভেসে-আসা ঐ বেদন সুর। সে তখন গাচ্ছিল—'ওরে সাবধানী পথিক ! বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।' আমার মনের কোণে কেমন যেন কাতর কান্না গুমরে গুমরে ফিরতে লাগল। 'ওরে এই বেলা বেরিয়ে পড়, নইলে আর সে অসম্ভাবিতের দেখা পাবিনে—পাবিনে !' হায়, কে সে অসম্ভাবিত আমার? কোন আপনজনকে এবার পাব আমি? কোন হারা মা আমায় ডাক দিয়েছে? আচ্ছা, যে স্নেহ আমায় ডাক দিয়েছে, যে ঘরের মায়া এমন করে আমায় পথের পানে আকর্ষণ করছে, সে কি নিজে হতে এসে ধরা দেবে না? সেও কি আমার আশায় পথ চলছে না? আবার মনের বনে আমার প্রতিধ্বনি উঠল, 'না রে

পাগল! তার চলা যে অনেক-অনেক যুগের! এবার তোকেই এগিয়ে গিয়ে তাকে পেতে হবে।' পুবের হাওয়ায় ঐ কথাটি আমি গানের সুরে পথে পথে গেয়ে বেড়াতে লাগলাম :

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে
আমি চলব বাহিরে।
ঐ শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে—
আর সময় নাহি রে ...

তারপর যেতে যেতে দেখলাম পথের দুধারি ঘাসে আর কাশের সারি ছোট্টো অভিমানী মেয়ের মতো শীষ দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে—'না, না, না!' ধানের কচি চারাগুলি তাদের অধরপুটে সবুজ হাসি ফুটিয়ে মাথা হেলিয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে—'না, না, না!' দূরে দিগন্ত-ছোঁওয়া গ্রামে সীমায় লাজনত বাঁশের বধূ মাটির পানে চেয়ে চেয়ে শ্বাস ফেলছে আর কেঁপে কেঁপে জানাচ্ছে, 'না, না, না!' বাঁধাঘাটে কাঁখের কলসি জলে ভাসিয়ে দিয়ে কিশোরী পল্লিবধূ আমার রথের পানে চেয়ে সজল চোখের করুণ চাওয়ার ভাষায় প্রশ্ন করছিল, 'কোথা যাও, ওগো বিদেশি পথিক?' সে বালিকাবধূ ভাবছিল, হয়তো তার বাপের বাড়ির কাছেই আমার বাড়ি। হয়তো তাদের ঘরের সামনে দিয়ে আমার চলার পথ। আহা, ওর যে তাহলে কত কথাই জানাবার আছে তার বাপ-মাকে, তার ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে! ঐ ছোট্টো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এ গৃহহারার চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। আহা, মার কোল-ছেঁড়া গৃহহারা দিদি আমার। আমি তোদের দেশের নই বোন, তবু কেন তোকে দেখে এত কান্না পায়! তোর চোখে আজ সারা বাংলার ঘরহারা বালিকাবধূর ব্যথা ঘনিয়ে উঠেছে যে ভাই! ঘরের মায়া এমনই বেদনা-বিজড়িত মধুর! দেখলাম, ময়নামতি শাড়ির খুঁটে চোখ মুছে ভরা কলসি কাঁখে সে ধানখেত পারিয়ে শুপারি গাছের সারির মাঝে মিলিয়ে গেল। 'রাজা রানি' নাটকের 'কুমার'-এর 'ইলা'-র সঙ্গে কথোপকথনের সেইখানটা মনে পড়ে গেল, যেখানে 'কুমার' তার বড় সোহাগের বড় আদরের ছোট বোন 'সুমিত্রা'-র কথা মনে করে চোখের জল ফেলছে। 'সুমিত্রা' তখন পর হয়ে গেছে—তার বিয়ে হয়ে গেছে। সেই কথাটি সে 'ইলা'-র কাছে প্রাণ-কাঁদানো ভাষায় করুণ মধুর করে বলছে। সেই সঙ্গে 'ইলা'র মর্মস্পর্শী গানটিও মনে পড়ে গেল :

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর।
বাহিরে বাঁশির সুরে ছেড়ে যায় ঘর!

আরো দেখলাম, কলার ভেলায় চড়ে উদাসীন পথিক গাঙ পার হচ্ছে, আর গাঙের দুপাশের ধানের চারায় ধানী হরফে লেখা তার যেন কোনো হারানো-জনের পত্র-লেখা আনমনে পড়তে পড়তে যাচ্ছে। আমার মনের গাঁয়ের চিরদিনের পসারিনী তখনো

'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে' হেঁকে হেঁকে দখিন হাওয়াকে ব্যথা দিচ্ছিল।

রোদে-পোড়া দুপুরটা তৃষ্ণাকাতর যমকাকের মতো হাঁপাচ্ছে আর খাঁ খাঁ করছে, তখন তরী আমাদের পদ্মার বুকে ভাসল! দেখলাম পদ্মার শুকনো ধূ-ধূ করা চরটা নির্জলা একাদশীর উপবাসক্লান্ত বিধবা মেয়ের মতো উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে ধুঁকছে। ও-পারে মানিকগঞ্জের সীমানা সবুজ রেখায় আঁকা। এ-পারে ফরিদপুরের ঘন বনছায়া। এ-পারে ও-পারে দুটি সাথীহারা কপোত-কপোতী কূজন-কান্নায় তখন যেন সারা দুপুরটার বুকে দুপুরে মাতন জুড়ে দিয়েছিল! কী এক অকূল শূন্যতার ব্যথায় বুকটা আমার যেন হো হো করে আর্তনাদ করে উঠল।

মা! যেদিন নিজে নিজে কেঁদে তোমাদের কাঁদিয়ে বিদায় নিয়ে আসি, সেদিন আসন্ন বিকালে এই গোয়ালন্দের ঘাটে পদ্মার বুকে স্টিমারে রেলিং ধরে ঐ ওপারে— মানিকগঞ্জের সবুজ সীমারেখার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, আমার বুক চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল। তুমি যে বলেছিলে যে, ঐখানে—ঐ অপরপারের সুনীল রেখায় আমাদেরও ঘর ছিল। সে ঘর হয়তো আজো আছে, কিন্তু সে আজ পোড়োবাড়ি, আরো মনে পড়ল, ঐ গাঁয়েরই চিতার বুকে হয়তো এই কীর্তিনাশারই অপর কূলে, আমার হারা-বোন বেলীর স্মৃতি ছাই হয়ে পড়ে আছে। ওরে কোথা সে সর্বগ্রাসী শ্মশান-মশান? কোথায় সে শতস্মৃতি বিজড়িত পোড়ো ঘরখানি? আমায় সবচেয়ে বেশি করে কাঁদাতে লাগল আমার ঐ দুটি হারা-বোন লিলি আর বেলীর পোড়া স্মৃতি! সবচেয়ে বেশি দুঃখ রয়ে গেল আমার, আমি তাদের দেখতে পাইনে! বেলা নাকি যাবার দিনে 'পদ্ম-পলাশ-আঁখি' দেখেছিল! এই কথা শুনে কমলা প্রমীলা হেসে উঠেছিল, তাই সে রেগে বলেছিল, 'তোরা কখনো তাঁকে দেখতে পাবিনে, তোরা মিথ্যা বলিস, যারা মিছে কথা কয়, তাদের তিনি দেখা দেন না!' ঐ সত্য আর তেজের মধ্য দিয়েই তার বহুযুগের সহজ সাধনা পূর্ণতা লাভ করে আসছিল, তাই যেদিন সে পদ্ম-ইলিশ-আঁখির চাওয়া দেখল, সেদিন সে মুক্ত। সে মুক্তকে কি আর আমরা বেঁধে রাখতে পারি? তাই সে বাঁধন-হারা মেয়ে বাঁধন কেটে চলে গেল।

ওরই ঘন্টাখানিক আগে আমার আর একবার বুক তোলপাড় করে উঠেছিল, যখন এপারে ফরিদপুরের পানে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, ঐ ছায়া-সুনিবিড় কোনো একটি গৃহের আঙিনার তুলসী-মঞ্চে আমার স্নেহময়ী তেজস্বিনী মাসী-মার সন্ধ্যা-প্রণামগুলি হারিয়ে গেছে! স্বাহা কন্যা আমার এই দীপ্তিমতী সন্ন্যাসিনী মাসিমাকে মনে পড়ে আমার আকুল কান্না চেপে রাখতে পারিনি। আচ্ছা বলতে পারো, এ তপস্বিনী মেয়ের হাতের নোওয়া, সিঁথির সিঁদুর কেড়ে বিধাতার কি মঙ্গল সাধিত হলো? কে এর জবাব দেবে মা? এতেও কি বলতে হবে যে, মঙ্গলময় নামের কোনো একটি বিশেষ দেবতা আছেন— —যাঁর সকল কাজেই কল্যাণ রয়েছে? এই বিধবা মেয়েদের দেখলে আমার বুকের ভেতর কেমন যেন তোলপাড় করে ওঠে। বাংলার বিধবার মতো বুঝি এত করুণ—এত হৃদয়বিদারক দৃশ্য আর নেই। এই তপস্বিনীদের উদ্দেশে আমি আমার হৃদয়-জোড়া

শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম—আরো মনে পড়েছিল, আমার বিদ্রোহিনী মেয়ে ছোটোমাসি মার কথা।

আমি ছায়া-সুনিবিড় ঐ এপার ওপারে গাছের সারির পানে সজল চোখে চেয়ে চেয়ে চিনবার চেষ্টা করতে লাগলাম; কোথায় আমার সেই মা-মাসিমার পরশপূত হারা-গৃহগুলি?

পদ্মার বুকেই ধোঁয়ার মতন ঝাপসা হয়ে মলিনা সন্ধ্যা নেমে এল! সন্ধ্যা এল, ধূলি-ধূসরিত সদ্য-বিধবার মতন ধূমল কেশ এলিয়ে, দিগ্‌বালাদের মেঘলা অঞ্চলে সিঁথির সিঁদুরটুকুর শেষ রক্তরাগ মুছে! ধানের চারায় আর আমার চোখে অশ্রু-শীকর ঘনিয়ে এল!

চাঁদপুরে যখন রেলে চড়লাম, তখন সন্ধ্যা বেশ ঘনিয়ে এসেছে। ট্রেন চলতে লাগল। আমি কেমন যেন উন্মনা হয়ে পড়লাম। অলস উদাস চোখে আমার শুধু এইটুকু ধরা পড়ছিল যে, ভীষণ বেগে উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছে—আঁধার রাতের আঁধারতর গাছপালাগুলো। চলন্ত ট্রেনের ছায়াটা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন একটা বিরাট বিপুল কেন্নো ছুটে যাচ্ছে।

কুমিল্লায় যখন নামলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। কন্দর্পের মতো সুন্দর এক যুবক আমায় 'এসো' বলে হাত বাড়াল—তার পদ্ম-পলাশ-আঁখি দেখে, আঁখি আমার জুড়িয়ে গেল! আমরা না চিনতেই পরস্পরকে ভালোবাসলাম। সে উল্টো আমাকেই পদ্ম-পলাশ আঁখি বলে ডাকল। আমার চোখে জল ঘনিয়ে এল।

দুটি ভাইয়ে গলাগলি করে যখন আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম, তখনও সেখানে নিশি যেন নিশি-জেগে বসে আছে। প্রথমেই দু-তিনটি চঞ্চল দুষ্টু মেয়ে চোখে পড়ল। তারা সকৌতুক-বিস্ময়ে আমার পানে তাদের ডাগর চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

তুমি এসে দাঁড়াতেই আমি কেমন অভিভূতের মতো তোমার পানে চেয়ে রইলাম। আমার এমন মুখর মুখও মূকের মতো কথা হারিয়ে ফেলল।

আমি তোমায় চিনলাম। কত দেশ-বিদেশেই তো ঘুরে বেড়ালাম, কিন্তু এমন ভরাট শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃরূপ তো আর আমার চোখে পড়েনি। সে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বমাতার অন্নপূর্ণা-রূপে দু-চোখ আমার ডুবে গেল! তোমার বিহ্বল চোখের চাওয়াতেও জন্ম-জন্মান্তরের মাতৃত্বের অতৃপ্ত ক্ষুধিত চেনা চাওয়া দেখেই আমি চিনলাম, এ যে আমারই হারা-মায়ের দৃষ্টি! তুমি বলেছিলে নাকি, তোমার কোন-সে অতীত-জন্মের হারা-মানিককে খুঁজে পেতেই এমন করে বারেবারে শত শত মা-হারা ছেলের মা হচ্ছে। এমন করে বিশ্বমায়ের ফাঁদ পেতেছ, সেই পলাতকা শিশুকে ধরবার জন্য। তাই তুমি ধর্ম-সমাজ কিছু মানোনি, সকল পথে-পাওয়া ছেলেকেই সমানভাবে কোল দিয়েছ। আকাশে বাতাসে আমার মনের কথা ধ্বনিত হলো, ওরে, এবার আমায় পথে বেরিয়ে পড়া সার্থক হয়েছে! এবার আমি বুঝি 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ'। কত কথাই না মনে হলো তখন, সে যেন কেমন এক অভিভূতের ভাব। সেসব মনে পড়ে এত বিহ্বল হয়ে পড়ছি আমি যে, আজ তা জানাতে গিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলছি। ... যাক, সে

রাত্রিতে বড় শান্তির ঘুম ঘুমালাম—এই সুখে যে, আজ আমি ঘরের কোলে ঘুমাচ্ছি। ... তারপর, বুকে তীর বিঁধে আবার যখন আহত পাখিটির মতন রক্তবমন করতে করতে তোমার দ্বারে এসে লুটিয়ে পড়লাম, তখন তুমি আর মাসি-মা আমায় কী যত্নেই না বুকে করে এসে তুলে নিলে। তোমরা আর আমার ঐ শিশু-বোন কটিই আবার যমের দ্বার হতে আমায় ফিরিয়ে আনলে। আজ ভাবছি কী ঘরের মায়ায় বনের হরিণকে মুগ্ধ করলে? আশীর্বাদ করো মা, তোমাদের এই দেওয়া প্রাণ যেন তোমাদেরই কাজে লাগিয়ে যেতে পারি।

বনের পাপিয়া

টেঁপাখোলা স্টিমার-স্টেশন।

পূর্ণচাঁদের প্রেম-জ্যোৎস্নার ছোঁওয়ায় পদ্মা নদী যেন আবিষ্টা হয়ে দুলছে। তার হৃদয়ের আনন্দ দেহের কূলে কূলে আছড়ে পড়ছে।

কূলে বসে ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মি. দুঃশাসন মিত্রের স্ত্রী রমলা।

মি. মিত্র অস্থির চিত্তে পায়চারি করছেন আর মাঝে মাঝে এসে তাগাদা দিচ্ছেন— 'রমলা, রাত প্রায় নয়টা হলো—এইবার ওঠো।' রমলা আবিষ্টার মতো পদ্মার ঢেউ দেখছিল—কোনো উত্তর দিল না। দূরে আবছায়ার মতো একটা ডিঙি নৌকায় সরল ভাটিয়ালি সুরে কার বাঁশি বেজে উঠল। রমলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—'ওগো দেখেছ? ঐ চাঁদ যেন কৃষ্ণ, পদ্মা যেন রাধা—ওর ঢেউ যেন নীল শাড়ি, কৃষ্ণকে দেখে ওর সারা দেহে প্রাণে যেন নাচন লেগেছে। ঐ দেখো, বাঁশি শুনে ওর উন্মাদ দশা আরো বেড়ে উঠেছে!'

মি. মিত্র রমলাকে অত্যন্ত ভয় করতেন। ও বড় জেদি মেয়ে। অপরূপা সুন্দরী, তার ওপর বাপের বাড়ি থেকে বিপুল অর্থ ও সম্পত্তি নিয়ে এসেছে। অত্যন্ত আনন্দ-চঞ্চলা, তবু কোথায় যেন তার কী অভাব। হঠাৎ সে হয়ে যায় অন্যমনস্কা। তার মুখে কোনো না-জানা বিরহের ছলছল ছায়া পড়ে। রমলাকে এই অবস্থায় দেখলে মি. মিত্র অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওর এই ভাবের কোনো অর্থ না পেয়ে সাংসারিক অর্থের কথা পেড়ে আরো অনর্থের সৃষ্টি করেন। রমলা কেঁদে-কেটে মোটরে করে পদ্মার তীরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে। মি. মিত্র—দুঃশাসন নাম হলেও তাকে শাসন করতে পারেন না। কারণ ঐ মোটর তারই বাবার টাকায় কেনা—ওঁর চাকরি রমলারই বাবার সুপারিশে।

রমলা যখন পদ্মা নদীর ঢেউ আর চাঁদকে রাধা-কৃষ্ণের লীলা মনে করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে যা মনে আসছিল বলে যাচ্ছিল—তখন মি. মিত্র একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বলে উঠলেন—'কীর্তন শিখতে গিয়ে তোমায় এই পাগলামিতে ধরেছে রমলা।' রমলার বাবা কৃষ্ণভক্ত, বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় কীর্তন হয়। রমলাও কিছু কিছু কীর্তন গাইতে পারে। ও যখন গায় তখন ওর মন যেন বৃন্দাবনে চলে যায়—যত না গায়, তার চেয়ে কাঁদে বেশি।

রমলা কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই কোথা হতে একটা পাখি উড়ে এসে একেবারে রমলার বুকের উপর এসে পড়ল। রমলা চমকে 'উঃ' বলে চীৎকার করে উঠতেই মি. মিত্র পাখিটাকে ধরে বলে উঠলেন—'রমলা, রমলা, দেখেছ কী সুন্দর একটা পাখি! এ কি, এর যে ডানা ভাঙা!' রমলা মি. মিত্রের হাত থেকে পাখিটাকে কেড়ে নিয়ে বুকে চেপে ধরে

দেখতে লাগল। কি পাখি, কিছুতেই চিনতে পারল না। মি. মিত্র বললেন, 'হরবোলা।' রমলা অনেকক্ষণ ধরে পাখিটাকে নেড়েচেড়ে দেখলেন। আশ্চর্য পাখিটা যেন ওর কতকালের পোষমানা, উড়ে যাবার কোনো চেষ্টা করল না। মি. মিত্র কেবলই বলতে লাগলেন, 'দেখছ না, ওর নিশ্চয়ই ডানা ভাঙা, নইলে উড়বার চেষ্টা করছে না কেন?'

রমলা ধরা গলায় বলে উঠল—'বাড়ি চলো!' পাখিটা দিব্যি মাথা গুঁজে পড়ে রইল, ও যেন ওর হারানো নীড় ফিরে পেয়েছে—চোখ দুটি যেন ঘুমে আবিষ্ট, একটুও নড়ল না।

বাড়ি এসে মি. মিত্র হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন পাখিটাকে রাখা যায় কোথায় এ নিয়ে। রমলা তার ড্রইংরুমে পাখিটাকে নিয়ে ঢুকে চমকে উঠল। তার বুকের আঁচলে রক্তের দাগ কোথা থেকে এল? পাখিটাকে নাড়াচাড়া করে দেখল, ওর কণ্ঠ দিয়ে রক্ত ঝরছে—কোনো বন্য পশু বা সাপ হয়তো ওকে আক্রমণ করেছিল। রমলার বুকে যেন ঐ আহত পাখির বেদনা বেজে উঠল। সে তাড়াতাড়ি হলুদ আয়োডিন চুন প্রভৃতি লাগিয়ে পাখিটাকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল—ও যদি না বাঁচে! বাপের বাড়িতে রমলাকে ওর দাদারা 'ছিচকাদুনি' বলে ডাকত, পশুপক্ষীর এতটুকু দুঃখ দেখলে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিত। সে কেবলই বাড়ির ঝি চাকরদের বলতে লাগল, 'দেখেছিস, পাখিটা যেন আমার কতকালের পোষা, এই দেখো ছেড়ে দিচ্ছি, তবু পালিয়ে যায় না।' বলেই পাখিটাকে বুকে চেপে অজস্র চুম্বন করতে লাগল। একটু পরেই মি. মিত্র হাঁপাতে হাঁপাতে শহর থেকে একটা মস্ত খাঁচা নিয়ে এসে বললেন, 'রমলা, এই দেখো, খাঁচা নিয়ে এসেছি—দেখেছ খাঁচাটা কি সুন্দর! বলেই রমলার হাত থেকে পাখিটাকে নিয়ে খাঁচায় পুরে বলতে লাগলেন—'এ জাতের পাখি তো কখনো দেখিনি! খানিকটা বৌ কথা কও পাখির মতো দেখাচ্ছে—পাপিয়াও হতে পারে।' দু-একজন চাকর সায় দিয়ে বলল, 'আজ্ঞা হাঁ, এটা পাপিয়া।'

আহত পাখির কণ্ঠে এখন প্রায় 'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা' স্বর শোনা যায়।

রমলার চার পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, সন্তানাদি হয়নি। তার বিশেষ শখ আছে বলেও মনে হয় না। সবাই বলে ও যেন কেমন এক ধরনের মেয়ে। বন্ধুবান্ধবও বিশেষ কেউ নেই। অন্য সব অফিসারদের স্ত্রীরা আলাপ করতে আসেন, সে আলাপ ভদ্রতা সৌজন্যের আলাপেই শেষ হয়। বন্ধুত্ব কারুর সাথেই হলো না। এতে মি. মিত্র মনে মনে খুশি—আলাপ জমলে যদি খরচা বাড়ে। মি. মিত্র বেশ খানিকটা কৃপণ। চাকরেরা বলে, পিঁপড়া নিঙড়ে উনি গুড় বের করেন।

মাস খানেক পরে দেখা গেল, পাপিয়াটা খাঁচায় থাকতে চায় না—কেবলই পাখা ঝাপটে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। রমলার প্রথম প্রথম ভয় হত, ও যদি উড়ে যায়। ভয়ে ঘরের দোর বন্ধ করে খাঁচার বাইরে এনে বুকে চেপে ধরে ছেড়ে দিয়ে দেখত, ও পালিয়ে যেতে চায় কিনা। খাঁচার আশ্রয়ের চেয়ে রমলার বুকের আশ্রয় যেন পাখিটার অনেক বেশি মধুর লাগত। সে রমলার বুকে এসে কেবলই ডাকত—'পিউ কাঁহা, পিউ কাঁহা।' রমলা হেসে বলত—'আমি কি জানি!' বলেই চুমো খেত, চোখ দিয়ে তার অকারণে জল আসত। কয়েক মাস পর দেখা গেল পাখিটা অদ্ভুত পোষ মেনে গেছে।

ওর উড়ে যাবার কোনো ইচ্ছা বা চেষ্টা নেই। বাসার সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে পাখিটা প্রায় অনেক কথাই শুনে শুনে আধো আধো ভাবে বলতে পারে। ঝি চাকরদের নাম ধরে ডাকে। কীর্তন শুনলে—'রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ' বলে অনবরত উচ্চ হতে উচ্চস্বরে কণ্ঠ চড়িয়ে যেন কাঁদতে থাকে। রমলা গান থামিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে অশ্রু ছলছল কণ্ঠে বলে—'বৃন্দাবনের পাখি।' মি. মিত্রের বন্ধুবান্ধব চাকর ঝি সবাই বলে—'ও হরি-বোলা।' কারণ, হর-বোলা পাখি দেখতে এ রকম হয় না। কত বাড়ি থেকে কত লোক পাখিটাকে দেখতে আসে। এক বছর হয়ে গেছে—এখন পাখিটা অনেক কথা বলতে পারে। ...

হঠাৎ পাখিটাকে কি রোগে ধরল, রমলাকে দেখলেই 'পিয়া, পিয়া' বলে ডেকে ওঠে। রমলার হৃদয় আনন্দে দুলে ওঠে—সেই আনন্দের মাঝে সে কী যেন গভীর বেদনার আভাস পায়। কোথা হতে এল এই বনের পাখি, কে শিখালো তাকে এ ডাকনামে ডাকতে? ও কি বৃন্দাবনের দূত? ও কি কৃষ্ণের বেণুকা? পাখিকে বুকে জড়িয়ে সে কাঁদতে থাকে—ওকে না দেখে সে থাকতে পারে না। যেখানে যায়, সাথে করে পাখিটাকে নিয়ে যায়। ...

প্রথম প্রথম মি. মিত্রও পাখিটাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি রমলার কাছে গেলেই পাখিটা ডেকে উঠত—'চোখ গেল, চোখ গেল!' রমলা হেসে বলত—'ছেড়ে দেও, ওর হিংসে হচ্ছে, ও সব বুঝতে পারে!' মি. মিত্র পাখিটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে রমলাকে আরো বেশি আদর করতেন—পাখিটা তত ডাকত—'চোখ গেল, চোখ গেল!' দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ত।

আগে পাখির হিংসা হতো এখন মি. মিত্রের হিংসা হয়। রমলা যেন মি. মিত্রের চেয়ে পাখিটাকে বেশি ভালোবাসে। সর্বদা পাখির চিন্তা, ওকে নিয়ে খেলা। ও কিসে ভালো থাকবে, কি খাবে—ইত্যাদি নিয়ে অহেতুক ভয় ভাবনা। পাখি পিঁজরায় থাকবে, দুবার ডাকবে—ভালো লাগবে, বুকে নিয়ে নাহয় খানিক আদরও করল, কিন্তু রাতদিন পাখি আর পাখি—আঁখি ছাড়া হতে দেবে না, এ যেন তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠল।

একদিন বলেই ফেললেন—'রুমু, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ পাখিটাকে নিয়ে।' রমলার বুকে কে যেন চাবুক মারল—সে আহত ফণিনীর মতো ফণা তুলে বলে উঠল—'তার মানে?' মি. মিত্র উষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, 'তার মানে আমার চেয়ে তুমিই বেশি বোঝো!'

রমলা আরক্ত মুখে নত নেত্রে কী খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমাকে কখনো কারুর সাথে মিশতে দেখেছ, ছেলে কি মেয়ে?' মি. মিত্র বললেন, 'না! রমলা আবার বলল, 'আমার আচরণে চলাফেরায় কখনো এমন ভাব দেখেছো যা তোমাকে পীড়া দেয়?' মি. মিত্র হঠাৎ যেন অপরাধীর মতো রমলার হাত ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ও কথা কেন বলছ রুমু? সত্যি, অন্য বন্ধুদের স্ত্রীদের আচরণ, চলাফেরা, অন্যের সাথে মেলামেশা দেখে আমার গা রি রি করতে থাকে। আধুনিক ছেলেমেয়েদের মেলামেশায় যে কুৎসিত অসংযমের পরিচয় পাই, তার আভাস পর্যন্ত

পাইনি কোনদিন তোমার জীবনে। আমি এইখানে নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করি। রমলার চোখ দুটি শুকতারার মতো ঝলমল করতে লাগল—মাঝে মাঝে সে এমনি করে মি. মিত্রের দিকে চায়। মি. মিত্র এই দৃষ্টিকে অত্যন্ত ভয় করেন—এ যেন কোনো দেবীর দৃষ্টি—শ্রদ্ধায় ভয়ে মি. মিত্রের তখন রমলাকে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে।

রমলা বলল—'ঐ পাখির কণ্ঠে বৃন্দাবন কিশোরের আহ্বান শুনি। ও তো পাখি নয়, ও যে তাঁর হাতের বেণুকা—ওকে বুকে ধরে আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরের স্পর্শ পাই। ওকে যদি হিংসা করো তাহলে ভাবব, তুমি অসুর, তোমার সাথে আমার কোনো সংস্পর্শ থাকবে না।'

মি. মিত্র সহসা যেন অসুর হয়ে উঠলেন। অজগর সাপের মতো তাঁর চোখ জ্বলতে লাগল। চীৎকার করে বলতে লাগলেন—'জানি, তোমার বাবার অনেক টাকা, —আমার সম্পত্তি, চাকরি সব তাঁরই দেওয়া, তুমি অনায়াসে আমায় ছেড়ে যেতে পারো, চাই কি আর একটা বিয়েও করতে পারো'—রমলা মি. মিত্রের কথা শেষ হতে দিল না, প্রদীপ্ত মহিমায় সে যেন অসি-লতার মতো ঝলমল করে উঠল, সারা অঙ্গে যেন অপরূপ জ্যোতি ফুটে উঠল। মি. মিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল—'তুমি অসুন্দর, তুমি কুৎসিত, তোমাকে দেখলে, তোমার কথা শুনলে আমার পরম সুন্দরকে ভুলে যাই—এই সুন্দর পৃথিবী আমার কাছে বিস্বাদ হয়ে ওঠে! তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও!' শেষের কথা কয়টি যেন আদেশের মতো শুনাল।

রমলা সোফারকে ডেকে মোটরে করে মি. দত্তের বাড়ি চলে গেল। মি. দত্ত একজন বৃদ্ধ মুন্সেফ, তাঁর স্ত্রী রমলাকে মেয়ের মতো আদর করেন। রমলার বন্ধু-বান্ধব বলতে এই এক মিসেস দত্ত। রমলা এঁকে মা বলে সম্বোধন করে—তার মা নেই।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই তার মনে হলো—এই কলহের আবর্তে পড়ে সে পাখিটার কথা একেবারেই ভুলে গেছিল। সারাদিন তাকে ডাকেনি, তার কথা স্মরণ করেনি, তাকে দেখেনি। তার বুক অসহ্য ব্যথায় টনটন করতে লাগল। সে প্রায় উন্মাদিনীর মতো তার ড্রইং রুমে ঢুকতেই দেখল—পিঞ্জর শূন্য, পাখি নেই! রমলার সমস্ত শরীর যেন টলতে লাগল। সে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল।

বহুক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে সে চাকরদের ডেকে বলল—'আমার পাপিয়া, পাপিয়া কোথায় গেল?' ঝি চাকর কেউ কোনো উত্তর দিল না। রমলার বুঝতে বাকি রইল না, যে, মি. মিত্রই পাখিটাকে হয় ছেড়ে দিয়েছেন, কিংবা—

এমন সময় মি. মিত্র ঘরে ঢুকলেন।

রমলার সারা দেহ যেন দিব্যশক্তির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সে মি. মিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'আমার পাপিয়া কোথায়?' মি. মিত্র কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—'বনের পাখিকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

রমলা তার বেণী খুলতে খুলতে বলল—'তাহলে আমিও বনে চললুম।'

মি. মিত্র দৈত্যের মতো তাঁর প্রকাণ্ড শরীর দুলিয়ে বললেন, 'বনে গিয়েও তাকে আর পাবে না—তার পাখা ভেঙে সে যেখান থেকে এসেছিল, সেই পদ্মার তীরে বনে ফেলে

দিয়ে এসেছি—সে এতক্ষণ বন-বেড়াল বা সাপের গর্তে গিয়ে মুক্তিলাভ করেছে নাহয় পদ্মার ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।' মি. মিত্র যতক্ষণ উগ্র মূর্তি ধারণ করে এই কথা বলছিলেন, রমলা ততক্ষণে তার সমস্ত অলঙ্কার কাঁকন চুড়ি খুলে কেশ এলিয়ে অপরূপ নিরাভরণা মূর্তিতে আবিষ্টার মতো দুলতে দুলতে বলল—'তুমি তাকে আহত করতে পারো, কিন্তু হত করতে পারো না। সে যে বৃন্দাবনের পাখি। তুমি আমার পতি—স্বামী, কিন্তু ও পাখি যাঁর দূত হয়ে এসেছিল তিনি আমার পরম পতি, পরম স্বামী। জনমে জনমে আমি তাঁর দাসী, তাঁর প্রিয়া। তুমি জানো, তুমি যতদিন আমার স্বামী ছিলে, ততদিন আমি আমার কোনো কর্তব্যে অবহেলা করিনি। আমার সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করেছি। আমার সমস্ত ঐশ্বর্য তোমাকে দিয়েছি। ঐ ঐশ্বর্য দিয়ে তুমি আবার বিয়ে করো। জানি না কার অভিশাপে অসুরের পত্নী হয়ে এসেছিলুম। আমি কি পূর্বজন্মে তুলসী ছিলাম? কৃষ্ণবক্ষ বিলাসিনী তুলসীকে শঙ্খ-চূড় দৈত্যের পত্নী হতে হলো। কিন্তু অভিশাপের দীর্ঘদিন যখন কাটল তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর তুলসীকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। আমারও অভিশাপের জীবন আজ শেষ হলো, আর এই পৃথিবীতে আমি আসব না, আর কোনো অসুন্দর আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পাপিয়া!—পাপিয়া! ঐ যে সে আমায় পিয়া পিয়া বলে ডাকে? আমি তোমার ডাক শুনেছি—আমি যাব—তোমার কাছে যাব।' —বলেই উন্মাদিনীর মতো পদ্মাতীরের দিকে ছুটল।

মি. মিত্র ক্রোধোন্মত্ত ছিলেন বলে তাকে ধরতে গেলেন না। গুম হয়ে বসে রাগে কাঁপতে লাগলেন।

রমলা পথে যায় আর ডাকে, 'পাপিয়া, আমার পাপিয়া!'

তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। ঊর্দ্ধগগনে শুক্লা একাদশীর চাঁদ তার সামনে জ্যোৎস্নায় যেন বিরহিনী শ্রীরাধার দিব্য অশ্রু ঝরে পড়ছে। জনহীন পথ, নদীর পাশে বন, সেই বনে উন্মাদিনী রমলা শতবার আছাড় খায়। কাঁটালতায় তার নীলাম্বরী হয়ে যায় ছিন্ন ভিন্ন, অঙ্গ হয়ে যায় ক্ষতবিক্ষত—তবু সে ভাবে—'প্যাপিয়া—আমার বৃন্দাবনের পাপিয়া ফিরে আয়, ফিরে আয়।'

সহসা যেন পদ্মানদীর বালুচরে সেই চেনা কণ্ঠের ডাক শোনা গেল—'পিয়া—পিয়া!' রমলা পদ্মার চরে আছাড় খেয়ে পড়তেই আহত বক্ষে শ্রান্ত কণ্ঠে মুমূর্ষু পাপিয়া তার বক্ষে এসে ডাকতে লাগল—'পিয়া—পিয়া!' রমলা মৃত্যু-আহত পাখিকে বক্ষে নিয়ে পদ্মার স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! তার এলোকেশ পদ্মার ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল। তার অঙ্গের জ্যোতিতে পদ্মা যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পদ্মার জলে তার মুখখানি যেন নিবেদিত পদ্মের মতো ভাসতে লাগল। চন্দ্রালোকিত ঊর্দ্ধ আকাশের পানে তার মুখ উন্মুখ হয়ে যেন কাকে দেখতে চাইল! বুকের পাপিয়াকে দুই হাতে করে ঊর্দ্ধে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। পদ্মার ঢেউয়ে পদ্মা তার কৃষ্ণ ভ্রমরকে বুকে নিয়ে কোথায় ভেসে গেল কে জানে!

গ্রন্থ-পরিচয়

[নজরুল-রচনাবলী-র বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশ-কাল ও কতকগুলি রচনা সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো। 'পুনশ্চ' শিরোনামে পরিবেশিত তথ্য নতুন সংস্করণের সম্পাদনা-পরিষদ কর্তৃক সংযোজিত। 'জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন' বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যোগ করা হয়েছে।]

নির্ঝর

১৩৪৫ সালে 'নির্ঝর' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রকাশক : মৌলবী ইমদাদ আলি খান, প্রোঃ মোহসিন এন্ড কোং ; ৬৬/এ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রীতারাপদ ব্যানার্জি, দি মডেল লিথো অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬৬/১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ৯৬ + ২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা। —কিন্তু কাব্যখানি যথারীতি বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির হয় নাই। এ-সম্পর্কে চৌধুরী শামসুর রহমান লিখিয়াছেন :

> ১৯৩০-৩১ সাল। ... এই সময়েই মোহাম্মদ কাসেম সাহেব ঢাকা থেকে গিয়ে আমাদের আস্তানায় উপস্থিত হন। কবি নজরুলের একখানা কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি সঙ্গে করে নিয়েই তিনি আমাদের ওখানে গিয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম এর আগে যখন ঢাকায় ছিলেন, তখনই কিছু টাকার বিনিময়ে এই পাণ্ডুলিপিখানা কাসেম সাহেবকে হস্তান্তর করেন। অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় মোহাম্মদ কাসেম কোনো প্রকাশকের কাছে পাণ্ডুলিপিখানা বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আমি তাঁকে সঙ্গে করে বৈঠকখানা রোডে এমদাদ আলী সাহেবের প্রেসে নিয়ে যাই। এমদাদ আলী সাহেব এককালে মাসিক 'সহচর' পত্রিকা বের করতেন এবং তারপর কয়েকখানা বই-পুস্তকও প্রকাশ করেন। তিনি নজরুলের বইখানা কিনতে রাজি হন এবং নগদ নয় শত টাকার বিনিময়ে আমরা তাঁকে পাণ্ডুলিপি প্রদান করি।
>
> —[পঁচিশ বছর, ১৩৪ পৃষ্ঠা।]

> কবি তাঁর এই বইয়ের 'নির্ঝর' নাম দিয়েছিলেন এবং এতে মোট ১৪টি কবিতা ছিল। ... পরে কয়েকবার উকিল (এমদাদ আলী) সাহেবের প্রেসে গিয়ে বইখানির কয়েকটি মুদ্রিত ফর্মা দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। কোন্ রহস্যজনক কারণে যে উকিল (এমদাদ আলী) সাহেব পাণ্ডুলিপির জন্যে নগদ নয়-শো টাকা প্রদান করে এই বই ছাপার পরও তা বাজারে বের করলেন না, তা জানার কোনো উপায় ছিল না।
>
> —[নজরুল একাডেমী পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৭৭]

ঢাকার অধুনালুপ্ত 'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদক মরহুম মোহাম্মদ কাসেম সাহেবের নিকট হইতে কলিকাতার মোহসিন অ্যান্ড কোম্পানি যে-পাণ্ডুলিপিখানি ক্রয় করেন

তাহাতে মোট ১৪টি কবিতা ছিল বলিয়া প্রকাশ ; কিন্তু 'নির্ঝর' কাব্যে মুদ্রিত হয় নজরুলের ২৫টি কবিতা ; সম্ভবত এই কারণেই কাব্যখানি বাজারে বাহির হইতে পারে নাই। উক্ত ২৫টি কবিতা হইতেছে :

> ১. অভিমানী, ২. বাঁশির ব্যথা, ৩. আশায়, ৪. সুন্দরী, ৫. মুক্তি, ৬. চিঠি, ৭. আরবি ছন্দের কবিতা, ৮. প্রিয়ার দেওয়া শরাব, ৯. মানিনী বধূর প্রতি, ১০. গান (আজ নূতন করে পড়ল মনে মনের মতনে), ১১. গরিবের ব্যথা, ১২. তুমি কি গিয়াছ ভুলে, ১৩. হবে জয়, ১৪. পূজা-অভিনয়, ১৫. চাষার গান, ১৬. জীবনে যাহারা বাঁচিল না, ১৭-২৪. দীওয়ান-ই-হাফিজ : ৮টি গজল, ২৫. নমস্কার। ...

'অভিমানী' ১৩২৮ ফাল্গুনের 'সহচর'-এ, 'বাঁশির ব্যথা' ১৩২৭ কার্তিকের 'বঙ্গনূর'-এ, 'আশায়' ১৩২৬ পৌষের 'প্রবাসী'তে এবং 'সুন্দরী' ১৩২৭ ভাদ্রের 'বঙ্গনূর'-এ বাহির হয়েছিল।

'মুক্তি' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা ; ১৩২৬ শ্রাবণের 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

'চিঠি' ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গনূর'-এ বাহির হয় ; শিরোনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা আছে : 'গাথা'।

'আরবি ছন্দের কবিতা' ১৩২৯ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'প্রবাসী' হইতে ১৩২৯ মাঘের 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'য় সংকলিত হইয়াছিল।

'প্রিয়ার দেওয়া শরাব' ১৩২৭ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় এবং 'গরিবের ব্যথা' ১৩২৭ আশ্বিনের 'বঙ্গনূর'-এ বাহির হইয়াছিল।

'দীওয়ান-ই-হাফিজ' : ১ ও ২ সংখ্যক 'গজল' ১৩২৭ অগ্রহায়ণের, ৩ ও ৪ সংখ্যক 'গজল' ১৩২৭ পৌষের এবং ৫ ও ৬ সংখ্যক 'গজল' ১৩২৭ মাঘের 'মোসলেম ভারতে', ৭ সংখ্যক 'গজল' ১৩৩০ শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে এবং ৮ সংখ্যক 'গজল' ১৩৩০ বৈশাখের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল।

মরু-ভাস্কর

'মরু-ভাস্কর' ১৩৫৭ সালে গ্রন্থবদ্ধ হয়। প্রকাশক : শাহজাহান, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, ভিক্টোরিয়া পার্ক (সাউথ), ঢাকা। প্রচ্ছদপট : শ্রীসুমুখনাথ মিত্র। মুদ্রাকর : শ্রীগৌরচন্দ্র পাল ; নিউ মহামায়া প্রেস ; ৬৫/৭ কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৯৯। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। প্রকাশক তাঁহার 'আরজ'-এ বলেন যে, তিনি 'গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি' পাইয়াছিলেন সুগায়ক আব্বাসউদ্দীন আহমদের 'সৌজন্যে'। এই অসম্পূর্ণ কাব্যখানিতে ১৮টি খণ্ড-কবিতা স্থানলাভ করে।

প্রথম কবিতা 'অবতরণিকা' ১৩৩৭ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের 'সওগাত' পত্রিকায় 'মরু-ভাস্কর' শিরোনামে বাহির হইয়াছিল। শিরোনামের পাশে তারকা-চিহ্ন দিয়া পাদটীকায় সম্পাদক বলেন :

> কবি হজরত মোহাম্মদের (দ.) জীবনী কাব্যে লিখিতেছেন, এই কবিতাটি তাহার পূর্বাংশ। স. স.

প্রথম সর্গের 'স্বপ্ন' শীর্ষক কবিতাটির শেষের ৩৬-পংক্তি ১৩৩৭ আষাঢ়ের 'জয়তী' পত্রিকায় 'অভিবন্দনা' শিরোনামে ছাপা হইয়াছিল। ১৩৪৩ অগ্রহায়ণের 'বুলবুল' পত্রিকায় উহা 'মার্হাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরবী' শিরোলেখায় 'জয়তী' হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

কাব্য আমপারা

১৩৪০ সালে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর?) 'কাব্য আমপারা' (কোরান শরীফের ৩০ অধ্যায়ের পদ্যানুবাদ) প্রকাশিত হয়। করিম বখ্শ্ ব্রাদার্স প্রেস, ৯ আন্তনি বাগান লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪ + ৮০ + ২৪ পৃষ্ঠা। দাম দুই টাকা।

বন-গীতি

১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে 'বন-গীতি' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : এম্পায়ার বুক হাউজ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। শ্রীরাম প্রেস, ১৬২ নং বহুবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। ৮ + ৯৬ পৃষ্ঠা। মূল্য : দেড় টাকা।

'কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে' ১৩৩৮ কার্তিক-পৌষের, 'দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার' ১৩৩৮ শ্রাবণ-আশ্বিনের এবং 'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' ১৩৩৭ ফাল্গুন-চৈত্রের 'জয়তী'তে প্রকাশিত হয়। 'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' শ্রীমন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' নাটকে গীত হইয়াছিল।

শ্রীমন্মথ রায় তাঁহার 'সাবিত্রী' নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন : 'সাবিত্রী'র পরম সম্পদ হইয়াছে তাহার গান। লিখিতে গর্বে এবং গৌরবে আমার বুক ভরিয়া ওঠে যে, সমস্ত গানগুলির কথা এবং সুরই গীত-সুন্দর সুর-জাদুকর বাংলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলামের সস্নেহের দান।' ... 'সাবিত্রী' নাটকে আছে ১৩টি গান ; যথা— (১) 'মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে', (২) 'প্রণমি তোমায় বন-দেবতা', (৩) 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ ঐ', (৪) 'শুক্লা জ্যোৎস্না-তিথি', (৫) 'এস এস তব যাত্রা-পথে', (৬) 'ফুলে ফুলে বন

ফুলেলা', (৭) 'নিশুতি রাতের শশী', (৮) 'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু', (৯) 'কেন করুণ সুরে হৃদয়-পুরে', (১০) 'বন-বিহারিণী চপল হরিণী', (১১) 'তোর বিদায়-বেলার বন্ধুরে', (১২) 'ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন' ও (১৩) 'জয় মর্ত্যের অমৃতবাদিনী'। 'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' গানটির আস্থায়ীভাগ এবং অবশিষ্ট ১২টি গান পূর্ববর্তী 'চন্দ্রবিন্দু' গীতি-গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। 'চন্দ্রবিন্দু'তে 'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' গানটির আস্থায়ীর পরবর্তী কলিসমূহ এবং রাগ-তাল ভিন্নপ্রকার। উপরোক্ত 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ ঐ' এবং 'প্রণমি তোমায় বন-দেবতা' পুনরায় 'বন-গীতি'তে পরিবেশিত হইয়াছে।

'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ১৩৩৮ পৌষের 'স্বদেশ'-এ প্রকাশিত হয়।

'পান্‌সে জ্যোছ্‌নাতে কে চল গো' ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' শ্রীজগৎ ঘটক-কৃত স্বরলিপি-সহ বাহির হয়।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর, ১৯৩১-এ। এই গীতি-গ্রন্থটি ১৯৩১ সালের ১৪ই অক্টোবর সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার করা হয় ৩০শে অক্টোবর ১৯৪৫ সালে। নজরুলের 'বন-গীতি' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৩৯, অক্টোবর ১৯৩২ সালে। 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের অন্তর্গত 'চল মন আনন্দধাম', 'আমার সকলি হচ্ছে, হরি', 'কেঁদে যায় দখিন হাওয়া', 'ওহে রাখালরাজ', 'আমি ভাই খ্যাপা বাউল'—এই পাঁচটি গান 'বন-গীতি'র প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়। 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থে উক্ত পাঁচটি গান অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'বন-গীতি' গ্রন্থে বর্জিত হয়েছে।

গুল-বাগিচা

১৩৪০ সালে (১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে জুন) 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : দি গ্রেট ইস্টার্ণ লাইব্রেরি, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৩৩/এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা, বাণী প্রেস হইতে শ্রীললিতমোহন মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত। ১২ + ১০৮ পৃষ্ঠা। মূল্য : এক টাকা।

'সোনার মেয়ে সোনার মেয়ে' ১৩৩৯ অগ্রহায়ণের, 'বুকে তোমায় নাই বা পেলাম' ১৩৩৯ কার্তিকের, 'আমার বিজন ঘরে হেসে' 'অভিমানী' শিরোনামে ১৩৩৯ পৌষের এবং 'একলা ভাসাই গানের কমল' ১৩৪০ আষাঢ়ের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়।

'বাদল বায়ে মোর নিভিয়া গেছে বাতি' ১৩৩৯ আশ্বিনের এবং 'দুধে আল্‌তায় রঙ যেন তার' ১৩৩৯ কার্তিকের 'সওগাতে' বাহির হয়।

'অচেনা সুরে অজানা পথিক' গানটির কবির স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি ১৩৬৪ মাঘের 'মাহে-নও'-এ মুদ্রিত হয়।

'তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা', 'তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ' এবং 'পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে' ১৩৪০ বৈশাখ-শ্রাবণের চতুর্মাস্য 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'কাঁদিছে তিমির-কুন্তলা সাঁঝ' ১৩৪১ শ্রাবণের 'সবুজ বাঙলা'য় বাহির হয়।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর রবিবার সকালে নজরুল ইসলাম 'এস এস রসলোকবিহারী' গাহিয়া কলিকাতা এলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং ২৬শে ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় 'তোমাদের দান তোমাদের বাণী পূর্ণ করিল অন্তর' গাহিয়া সম্মেলনের 'মধুরেণ সমাপয়েত' করেন। উক্ত গীতিদ্বয় যথাক্রমে 'উদ্বোধন-গীতি' ও 'বিদায়-গীতি' শিরোনামে ১৩৩৯ মাঘের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে পত্রস্থ হয়। 'উদ্বোধন-গীতি' ১৩৩৯ পৌষের এবং 'বিদায়-গীতি' ১৩৩৯ মাঘের 'মোয়াজ্জিন'এও মুদ্রিত হয়।

'শিউলিফুলের মালা দোলে' ১৩৪১ আশ্বিনের 'ছায়াবীথি'-তে বাহির হয়।

'এল শোকের সেই মোহররম' ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠের ও 'ঈদুজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ ১৩৪০ বৈশাখের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়। এই দুইটি গজল মরহুম মোহাম্মদ কাসেম মল্লিক হিজ মাস্টারস ভয়েসে রেকর্ড করেন।

'তওফিক দাও খোদা ইসলামে' ১৩৩৯ ফাল্গুনের ও 'বাজিছে দামামা বাঁধ রে আমামা' ১৩৩৯ চৈত্রের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে বাহির হয়। 'বহিছে সাহারায় শোকের 'লু'-হাওয়া' এবং 'তওফিক দাও খোদা ইসলামে' মরহুম আব্বাসউদ্দীন আহমদ রেকর্ড করেন।

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন

নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'গুল-বাগিচা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪০ বঙ্গাব্দে, ইংরেজি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। দি গ্রেট ইস্টার্ন লাইব্রেরী, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে, 'গুলবাগিচা'র অন্তর্গত গানগুলির ধারাক্রমের সঙ্গে গ্রন্থের সূচিপত্রের মিল নেই। সূচিপত্রে গানগুলির প্রথম পংক্তি মুদ্রিত হয়েছে বাংলা বর্ণমালার ক্রম-অনুসারে। তবে, 'নজরুল-রচনাবলী'র অন্তর্গত 'গুলবাগিচা'র গানগুলির ধারাক্রম আর ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ 'গুল-বাগিচা'র অন্তর্গত গানগুলির ধারাক্রম এক ও অভিন্ন। আমরা এখানে 'গুল-বাগিচা'-র প্রথম সংস্করণের সূচিপত্র সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম। —

দোপাটি লো, লো করবী, নাই সুরভি, রূপ আছে
নয়নের মনি আমার পিয়ারা মোহাম্মদ
নাচে সুনীল দরিয়া আজি দিল্-দরিয়া
নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথী
পথ চলিতে যদি চকিতে কভু দেখা হয় পরানপ্রিয়
পরো পরো চৈতালি-সাঁঝে কুসমী শাড়ি
পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে
পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে
ফিরি পথে পথে মজনু দিওয়ানা হয়ে
বকুল চাঁপার বনে কে মোর
বনে চলে বনমালি বনমালা দুলায়ে
বরষ মাস যায়—সে নাহি আসে,
বহিছে সাহারায়, শোকের 'লু' হাওয়া,
বাজিছে দামামা, বাঁধ রে আমামা
বাদল বায়ে মোর নিভিয়া গেছে বাতি
বাসন্তি রঙ শাড়ি প'রো খয়ের রঙের টিপ
বৃথা তুই কাহার পরে করিস অভিমান
বুকে তোমায় নাই বা পেলাম
ভুল করে কোন্ ফুল-বিতানে
ভুবন-জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান
ভেঙো না ভেঙো না বঁধু তরুণ চামেলি-শাখা
মদির আবেশে কে চলে ঢুলু-ঢুলু-আঁখি
মনে যে মোর মনের ঠাকুর
মরহাবা সৈয়দে মক্কী মদনী আল্-আরবি
মহুয়া ফুলের মদির বাসে
মাধবী-লতার আজি মিলন সখি
মেঘের হিন্দোলা দেয় পুব-হাওয়াতে দোলা
মোর পুষ্প-পাগল মাধবী কুঞ্জে
মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লে আলা
যেন ফিরে না যায় এসে আজ
যৌবন-সিন্ধু টলমল টলমল
রিমিঝিম্ রিমিঝিম্ ঐ নামিল দেয়া
শিউলি-তলায় ভোরবেলায়
শিউলিফুলের মালা দোলে
শেষ হলো মোর এ জীবনে ফুল ফোটাবার পালা
সাধ জাগে মনে পর-জীবনে
সাহারাতে ডেকেছে আজ বান, দেখে যা
সোনার মেয়ে ! সোনার মেয়ে !
স্বদেশ আমার ! জানি না তোমার
স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী
হে চির-সুন্দর, বিশ্ব চরাচর
হেরি আজ শূন্য নিখিল প্রিয় তোমারি বিহনে।

গীতি-শতদল

১৩৪১ সালের বৈশাখ মাসে 'গীতি-শতদল' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি ; ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। মুদ্রাকর : শ্রী অমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য প্রেস ; ২ বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা। ৮ + ১০৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।. টাকা।

'ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা' ১৩৪০ ভাদ্র-অগ্রহায়ণের 'বুলবুল'-এ বাহির হয়।

'গত রজনীর কথা মনে পড়ে' ১৩৪১ পৌষের 'ছায়াবীথি'তে ছাপা হয়। তাহাতে গানটির অন্তরা এরূপ—

বাহুর বল্লরী জড়ায়ে তার গলে
বসেছি তরুতলে আধেক আঁচলে
দুলায়ে হৃদয় ব্যাকুল ছন্দে॥

'এস এস শারদ-প্রাতের পথিক' ১৩৪০ শ্রাবণের 'গুলিস্তাঁ'য় বাহির হয়।

'নাচিছে নটনাথ' ১৩৩৮ শ্রাবণ-আশ্বিনের 'জয়তী'তে 'ভজন' শিরোনামে মুদ্রিত হয় ; তাহাতে বন্ধনীর মধ্যে সুর-তাল লেখা আছে : 'রাগমালা—কাওয়ালি'।

'আজি নন্দ-দুলালের সাথে' ১৩৪০ ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' বাহির হয়।

'জাগো জাগো জাগো নব-আলোকে' ১৩৩৯ ভাদ্রে (১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতির সাহায্য-কল্পে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্বোধন-সংগীতরূপে নজরুল ইসলামের পরিচালনায় সমবেত কণ্ঠে গীত হইয়াছিল।

পুতুলের বিয়ে

'পুতুলের বিয়ে' ১৩৪০ সালের শেষ দিকে গ্রন্থাকারে বাজারে বাহির হয়। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি ; ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। প্রিন্টার : শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য প্রেস, ২ বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা। ৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

'নবার নামতা পাঠ' কবিতাটি ১৩৪০ অগ্রহায়ণে 'মোয়াজ্জিন' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

'সাত ভাই চম্পা' শীর্ষক কবিতা-চতুষ্টয় ১৩৪০ সালের ভাদ্র-অগ্রহায়ণের চতুর্মাস্য 'বুলবুল' পত্রিকায় বাহির হয়।

'শিশু জাদুকর' কবিতাটি ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন-চৈত্রের 'জয়তী' পত্রিকায় ছাপা হয়।

এই কাব্যের 'শিশু জাদুকর' কবিতা সম্পর্কে শামসুননাহার মাহমুদ যে-তথ্য দিয়েছেন, তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> আসন্ন বিদায়ের কথা স্মরণ করে কবি লিখলেন—'বিদায় হে মোর বাতায়ন পাশে নিশীথ জাগার, সাথী ...'

'সুপারি গাছগুলি সুন্দর, না এই শিশুটি'—আম্মার একথা শুনে কি বুঝে জানি না কবি অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন—'আম্মার মনের কথা বুঝতে আর আমার বাকি নেই।' পরদিন সকালে কবিতার খাতা খুলতেই চোখে পড়ল নতুন কবিতা 'শিশু জাদুকর'।

[নজরুলকে যেমন দেখেছি। কলিকাতা, ১৩৬৫। পৃষ্ঠা ৫৮]

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সংযোজন
হারা ছেলের চিঠি

[প্রকাশ : 'অলকা'। প্রথম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, পৌষ ১৩২৯। পৃ. ৬০৮–৬১৪]

এ প্রসঙ্গে জনাব আসাদুল হক লিখেছেন :

কিছুদিন আগে কলকাতায় দেখা হয় প্রখ্যাত গবেষক স্নেহভাজন বসুমিত্র মজুমদারের সঙ্গে। কথায় কথায় আমাকে জানান লাইব্রেরির পুরোনো পত্রিকা ঘাটতে গিয়ে ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 'অলকা' পত্রিকার পৌষ ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (পৃষ্ঠা ৬০৮ থেকে ৬১৪ পর্যন্ত) কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ও স্বাক্ষরিত গল্প, 'হারা ছেলের চিঠি' খুঁজে পান। এই গল্পটি নজরুলের কোনো গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়নি। তাই তিনি এই গল্পটি কলকাতার ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র 'চতুষ্কোণ' কার্তিক–পৌষ ১৪০৬ শতবর্ষে নজরুল ও জীবনানন্দ (শ্রদ্ধাঞ্জলি) পৃষ্ঠা ১ থেকে ৭ প্রকাশ করছেন। এগল্পটি যাতে হারিয়ে না যায় এ কারণে লুপ্ত উদ্ধারের আশায় বর্তমান প্রজন্মের বাংলাদেশের পাঠকদের সামনে গল্পটিকে তুলে ধরার আশায় আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।

নজরুল–রচিত 'হারা ছেলের চিঠি' গল্পটি হুবহু প্রকাশ করা হলো।

এ গল্পটিতে নজরুলের প্রথম কুমিল্লা ও দৌলতপুর যাওয়া এবং দৌলতপুরের বেদনা বিধূর অধ্যায়ের পর কুমিল্লায় ফিরে আসার স্মৃতি ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে প্রমীলা নজরুলের আদি নিবাস মানিকগঞ্জের উল্লেখ লক্ষণীয়।

বনের পাপিয়া

আবদুল আজীরা আল্–আমান সম্পাদিত কলকাতার মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কাফেলা'র নজরুল সংখ্যা, জৈষ্ঠ ১৩৮৮/মে–জুন ১৯৮১ সংখ্যায় নজরুলের অপ্রকাশিত গল্প উল্লেখে 'বনের পাপিয়া' প্রথম প্রকাশিত হয়।

জীবনপঞ্জি

১৮৯৯ ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে ১৮৯৯ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ। পিতা কাজী ফকির আহমদ। মাতামহ তোফায়েল আলী। মাতা জাহেদা খাতুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন। ভগ্নী উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক-নাম ছিল দুখু মিয়া।

১৯০৮ পিতা কাজী ফকির আহমদের মৃত্যু।

১৯০৯ গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, লেটো দলের সদস্য ও পালাগান ইত্যাদি রচনা।

১৯১১ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১২ স্কুল ত্যাগ, বাসুদেবের কবিদলের সঙ্গে সম্পর্ক, রেলওয়ে গার্ড সাহেবের খানসামা, আসানসোলে এম বখ্শের চা রুটির দোকানে চাকুরি, আসানসোলে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহ ও তাঁর পত্নী শামসুন্নেসা খানমের স্নেহ লাভ।

১৯১৪ কাজী রফিজউল্লাহ্‌র সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীর-সিমলা, দরিরামপুর গমন এবং দরিরামপুর স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র।

১৯১৫-১৭ রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন, শৈলজানন্দের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রিটেস্ট পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীর ৪৯নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান।

১৯১৭-১৯ সৈনিক জীবন, প্রধানত, করাচিতে গন্‌জা বা আবিসিনিয়া লাইনে অতিবাহিত, ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নতি, সাহিত্য-চর্চা। কলকাতার মাসিক সওগাতে 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' গল্প এবং ত্রৈমাসিক বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায় 'মুক্তি' কবিতা প্রকাশ।

১৯২০ মার্চ মাসে সেনাবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তন, বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতির ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটস্থ দফ্‌তরে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে অবস্থান, কলকাতায় সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জীবন শুরু, 'মোসলেম

ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিবিধ রচনা প্রকাশ।

সাংবাদিক জীবন, মে মাসে এ. কে. ফজলুল হকের সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক পদে যোগদান, নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের ৮-এ টার্নার স্ট্রিটে অবস্থান, সেপ্টেম্বর মাসে 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদের বরিশাল ভ্রমণ, 'নবযুগ'-এর চাকুরি পরিত্যাগ, বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘর গমন।

১৯২১ দেওঘর থেকে প্রত্যাবর্তন, 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদক আফজাল-উল-হকের সঙ্গে ৩২নম্বর কলেজ স্ট্রিটে অবস্থান, পুনরায় 'নবযুগে' যোগদান।

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা যাত্রা, কান্দির পাড়ে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও বিরজাসুন্দরী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ, আলী আকবর খানের সঙ্গে দৌলতপুর গমন ও দুই মাস দৌলতপুর অবস্থান, আলী আকবর খানের ভাগিনেয়ী সৈয়দা খাতুন ওরফে নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে বিবাহ। কুমিল্লা থেকে ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারের সকলের বিবাহে যোগদান, বিবাহের রাত্রেই নজরুলের দৌলতপুর ত্যাগ ও পরদিন কুমিল্লা প্রত্যাবর্তন এবং অবস্থান। কলকাতায় বিবাহ-সংক্রান্ত গোলযোগের বার্তা প্রেরণ।

জুলাই মাসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন, ৩/৪সি তালতলা লেনের বাড়িতে অবস্থান, অক্টোবর মাসে অধ্যাপক (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সঙ্গে শান্তিনিকেতন ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নভেম্বর মাসে পুনরায় কুমিল্লা গমন, অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। ডিসেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় তালতলা লেনের বাড়িতে বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা। 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক 'বিজলী' ও মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ছাপা হলে প্রবল আলোড়ন।

১৯২২ চার মাস কুমিল্লা অবস্থান, আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলার সঙ্গে সম্পর্ক। মার্চ মাসে প্রথম গ্রন্থ 'ব্যথার দান' প্রকাশ। ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু, রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোক সভায় যোগদান, সত্যেন দত্ত সম্পর্কে রচিত শোক-কবিতা পাঠ। দৈনিক 'সেবকে' যোগদান ও চাকরি পরিত্যাগ। ১২ই আগস্ট অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশ, ধূমকেতুর জন্য রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশ, অক্টোবর

মাসে 'অগ্নি-বীণা' কাব্য ও 'যুগবাণী' প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ, 'যুগবাণী' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত, ধূমকেতুতে প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' বাজেয়াপ্ত, নভেম্বর মাসে নজরুলকে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার ও কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে আটক। 'ধূমকেতু' পত্রিকাতেই নজরুল প্রথম ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ১৩ই অক্টোবর ১৯২২ সংখ্যায়।

১৯২৩ জানুয়ারি মাসে বিচারকালে নজরুলের বিখ্যাত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' আদালতে উপস্থাপন, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, আলিপুর জেলে স্থানান্তর, নজরুলকে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' গীতিনাটক উৎসর্গ, হুগলি জেলে স্থানান্তর, মে মাসে নজরুলের অনশন ধর্মঘট, শিলং থেকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, 'Give up hunger strike, our literature claims you', বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে অনশন ভঙ্গ, জুলাই মাসে বহরমপুর জেলে স্থানান্তর, ডিসেম্বরে মুক্তিলাভ।

১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান। মিসেস এম রহমানের উদ্যোগে এপ্রিলে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হুগলিতে নজরুলের সংসার স্থাপন, অগাস্টে 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' প্রকাশ ও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত; শনিবারের চিঠিতে নজরুল-বিরোধী প্রচারণা। হুগলিতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম ও অকালমৃত্যু।

১৯২৫ মে মাসে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে যোগদান। এই অধিবেশনের গুরুত্ব, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের যোগদান। জুলাই মাসে বাঁকুড়া সফর, 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক, ডিসেম্বর মাসে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দিন হোসায়ন কর্তৃক ভারতীয় কংগ্রেসের অন্তর্গত, মজুর স্বরাজ পার্টি গঠন। ডিসেম্বরে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলের মুখপত্র 'লাঙল' প্রকাশ, প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম। 'লাঙল'-এর জন্যেও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী। 'লাঙল' বাংলা ভাষায় প্রথম শ্রেণীসচেতন পত্রিকা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ১৬ই জুন। কবিতাসংকলন 'চিত্তনামা' প্রকাশ।

১৯২৬ জানুয়ারি থেকে কৃষ্ণনগরে বসবাস। মার্চ মাসে মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগদান। এপ্রিল মাসে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। এপ্রিলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথকে 'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল', 'ধ্বংসপথের যাত্রীদল' এবং 'শিকল-পরা ছল' গান শোনান। মে মাসে কৃষ্ণনগরে কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'কাণ্ডারী

হুঁশিয়ার', কিষাণ সভায় 'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান' এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে 'ছাত্রদলের গান' পরিবেশন। জুলাই মাসে চট্টগ্রাম, অক্টোবর মাসে সিলেট এবং যশোর ও খুলনা সফর। সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম। আর্থিক অনটন। 'দারিদ্র্য' কবিতা রচনা। নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরাজয় বরণ। ডিসেম্বর থেকে গজল রচনার সূত্রপাত, 'বাগিচায় বুলবুলি', 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ', 'মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে' প্রভৃতি গান ও 'খালেদ' কবিতা রচনা। নজরুলের ক্রমাগত অসুস্থতা।

১৯২৭ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সফর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান ও 'খোশ আমদেদ' গানটি পরিবেশন, 'খালেদ' কবিতা আবৃত্তি।

বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত। কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'গণবাণী' (সম্পাদক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)-র জন্যে এপ্রিল মাসে 'ইন্টারন্যাশনাল', 'রেড ফ্ল্যাগ' ও শেলির ভাব অবলম্বনে যথাক্রমে 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'রক্ত-পতাকার গান' ও 'জাগর তূর্য' রচনা। জুলাই মাসে 'গণবাণী' অফিসে পুলিশের হানা। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, নজরুল, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিক এবং 'প্রবাসী', 'শনিবারের চিঠি', 'কল্লোল', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বিতর্ক। ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধ এবং নজরুলের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধ, 'রক্ত' অর্থে 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক। বিতর্কের অবসানে প্রমথ চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধ।

'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ' প্রভৃতি রক্ষণশীল মুসলমান পত্রিকায় নজরুল-সমালোচনা। ইব্‌রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবুল হুসেনের নজরুল-সমর্থন।

১৯২৮ ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান, এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতের জন্যে 'নতুনের গান' রচনা। ঢাকায় অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, মিস্ ফজিলতুন্নেসা, প্রতিভা সোম, উমা মৈত্র প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। মে মাসে নজরুলের মাতা জাহেদা খাতুনের এন্তেকাল।

সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে শরৎ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দিলীপকুমার রায়, সাহানা দেবী ও নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনা।

অক্টোবর 'সঞ্চিতা' প্রকাশ। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতা। 'সওগাত' পত্রিকার নজরুল সমর্থন। ডিসেম্বর মাসে নজরুলের রংপুর ও রাজশাহি সফর।

কলকাতায় নিখিল ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের সম্মেলনে যোগদান। নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় নিখিল ভারত সোশিয়ালিস্ট যুবক কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান, কবি গোলাম মোস্তফার নজরুল-বিরোধিতা।

ডিসেম্বরের শেষে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলের কলকাতা প্রত্যাবর্তন, 'সওগাতে' যোগদান। প্রথমে ১১নং ওয়েলেসলি স্ট্রিটে 'সওগাত' অফিস সংলগ্ন ভাড়া বাড়িতে ও পরে ৮/১ পান বাগান লেনে ভাড়া বাড়িতে বসবাস। নজরুলের সঙ্গে গ্রামোফোন কোম্পানির যোগাযোগ।

১৯২৯ ১৫ই ডিসেম্বর এলবার্ট হলে নজরুলকে জাতীয় সংবর্ধনা প্রদান, উদ্যোক্তা 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হবীবুল্লাহ্ বাহার প্রমুখ। সংবর্ধনা সভায় সভায় সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩০ 'প্রলয়-শিখা' প্রকাশ ও কবির বিরুদ্ধে মামলা ও ছয় মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধি-আরউইন চুক্তির ফলে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার ফলে কারাবাস থেকে রেহাই। কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু।

১৯৩১ সিনেমা ও মঞ্চ-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ।

'আলেয়া' গীতিনাট্য রঙ্গমঞ্চে মঞ্চস্থ। নজরুলের অভিনয়ে অংশ-গ্রহণ।

১৯৩২ নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে 'বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

ডিসেম্বরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' পঞ্চম অধিবেশনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন।

১৯৩৩ গ্রীষ্মে 'বর্ষবাণী' সম্পাদিকা জাহান আরা চৌধুরীর সঙ্গে দার্জিলিং ভ্রমণ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। 'ধ্রুব' চিত্রে নারদের ভূমিকায় অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা।

১৯৩৪ গ্রামোফোন রেকর্ডের দোকান 'কলগীতি' প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ ফরিদপুর 'মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কনফারেন্সে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৮ এপ্রিলে, কলকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে' কাব্য শাখার সভাপতিত্ব।
ছায়াচিত্র 'বিদ্যাপতি'র কাহিনী রচনা।

১৯৩৯ ছায়াচিত্র 'সাপুড়ে'র কাহিনী রচনা।

১৯৪০ কলকাতা বেতারে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' প্রভৃতি নিয়মিত সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার। লুপ্ত রাগ–রাগিণীর উদ্ধার ও নবসৃষ্ট রাগিণীর প্রচার অনুষ্ঠান দুটির বৈশিষ্ট্য।

অক্টোবর মাসে, নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'নবযুগে'র প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত। ডিসেম্বরে কলকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে ভাষণ।

প্রমীলা নজরুল পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত।

১৯৪১ মার্চে, বনগাঁ সাহিত্য–সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৫ই ও ৬ই এপ্রিল নজরুলের সভাপতিত্বে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রজত জুবিলি উৎসবে সভাপতিরূপে জীবনের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান, 'যদি আর বাঁশি না বাজে'।

১৯৪২ ১০ই জুলাই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। ১৯শে জুলাই, কবি জুলফিকার হায়দারের চেষ্টায়, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় নজরুলের বায়ু পরিবর্তনের জন্য ডাঃ সরকারের সঙ্গে মধুপুর গমন। মধুপুরে অবস্থার অবনতি। ২১শে সেপ্টেম্বর মধুপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'লুম্বিনি পার্কে' চিকিৎসার জন্য ভর্তি। অবস্থার উন্নতি না ঘটায় তিন মাস পর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় নজরুল সাহায্য কমিটি গঠন।

সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ—	ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
যুগ্ম সম্পাদক—	সজনীকান্ত দাস
	জুলফিকার হায়দার
কার্যনির্বাহী কমিটির সভ্য—	এ. এফ. রহমান
	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ
	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
	তুষারকান্তি ঘোষ
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য

সৈয়দ বদরুদ্দোজা-
গোপাল হালদার।

এই সাহায্য কমিটি কর্তৃক পাঁচ মাস কবিকে মাসিক দুইশত টাকা করে সাহায্য প্রদান।

১৯৪৪ বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার 'নজরুল-সংখ্যা' (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১) প্রকাশ।

১৯৪৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান।

১৯৪৬ নজরুল পরিবারের অভিভাবিকা নজরুলের শাশুড়ি গিরিবালা দেবী নিরুদ্দেশ। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম মূল্যায়নে প্রথম গ্রন্থ কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'নজরুল-প্রতিভা' প্রকাশ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবি আবদুল কাদির প্রণীত নজরুল-জীবনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সংযোজিত।

১৯৫২ 'নজরুল নিরাময় সমিতি' গঠন। সম্পাদক কাজী আবদুল ওদুদ। জুলাই মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে রাঁচি মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ। চার মাস চিকিৎসা, সুফলের অভাবে কলকাতা আনয়ন।

১৯৫৩ মে মাসে কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন প্রেরণ। মানসিক চিকিৎসক উইলিয়ম স্যারগন্ট, ই. এ. বেটন, ম্যাকসিক ও রাসেল ব্রেনের মধ্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যাপারে মতভেদ, ডিসেম্বর মাসে নজরুলকে ভিয়েনাতে প্রেরণ। ভিয়েনায় বিখ্যাত স্নায়ুচিকিৎসক ডা. হ্যান্স হফ কর্তৃক সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম পরীক্ষার ফল, নজরুল 'পিকস ডিজিজ' নামে মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত এবং তা চিকিৎসার বাইরে। ডিসেম্বর মাসে নজরুল ও তাঁর পত্নীকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৬০ ভারত সরকার কর্তৃক নজরুলকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দান।

১৯৬২ ৩০শে জুন নজরুল-পত্নী প্রমীলা নজরুলের দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন। প্রমীলা নজরুলকে চুরুলিয়ায় দাফন। নজরুলের দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৭৪ এবং ১৯৩১ ও ১৯৭৯ সালে।

১৯৬৬ কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকার 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কর্তৃক 'নজরুল-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত।

১৯৬৯ সম্বিতহারা কবির সত্তর বৎসর পূর্ণ এবং সর্বত্র কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্তত্রিতম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন। কলকাতার রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭১ ২৫শে মে নজরুল জন্মবার্ষিকীর দিন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নব পর্যায়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

১৯৭২ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নজরুল-জন্মবার্ষিকীর প্রাক্কালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নজরুলকে সপরিবার ঢাকায় আনয়ন, ধানমণ্ডিতে কবিভবনে অবস্থান এবং সেখানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উড্ডীন। স্বাধীন বাংলাদেশে কবির প্রথম জন্মবার্ষিকী কবিকে নিয়ে উদ্‌যাপন। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক কবিভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান।

১৯৭৫ ২২শে জুলাই কবিকে পি. জি. হাসপাতালে স্থানান্তর, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট মোট এক বছর এক মাস আট দিন পিজি হাসপাতালের ১৯৭নং কেবিনে নিঃসঙ্গ জীবন।

১৯৭৬ ২১শে ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' প্রচলন ও নজরুলকে পদক প্রদান।

ঐ বছরেই আগস্ট মাসে কবির স্বাস্থ্যের অবনতি। ২৭শে আগস্ট শুক্রবার বিকেল থেকে কবির শরীরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তিনি ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ২৯শে আগস্ট রবিবার সকালে কবির দেহের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫ ডিগ্রি অতিক্রম করে যায়। কবিকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং সাক্‌শান-এর সাহায্যে কবির ফুসফুস থেকে কফ ও কাশি বের করার চেষ্টা চলে। কিন্তু চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কবির অবস্থার উন্নতি হয় না— সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ সাল মোতাবেক ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বেতার এবং টেলিভিশনে কবির মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হলে পিজি হাসপাতালে শোকাহত মানুষের ঢল। কবির মরদেহ প্রথমে পিজি হাসপাতালের গাড়ি বারান্দার ওপরে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি-র সামনে রাখা হয়। অবিরাম জনস্রোত এবং কবির মরদেহে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

কবির নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় বাদ আসর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ জানাজায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শামিল হন। নামাজে জানাজা শেষে শোভাযাত্রা সহযোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা শোভিত কবির মরদেহ বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হয়।

কবির মরদেহ বহন করেন তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ. জি. মাহমুদ, বি.ডি.আর. প্রধান মেজর জেনারেল দস্তগীর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়। পরবর্তী কালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা প্রদান করা হয় ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৯৮–২০০০ সালে বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে নজরুল-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

গ্রন্থপঞ্জি

ব্যথার দান — গল্প। ফাল্গুন ১৩২৮, ১লা মার্চ ১৯২২। উৎসর্গ—'মানসী আমার! মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করোনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম'।

অগ্নি-বীণা — কবিতা। কার্তিক ১৩২৯, ২৫শে অক্টোবর ১৯২২। উৎসর্গ—'ভাঙা-বাংলার রাঙা-যুগের আদি পুরোহিত, সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।

যুগ-বাণী — প্রবন্ধ। কার্তিক ১৩২৯, ২৬শে অক্টোবর ১৯২২। বাজেয়াপ্ত ২৩শে নভেম্বর ১৯২২, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।

রাজবন্দীর জবানবন্দী — ভাষণ। ১৩২৯ সাল, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ। পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

দোলন-চাঁপা — কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩০, অক্টোবর ১৯২৩।

বিষের বাঁশী — কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, ১০ই আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'বাংলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম-মহিলা-কুল-গৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা মিসেস এম. রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে।' বাজেয়াপ্ত ২২শে অক্টোবর ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৫।

ভাঙার গান — কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩১, আগস্ট ১৯২৪। উৎসর্গ—'মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে'। বাজেয়াপ্ত ১১ই নভেম্বর ১৯২৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯।

রিক্তের বেদন — গল্প। পৌষ ১৩৩১, ১২ই জানুয়ারি ১৯২৫।

চিত্তনামা — কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩২, আগস্ট ১৯২৫, উৎসর্গ—'মাতা বাসন্তী দেবীর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে'।

ছায়ানট — কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩২, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৫। উৎসর্গ—'আমার শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্‌মদ করকমলে'।

সাম্যবাদী — কবিতা। পৌষ ১৩৩২, ২০শে ডিসেম্বর ১৯২৫।

পূবের হাওয়া — কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৩২, ৩০শে জানুয়ারি ১৯২৬।

ঝিঙে ফুল	ছোটদের কবিতা। চৈত্র ১৩৩২, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৬।
দুর্দিনের যাত্রী	প্রবন্ধ। আশ্বিন ১৩৩৩, অক্টোবর ১৯২৬।
সর্বহারা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৩, ২৫শে অক্টোবর ১৯২৬। উৎসর্গ—'মা (বিরজাসুন্দরী দেবী)-র শ্রীচরণারবিন্দে'।
রুদ্রমঙ্গল	প্রবন্ধ। ১৯২৭।
ফণি-মনসা	কবিতা ও গান। শ্রাবণ ১৩৩৪, ২৯শে জুলাই ১৯২৭।
বাঁধনহারা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৪, আগস্ট ১৯২৭। উৎসর্গ—'সুর-সুন্দর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার করকমলেষু'।
সিন্ধু-হিন্দোল	কবিতা। উৎসর্গ—বাহার ও নাহারকে, ১৩৩৪/১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ২রা অক্টোবর ১৯২৮।
সঞ্চিতা	কবিতা ও গান। আশ্বিন ১৩৩৫, ১৪ই অক্টোবর ১৯২৮। উৎসর্গ— 'বিশ্বকবিসম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।
বুলবুল	গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর, ১৯২৮। উৎসর্গ—'সুর-শিল্পী, বন্ধু দিলীপকুমার রায় করকমলেষু'।
জিঞ্জীর	কবিতা ও গান। কার্তিক ১৩৩৫, ১৫ই নভেম্বর ১৯২৮।
চক্রবাক	কবিতা। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'বিরাট-প্রাণ, কবি, দরদী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র শ্রীচরণারবিন্দেষু'।
সন্ধ্যা	কবিতা ও গান। ভাদ্র ১৩৩৬, ১২ই আগস্ট ১৯২৯। উৎসর্গ—'মাদারিপুর 'শান্তি-সেনা'-র কর-শতদলে ও বীর সেনানায়কের শ্রীচরণাম্বুজে'।
চোখের চাতক	গান। পৌষ ১৩৩৬, ২১শে ডিসেম্বর ১৯২৯। উৎসর্গ—'কল্যাণীয়া বীণা-কণ্ঠী শ্রীমতী প্রতিভা সোম জয়যুক্তাসু'।
মৃত্যু-ক্ষুধা	উপন্যাস। মাঘ ১৩৩৬, জানুয়ারি ১৯৩০।
রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	অনুবাদ কবিতা। আষাঢ় ১৩৩৭, ১৪ই জুলাই ১৯৩০। উৎসর্গ—'বাবা বুলবুল ! ...'
নজরুল-গীতিকা	গান। ভাদ্র ১৩৩৭, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩০। উৎসর্গ—'আমার গানের বুলবুলিরা ! ....'
ঝিলিমিলি	নাটিকা। অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩০।
প্রলয়-শিখা	কবিতা ও গান। ১৩৩৭, আগস্ট ১৯৩০। গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ই ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০

	কবির জামিন লাভ, এপ্রিল। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি–আরউইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০শে মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্তু 'প্রলয়–শিখা'র নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।
কুহেলিকা	উপন্যাস। শ্রাবণ ১৩৩৮, ২১শে জুলাই ১৯৩১।
নজরুল–স্বরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫শে আগস্ট ১৯৩১।
চন্দ্রবিন্দু	গান। ১৩৩৮, সেপ্টেম্বর ১৯৩১। উৎসর্গ—'পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু'। বাজেয়াপ্ত ১৪ই অক্টোবর ১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩০শে নভেম্বর ১৯৪৫।
শিউলিমালা	গল্প। কার্তিক ১৩৩৮, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩১।
আলেয়া	গীতিনাট্য। ১৩৩৮, ১৯৩১। উৎসর্গ—'নটরাজের চির নৃত্যসাথী সকল নট–নটীর নামে 'আলেয়া' উৎসর্গ করিলাম'।
সুরসাকী	গান। আষাঢ় ১৩৩৯, ৭ই জুলাই ১৯৩২।
বন–গীতি	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩২। উৎসর্গ—'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলাবিদ আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দিন খান সাহেবের দস্ত মোবারকে'।
জুলফিকার	গান। আশ্বিন ১৩৩৯, ১৩ই অক্টোবর।
পুতুলের বিয়ে	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা। সম্ভবত চৈত্র ১৩৪০, এপ্রিল ১৯৩৩।
গুল–বাগিচা	গান। আষাঢ় ১৩৪০, ২৭শে জুন ১৯৩৩। উৎসর্গ—'স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানির স্বত্বাধিকারী আমার অন্তরতম বন্ধু শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ অভিন্নহৃদয়েষু—'
কাব্য–আমপারা	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩। উৎসর্গ—'বাংলার নায়েবে–নবী মৌলবি সাহেবানদের দস্ত মোবারকে'।
গীতি–শতদল	গান। বৈশাখ ১৩৪১, এপ্রিল ১৯৩৪।
সুরলিপি	স্বরলিপি। ভাদ্র ১৩৪১, ১৬ই আগস্ট ১৯৩৪।
সুরমুকুর	স্বরলিপি। আশ্বিন ১৩৪১, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৪।
গানের মালা	গান। কার্তিক ১৩৪১, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৪। উৎসর্গ—'পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অনিলকুমার দাস কল্যাণীয়েষু—'।

মক্তব সাহিত্য	পাঠ্যপুস্তক। শ্রাবণ ১৩৪২, ৩১শে জুলাই ১৯৩৫।
নির্ঝর	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৪৫, ২৩শে জানুয়ারি ১৯৩৯।
নতুন চাঁদ	কবিতা। চৈত্র ১৩৫১, মার্চ ১৯৪৫।
মরু-ভাস্কর	কাব্য। ১৩৫৭, ১৯৫১।
বুলবুল (দ্বিতীয় খণ্ড)	গান। ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
সঞ্চয়ন	কবিতা ও গান। ১৩৬২, ১৯৫৫।
শেষ সওগাত	কবিতা ও গান। বৈশাখ ১৩৬৫, ১৯৫৯।
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম	অনুবাদ। অগ্রহায়ণ ১৩৬৫, ডিসেম্বর ১৯৫৯।
মধুমালা	গীতিনাট্য। মাঘ ১৩৬৫, জানুয়ারি ১৯৬০।
ঝড়	কবিতা ও গান। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
ধূমকেতু	প্রবন্ধ। মাঘ ১৩৬৭, জানুয়ারি ১৯৬১।
পিলে পটকা পুতুলের বিয়ে	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা। ১৩৭০, ১৯৬৪।
রাঙাজবা	শ্যামাসঙ্গীত। বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬।
নজরুল-রচনা-সম্ভার	আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, মে ১৯৬৫।
নজরুল-রচনাবলী	প্রথম খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৬। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	দ্বিতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। পৌষ ১৩৭৩, ডিসেম্বর ১৯৬৭। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	তৃতীয় খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। ফাল্গুন ১৩৭৬, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	চতুর্থ খণ্ড। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, মে ১৯৭৭। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, প্রথমার্ধ। আবদুল কাদির সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯১, মে ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-রচনাবলী	পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয়ার্ধ। পৌষ ১৩৯১, ডিসেম্বর ১৯৮৪। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
নজরুল-গীতি অখণ্ড	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। সেপ্টেম্বর ১৯৭৮। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
অপ্রকাশিত নজরুল	আবদুল আজিজ আল্-আমান সম্পাদিত। অগ্রহায়ণ ১৩৯৬, নভেম্বর ১৯৮৯। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
লেখার রেখায় রইল আড়াল	কবিতা ও গান। আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত। ভাদ্র ১৪০৫, আগস্ট ১৯৯৮। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
জাগো সুন্দর চির কিশোর	সংগ্রহ ও সম্পাদনা : আসাদুল হক। ২৮শে আগস্ট ১৯৯১। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

নজরুলের ‘ধূমকেতু’	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান, ফাল্গুন ১৪০৭, ফেব্রুয়ারি ২০০১।
নজরুলের ‘লাঙল’	নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনর্মুদ্রণ। মুহম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, মে ২০০১।
কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	প্রথম খণ্ড। কলকাতা বইমেলা ২০০১। দ্বিতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১। তৃতীয় খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২। চতুর্থ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩। পঞ্চম খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪। ষষ্ঠ খণ্ড। জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, জুন ২০০৫। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
নজরুলের হারানো গানের খাতা	সম্পাদনা : মুহম্মদ নূরুল হুদা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭।
নজরুল–গীতি অখণ্ড	প্রথম সংস্করণ : সম্পাদক, আবদুল আজিজ আল–আমান। তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ : সম্পাদক, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। জানুয়ারি ২০০৪। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

'নজরুল-রচনাবলী'-তে অন্তর্ভুক্ত গানের বাণীর সঙ্গে নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর পাঠান্তর

নজরুল-সঙ্গীতের কোনো কোনো বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'নজরুল-রচনাবলী'তেও এই ধরনের পার্থক্য পাওয়া যায়। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত এবং নজরুল অনুমোদিত নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর সঙ্গে না মিলানোর দরুন এবং নজরুলের গানের বইয়ে ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বাণীর উপর নির্ভর করার ফলে কোথাও কোথাও এই পার্থক্য ও বাণীর পাঠান্তর রয়ে গেছে। 'নজরুল-রচনাবলী'তে প্রকাশিত নজরুল-সঙ্গীতের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণীর যে পার্থক্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে তা নীচে 'নজরুল-রচনাবলী' থেকে এবং নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের বাণী থেকে যতদূর সম্ভব পাশাপাশি তুলে ধরে দেখানো হলো। এই তুলনামূলক বিষয়টি দেখানো হয়েছে নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি গ্রন্থ এবং 'আদি গ্রামোফোন রেকর্ডভিত্তিক নজরুল-সঙ্গীতের নির্বাচিত বাণী সংকলন' শীর্ষক গ্রন্থের (১৯৯৭) ভিত্তিতে।

নজরুল-সঙ্গীত গ্রন্থ 'বন-গীতি'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল	'কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) 'বন-গীতি' গ্রন্থে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'ফুটেছে এত ফুল ফুল মালী কই' ২. 'সে মালা দিব কা'রে ভেবে সারা হই।'	'কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWIN FT 2026 শিল্পী : মিস হরিমতী রেকর্ডে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. '(ওগো) ফুটেছে এত ফুল, মালী কই?' ২. 'এ মালা দেব কা'রে ভেবে সারা হই,'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'বন-গীতি' গ্রন্থে : 'তিলং খাম্বাজ মিশ্র-তাল ফেরতা"

১	২	৩	৪
২. পানসে জোছ্‌নাতে কে চল গো পানসী বেয়ে	'পানসে জোছ্‌নাতে কে চল গো পানসী বেয়ে, 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'পানসে জোছ্‌নাতে কে চল গো পানসী বেয়ে, (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) নিম্নোক্ত পংক্তিটি রেকর্ডে নেই : 'ও পারে ধূ ধূ বালুচর যেন নদীর আঁচল লুটায়।'	রেকর্ডে : পিলু খাম্বাজ—মিশ্র-দাদরা' 'বন-গীতি' গ্রন্থে 'পিলু খাম্বাজ—মিশ্র-দাদরা'
৩. কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে	'কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা প্রাণে বাজে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWIN FT 2357 শিল্পী : মিস বীণাপাণি রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'আগুন লুকায়ে বুকে জ্বলিয়া মরি যে দুখে, ভুলিয়া রয়েছ সুখে, তুমি তো আপন কাজে।'	রেকর্ডে 'পিলু খাম্বাজ-কাহারবা' 'বন-গীতি' গ্রন্থে 'পিলু-খাম্বাজ—কার্ফা'
৪. নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম	'নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN FT 2319 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'শিয়রে গিরিরাজ হিমালয় প্রহরী আশিস্-মেঘবারি সদা তার পড়ে ঝরি। যেন উমার চেয়ে এ আদরিণী মেয়ে, ওড়ে আকাশ ছেয়ে মেঘ-চিকুর।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'বন-গীতি' গ্রন্থে 'স্বদেশী গান'

১	২	৩	৪
৫. ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী	'ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'শূন্য দেউল বন্ধ আরতি, কাঁদিছে পূজারী নাহি মা মুরতি, পূজার কুসুম চন্দ যায় আঁখি জলে—ভাসিয়া মাগো॥' [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র', পৃ. ৭১৩, নজরুল ইন্সটিটিউট	'বন-গীতি' গ্রন্থে : 'স্বদেশী গান' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে 'তাল : দাদরা'
৬. হে বিধাতা ! দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে	'হে বিধাতা ! দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'হে বিধাতা ! হে বিধাতা ! হে বিধাতা !' ['নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে প্রথম পংক্তিটি উদ্ধৃত] 'বন-গীতি' গ্রন্থে প্রথম পংক্তিটি : 'হে বিধাতা ! দুঃখ শোক মাঝে তোমারি পরশ রাজে'	'বন-গীতি' গ্রন্থে 'ভজন' 'মেঘ-তেতালা' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে রাগ : মেঘ তাল : ত্রিতাল
৭. বলো না বলো না ওলো সই	'বলোনা বলোনা ওলো সই' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'বলোনা বলোনা ওলো সই' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিটি নেই : 'ভোমরা চপল-মতি ফিরে সে যথা তথা।'	'বন-গীতি' গ্রন্থে 'হাম্বীর-তেতালা'

১	২	৩	৪
৮. কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু	'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) রেকর্ড নং TWIN 7072 শিল্পী : মিস মানিকমালা রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'এ বিশ্ব বিপুল কুসুম-দেউল হউক তোমার ফুল-কিশোর ! মুরলী করে এস গোলক-বিহারী হউক ভূলোক আনন্দ-ধাম।'	রেকর্ডে : 'কাহারবা' 'বনগীতি' গ্রন্থে 'বাগেশ্রী-সিন্ধু-কাহারবা'
৯. মেরোনা আমারে আর নয়ন-বাণে	'মেরোনা আমারে আর নয়ন-বাণে' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'মেরোনা আমারে আর নয়ন-বাণে' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' নজরুল ইন্সটিটিউট নিম্নোক্ত : তিনটি স্তবক রেকর্ডে নেই : 'তব রূপের সায়রে ও-নয়ন শাপলা সুঁদির ফুল, তুলিতে গিয়া ডুবিল শত সে পথিক বেভুল সুন্দর ফণির শিরে ও যেন যুগল মণি, যে গেল মণির মায়ায়, তারে দংশিল অমনি। শত সে হৃদয়-নদী কেঁদে যায় নিরবধি, সাগর-ডাগর ও আঁখির পানে॥	'বন-গীতি' গ্রন্থে 'খাম্বাজ মিশ্র-কার্ফা' 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে 'রাগ : খাম্বাজ মিশ্র' তাল : কাহারবা'

১	২	৩	৪
১০. আর লুকাবি কোথায় মা কালী	'আর লুকাবি কোথায় মা কালী 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'আর লুকাবি কোথায় মা কালী' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWIN FT 2031 শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ রেকর্ডে : 'বিশ্ব-ভুবন আঁধার করে তোর রূপে মা সব ডুবালি॥' 'বন-গীতি' গ্রন্থে 'আমার বিশ্ব-ভুবন আঁধার করে তোর রূপে মা সব ডুবালি॥' 'বন-গীতি' গ্রন্থে আরও কয়েকটি পংক্তির শুরুতে 'আমার', 'আমায়' 'আমি', 'আমার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।	রেকর্ডে 'বাগেশ্রী—একতাল' 'বন-গীতি' গ্রন্থে 'বাগেশ্রী—একতালা'
১১. ও মন চল অকূল পানে	'ও মন চল অকূল পানে' 'বন-গীতি' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'ও মন চল অকূল পানে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রেকর্ডে নেই : 'কুলু কুল কুলুকুলু হরিগুণ গান গাইবি অবিরল, আর দুই কূলে প্রেম-ফুল ফুটায়ে করবি রে শ্যামল, যত তাপিত প্রাণ হবে শীতল তোর জলে সিনানে।'	

বি. দ্র. : এখানে ছকের সংকীর্ণ পরিসরে গানের বাণীর স্তবকবিন্যাস হয়তো সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি। মুদ্রণ-বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নজরুল-সঙ্গীত গ্রন্থ 'গুল-বাগিচা'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়	'কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়, 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'বন-গীতি' গ্রন্থে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'ফুটেছে এত ফুল ফুল মালী কই' ২. 'সে মালা দিব কা'রে ভেবে সারা হই।'	'কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং J.N.G 129 শিল্পী : ভবানী দাস 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থে দুটি পংক্তি নিম্নরূপ : ১. 'নিশীথে যে কাঁদিল গলা ধরে' ২. 'হায় অভিমান খেলার ছলে।' উপরোক্ত দুটি পংক্তি গ্রামোফোন রেকর্ডে নিম্নরূপ : ১. 'নিশীথে যে কাঁদিল প্রিয়া বলে' ২. 'মান-অভিমান খেলার ছলে'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থে 'পিলু বারোঁয়া—কার্ফা'

১	২	৩	৪
২. তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে	'তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং MEGAPHONE J.N.G. 108 শিল্পী : শ্রী নিতাই ঘটক 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে দুটি পংক্তি : 'আসিয়াছি ভুল করে জানি ভুলেছ তুমিও ক্ষণেকের তরে এ ভুল ভেঙোনা প্রিয়।' রেকর্ডে পংক্তি দুটি নিম্নরূপ : 'ওগো ভুল করে আসিয়াছি, জানি ভুলেছ তুমিও তবু ক্ষণেকের তরে সে-ভুল ভেঙোনা প্রিয়	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে 'খাম্বাজ-মিশ্র কার্ফা'
৩. বৃথা তুই কাহার 'পরে করিস অভিমান	'বৃথা তুই কাহার 'পরে করিস অভিমান' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'বৃথা তুই কাহার 'পরে করিস অভিমান' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং J.N.G 129 শিল্পী : ভবানী দাস রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'ফোটে ফুল কানন ভরে, সে কি তোর মালার তরে? প্রেমে হায় জোর চলেনা, নাহি প্রতিদান॥'	রেকর্ডে : তাল : 'দাদ্‌রা' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে : 'তিলক-কামোদ—মিশ্র কার্ফা'

১	২	৩	৪
৪. আসিলে কে গো বিদেশী	'আসিলে কে গো বিদেশী' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'আসিলে কে গো বিদেশী' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'পাষাণের বুকে নদী বয়, যে পাষাণ সে পাষাণই রয়, ও শুধু প্রতারণা ছল, নয়নে নীর নিঠুর হৃদয়। আমারে মালারি মতন দলিবে নিশি প্রভাতে।' [দ্রষ্টব্য : 'নজরুল-সঙ্গীত সমগ্র' নজরুল ইন্সটিটিউট]	রেকর্ডে : তাল : 'কাহারবা' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে : 'দেশী টোড়ি মিশ্র-কার্ফা'
৫. মনে যে মোর মনের ঠাকুর তারেই আমি পূজা করি	'মনে যে মোর মনের ঠাকুর তারেই আমি পূজা করি' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'মনে যে মোর মনের ঠাকুর তারেই আমি পূজা করি' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N. 17064. শিল্পী : কে. মল্লিক 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থের 'সমুদ্রেরে খুঁজে বেড়াই সমুদ্রেতেই ভাসিয়ে তরী' পংক্তিটি রেকর্ডে : 'সাগরে খুঁজে বেড়াই সাগর বুকে ভাসিয়ে তরী।' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থের আরেকটি পংক্তি : 'মনের ধোঁওয়া বাড়াও আরো ধূপের ধোঁওয়ায় পায় না হরি' রেকর্ডে হয়েছে : 'পেতে রাখি ভক্তি বেদী- -আসবে নেমে প্রেমের হরি।'	রেকর্ডে : 'দাদরা' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে : 'কানাড়া—মিশ্র-রূপক

১	২	৩	৪
৬. স্বদেশ আমার ! জানিনা তোমার	'স্বদেশ আমার ! জানিনা তোমার' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'স্বদেশ আমার ! জানিনা তোমার' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7123 শিল্পী : কে. মল্লিক রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'স্বদেশ বলিতে বুঝেছি কেবল দেশের পাহাড় মাটি বায়ু জল, দেশের মানুষ ঘৃণা করি চাই করিতে দেশ স্বাধীন যত যেতে চাই তত পথে তাই হই মা ধূলি-বিলীন।'	রেকর্ডে : একতাল 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে : বেদারা—একতালা'
৭. স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী	'স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী' 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'স্বপ্নে দেখেছি ভারত জননী' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'তব প্রেমে তব শুভ ইঙ্গিতে অভাব যেন মা নাই পৃথিবীতে, স্বর্গ নামিয়া এসেছে মাটিতে, শুধু আনন্দ পড়িছে ঝরি।	

১	২	৩	৪
৮. গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ	'গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ' (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7097 শিল্পী : গোপাল চন্দ্র সেন (অন্ধগায়ক) রেকর্ডে শেষ স্তবকটি নিম্নরূপ : 'আমরা জানিনা, জানে না কেউ কূলে বসে কত গণিব ঢেউ দেখিয়াছি কত, দেখিব এও নিঠুর বিধির লীলা কতই॥ 'গুল-বাগিচা' গীতিগ্রন্থে উক্ত স্তবকটি নিম্নরূপ : 'আমরা জানিনা, জানেনা কেউ কূলে বসে কত গণিব ঢেউ, অনেক সয়েছি, সহিব এও দুখ তাপ শোক আরো কতই॥'	রেকর্ডে 'দাদরা' গুল-বাগিচা' গ্রন্থে : 'খাম্বাজ-দাদরা'
৯. বহিছে সাহারায় শোকের লু'হাওয়া	'বহিছে সাহারায় শোকের লু'হাওয়া 'গুল-বাগিচা' গীতি-গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'বহিছে সাহারায় শোকের লু'হাওয়া' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN FT 2595 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে একটি স্তবক নিম্নরূপ : 'ফল্গুধারা-সম সেই কাঁদন-নদী কুল-মুসলিম চিতে বহে গো নিরবধি, আসমান জমিন রহিবে যত দিন সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে।' গ্রামোফোন রেকর্ডে স্তবকটি নিম্নরূপ : 'সেই কারবালা সেই ফোরাত নদী মুসলিম হৃদে গাহিছে নিরবধি, আসমান জমিন রহিবে যত দিন সবে কাঁদিবে এমনি আকুল কাঁদনে।'	রেকর্ডে : 'কাহারবা' 'গুল-বাগিচা' গ্রন্থে : 'দেশ-কাওয়ালি'

১	২	৩	৪
১০. তওফিক দাও খোদা ইসলামে	'তওফিক দাও খোদা ইসলামে' 'গুল–বাগিচা' গীতিগ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'তওফিক দাও খোদা ইসলামে' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং TWIN FT 2969 শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রেকর্ডে নেই : 'দাও বে–দেরেগ তেগ জুলফিকার খয়বর–জয়ী শেরে–খোদার, দাও সেই খলিফা সে হাশমত দাও সেই মদিনা সে বোগদাদ॥'	রেকর্ডে 'তেওড়া' 'গুল–বাগিচা' গ্রন্থে : 'ইমন মিশ্র—পোস্তা।'
১১. মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লেআলা	'মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা' গুল–বাগিচা' গীতি–গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	'মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা' (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7118 শিল্পী : মোহাম্মদ কাশেম রেকর্ডে দুটি পংক্তি : 'জ্বলিবে রোজ হাশরে দ্বাদশ রবি কাঁদিবে নফসি বলে সকল নবী' গুল–বাগিচা' গ্রন্থে পংক্তি দুটি : 'জ্বলিবে হাশর দিনে দ্বাদশ রবি নফসি নফসি করে সকল নবী'	রেকর্ডে : 'কাহারবা' 'গুল–বাগিচা' গ্রন্থে : 'ভীম পলশ্রী—কার্ফা'

বি. দ্র. : গানের বইয়ে ও স্বরলিপি গ্রন্থে বাণীর স্তবক–বিন্যাসের যে ধরণ ও রীতি রয়েছে তা এখানে স্বল্প–পরিসরে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু ভুল–ত্রুটি এবং মুদ্রণ–বিভ্রাট ঘটে থাকতে পারে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নজরুল-সঙ্গীত গ্রন্থ 'গীতি-শতদল'	'নজরুল-রচনাবলী'	নজরুল-সঙ্গীতের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে বাণীর পার্থক্য ও পাঠান্তর	
গানের প্রথম পংক্তি ১	গানের প্রথম পংক্তি ২	গানের প্রথম পংক্তি ৩	রাগ ও তাল ৪
১. পলাশ ফুলের গেলাস ভরি	'পলাশ ফুলের গেলাস ভরি' 'গীতি শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'পলাশ ফুলের গেলাস ভরি' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং TWIN FT 3436 শিল্পী : মিস সত্যবতী (পটল) রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই : 'ছাতিম তরুর শীতল ছায়ায় ঘুমাবো মোরা প্রিয় ঘুম যদি পায়, বনের শাখা ঢুলাবে পাখা, ঝরিবে রাঙা ফুল কপোল চুমিয়া।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থে 'পলাশী মিশ্র—কাহারবা'

১	২	৩	৪
২. রহি রহি কেন আজো	'রহি রহি কেন আজো' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার) 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের নিম্নোক্ত তিনটি স্তবক রেকর্ডে নেই।' তিনটি স্তবকে নিম্নোক্ত কথা রয়েছে : ১. 'দিয়াছি তাহারে বিদায় ভাসায়ে নয়ন-নীরে সেই আঁখি বারি আজি মোর নয়নে ঝরে।' ২. 'হেনেছি অবহেলা পাষাণে বাঁধি হিয়া, তারি ব্যথা পাষাণ-সম রহিল বুকে চাপিয়া॥' ৩. 'সেই বসন্ত ও বরষা আসিবে ফিরে ফিরে আসিবেনা আর ফিরে অভিমানী মোর ঘরে।'	'রহি রহি কেন আজো' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং Columbia GE 2555 শিল্পী : শ্রীমতী রাধারাণী রেকর্ডে প্রথম স্তবক দ্বিতীয় পংক্তি 'ফিরায়ে দিয়েছি যারে অনাদরে অকারণে।' 'গীতি-শতদলে' প্রথম স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তি 'ভুলিতে তায় চাহি যত তত স্মৃতি কেঁদে মরে।' রেকর্ডের পরবর্তী চারটি স্তবক সম্পূর্ণ ভিন্ন: ১. উদাসী অলস দুপুরে মন উড়ে যেতে চায় সুদূরে যে বন-পথে সে ভিখারীর বেশে করুণা জাগায়ে ছিল সকরুণ নয়নে।' ২. তার বুকে ছিল তৃষ্ণা মোর ঘটে ছিল বারি পিয়াসী ফটিক জল জল পাইল না গো ঢলিয়া পড়িল হায় জলদ নেহারি।' ৩. 'তার অঞ্জলির ফুল পথ-ধূলিতে ছড়ায়েছি—সেই ব্যথা নারি ভুলিতে অন্তরালে যারে রাখিনু চিরদিন অন্তর জুড়িয়া কেন কাঁদে সে গোপনে।	'গীতি-শতদল' গ্রন্থে 'পঞ্চমরাগ মিশ্র—কাওয়ালি' রেকর্ডে 'ত্রিতাল'

১	২	৩	৪
৩. গোধূলির রঙ ছড়ালে	'গোধূলির রঙ ছড়ালে' 'গীতি–শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ) 'গীতি–শতদল' গ্রন্থে গানটি নিম্নরূপ : 'গোধূলির রঙ ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে বিবাহের বাজল বাঁশী আজি বিদায়ের লগনে॥ নতুন করে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে সুন্দর লাগে ধরা নিবু নিবু মোর নয়নে। এতদিন কেঁদে আবার বাঁচিবার সাধ জাগে আজি যে কাঁদি বঁধূ বাঁচিতে হায় তোমার সনে। আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ইমনে॥ হইল ধন্য প্রিয় মরণ–তীর্থ মম সুন্দর মৃত্যু এল বরের বেশে শেষ জীবনে॥	'গোধূলির রঙ ছড়ালে' নজরুল ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে গানটি নিম্নরূপ : 'গোধূলির রং ছড়ালে কে গো আমার সাঁঝ গগনে। মিলনের বাজে বাঁশি আজি বিদায়ের লগনে॥ এতদিন কেঁদে কেঁদে ডেকেছি নিঠুর মরণে আজি যে কাঁদি বঁধু বাঁচিতে হায় তোমার সনে॥ আজি এ ঝরা ফুলের অঞ্জলি কি নিতে এলে, সহসা পূরবী সুর বেজে উঠিল ই মনে। হইল ধন্য প্রিয় মরণ–তীর্থ মম সুন্দর মৃত্যু এল বরের বেশে শেষ জীবনে, এলে কে মোর সাঁঝ গগনে।' ['নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে গ্রামোফোন রেকর্ড নম্বর নেই। কণ্ঠশিল্পীর নামও নেই	'গীতি–শতদল' গ্রন্থে 'মাঢ় খাম্বাজ–মিশ্র—দাদরা' 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' গ্রন্থে 'মাঢ় খাম্বাজ মিশ্র—দাদরা'

১	২	৩	৪
৪. সকরুণ নয়নে চাহ	'সকরুণ নয়নে চাহ' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা পাঁচ)	'সকরুণ নয়নে চাহ' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7113 শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'থেকে যাও আরো কিছুক্ষণ থাকিতে বলিনা কাল, মরণ-সাগর পানে ভাসে মোর জীবন-ভেলা॥ আজিকার সাঁঝের ছায়া যেন না পড়ে ও মুখে। সাঁঝের শেষে যেন আসে চাঁদের আর তারকার মেলা॥'	'কাজরী—কার্ফা'
৫. এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে	'এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'এ ঘোর শ্রাবণ নিশি কাটে কেমনে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং MEGAPHONE NG 163 শিল্পী : কুমারী সুষমা দে রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'কদম কেশরে ঝরে তারি স্মৃতি ঝর ঝর বারি যেন তারি গীতি হায় অভিমানী হায় পথচারী ফিরে এসো ফিরে এসো তব ভবনে।'	

১	২	৩	৪
৬. আঁখি ঘুম ঘুম নিশীথ নিঝুম	'আঁখি ঘুম ঘুম নিশীথ নিঝুম' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা দুই)	'আঁখি ঘুম ঘুম নিশীথ নিঝুম' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং MEGAPHONE SN 92 শিল্পী : মিস প্রভা 'গীতি-শতদল' গ্রন্থে গানের শেষের কয়েকটি পংক্তি নিম্নরূপ 'কাঁদে চকোর চাঁদ হাসে সুদূরে। (আমি) এবার যেন মরে আসি তারি রূপ ধরে সে যাহারে চায়।' রেকর্ডে পংক্তিগুলো নিম্নরূপ : 'আমি যে ম'রে তারি রূপ ধরে আসি সে যাহারে চায়।' 'কাঁদে চকোর, চাঁদ হাসে সুদূরে।' পংক্তিটি রেকর্ডে নেই।	রেকর্ডে 'তাল—ফেরতা'
৭. জাগো জাগো হে মুসাফির	'জাগো জাগো হে মুসাফির' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'জাগো জাগো হে মুসাফির' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো রেকর্ডে নেই : 'পেয়েছিলি আশ্রয় শুধু, পাসনি হেথায় স্নেহ-নীর, হেথায় শুধু বাজে বাঁশী উদাস সুরে ভৈরবীর। তবু কেন যাবার বেলা ঝরে রে তোর নয়ন লোর।' উপরোক্ত পংক্তিগুলো নজরুলের 'সুর-লিপি' শীর্ষক স্বরলিপি গ্রন্থেও নেই।	

১	২	৩	৪
৮. আমি যেদিন রইবো না গো	'আমি যেদিন রইবো না গো' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'আমি যেদিন রইবো না গো' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'আর্শিতে তার ছায়া পড়ে রয় যবে সে সমুখে, সে যবে যায় দূরে চলে, অমনি ছবি মিলায়।'	
৯. নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দ-দুলাল	'নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দ দুলাল' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'নাচিয়া নাচিয়া এস নন্দ-দুলাল' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ড নং H.M.V.N. 7081 শিল্পী : মৃণাল কান্তি ঘোষ রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'এস মহা-ভারতের দেবতা, আন নৃত্যের তালে নব বারতা, এস মধু-কৈটভ-অরি আন নব গীতা, এস নারায়ণ ভগবান বিশ্ব-ভূপাল।'	রেকর্ডে 'কাহারবা' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থে 'বেহাগ মিশ্র—কার্ফা'
১০. আজি নন্দ-দুলালের সাথে	'আজি নন্দ-দুলালের সাথে' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'আজি নন্দ-দুলালের সাথে' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) নিম্নোক্ত স্তবকটি রেকর্ডে নেই, 'সুর-লিপি' শীর্ষক স্বরলিপি গ্রন্থেও নেই : 'চাঁদ রূপালি থালে জ্যোছনা আবীর ঢালে রঙে রাঙা চকোর-চকোরী ॥ দোলন-চাঁপার শাখে দোয়েল শ্যামা ডাকে আজি দোল পূর্ণিমা স্মরি'	

১	২	৩	৪
১১. ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে	'ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত' (গানের স্তবক সংখ্যা চার)	'ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে' (গানের স্তবক সংখ্যা তিন) রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকটি নেই 'আমার হৃদয়ের রাজা রাজ পেয়েছে দেখিতে যাইব আমি যদি চিনিতে না পারে আসিব লো ফিরে দুয়ারে খানিক থামি, মোর রাজ-দর্শন-পুণ্য হবে, আমি তীর্থের ফল লভিয়া ফিরিব দেখিয়া জীবন-স্বামী।'	
১২. সখি যায়নি ত শ্যাম মথুরায়	'সখি যায়নি ত শ্যাম মথুরায়' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত (গানের স্তবক সংখ্যা তিন)	'সখি যায়নি ত শ্যাম মথুরায়' (গানের স্তবক সংখ্যা দুই) রেকর্ডে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো নেই : 'তমাল কদম শ্যাম পল্লবে হৃদি-বল্লভে দেখিতে পাই। গোকুলে যে আজ কৃষ্ণপক্ষ কে বলে সখি কৃষ্ণ নাই। অন্যপক্ষে কি কাজ সখি গোকুলে যে আজ কৃষ্ণপক্ষ দেখ কৃষ্ণেরই নাম লয় সবাই সখি গো আমি অন্তরে পেয়েছি লো বাহিরে হারিয়ে তায় যাক না সে মথুরায় যেথা তার প্রাণ চায়	

১	২	৩	৪
১৩. বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু	'বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু' 'গীতি-শতদল' গ্রন্থের অন্তর্গত। (গানের স্তবক সংখ্যা ছয়)	'বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু' (গানের স্তবক সংখ্যা চার) রেকর্ড নং H.M.V.P. 11776 শিল্পী : মিস ইন্দুবালা রেকর্ডে নিম্নোক্ত স্তবকগুলো নেই : ১. 'জগতের এই প্রেম বিষ-মিশা' মিটেনা আহাতে অগস্ত্য-তৃষা ; হে প্রেম-সিন্ধু, মিটাও পিপাসা চাহিনা বন্ধু সৃত দারা॥ ২. 'কি হবে লয়ে এ মায়ার খেলনা কি হবে লয়ে এ তাসের ঘর, ছুঁতে ভেঙে যায় তবু শিশু প্রায় ভুলাও মোদেরে নিরন্তর।'	

বি. দ্র. : নজরুলের গীতি-গ্রন্থ 'গীতি-শতদল'-এর অন্তর্গত ১৩টি গানের বাণীর সঙ্গে আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত এসব গানের বাণীর যে পার্থক্য ও পাঠান্তর রয়েছে তা যথাসম্ভব এখানে তুলে ধরা হলো। স্থান-স্বল্পতা ও সঙ্কোচনের কারণে গানের পংক্তি ও স্তবক-বিন্যাস সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়নি। শত সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ-বিভ্রাটও ঘটে থাকতে পারে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচি

হ